প্রকাশনা-৮

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) প্রিয় নবীজী (সাঃ)-এর পবিত্র বাণী বর্ণনা করেন, এ বিশ্ব বসুন্ধরার সর্বোত্তম সামগ্রী হল নেক ও সৎকর্মপরায়ণ নারী।
(মিশকাত শরীফ ঃ ২৬)

সংকলন ও অনুবাদ ঃ
মাওলানা মুফতী রূহুল আমীন যশোরী

আল-হিদায়াত ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

প্রারম্ভিক কথা

বিচিত্র এ ধরণী। বিচিত্র এ ধরণীর অধিবাসীরা। বিচিত্র ধরণের নারী-পুরুষের বসবাস এ ধরণীতে। কোটি কোটি নারী-পুরুষের সমন্বয়ে গঠিত কোটি কোটি পরিবারের বসবাস এ পৃথিবীতে। ঘরে ঘরে অগণিত মায়ের অবস্থান। মায়ের অভাব নেই সমাজে। কিন্তু বড় অভাব আদর্শ মায়ের।

সুন্দর সাজানো গোছানো নির্মল আদর্শ সমাজ উপহার দিতে প্রয়োজন একজন 'আদর্শ মা'র। 'আদর্শ মা' কেমন হবেন? কেমন হবে তার মন-মানসিকতা, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, বুদ্ধি-বিবেচনা? কেমন হবে গর্ভকালীন সময়ে চাল-চলন পদ্ধতি? অতঃপর সন্তান লালন-পালন ও সন্তানদের সাথে আচার-আচরণ পদ্ধতি? কেমন হবে আদর্শ সন্তান গড়ার পদ্ধতি? সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা ও ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন জ্ঞান দান পদ্ধতি? এসব জানা খুবই দরকার। জানার দ্বারাই আমলের প্রেরণা জন্মাবে, আমল করবে। তাই এক কথায়, সন্তান গর্ভে ধারণ থেকে নিয়ে আদর্শ সন্তান হিসেবে নিজ পায়ে দাড়ানো পর্যন্ত একজন আদর্শ মায়ের কি করণীয়, কি বরণীয়, কি বর্জনীয় কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে সেসব তথ্য উপহার দিতেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য ও আকর্ষণীয় দিক নির্দেশনা এবং বাস্তব সম্মত উপায়-উপকরণ দিয়ে এ গ্রন্থটিকে সাজাতে চেষ্টা করেছি ইনশাআল্লাহ।

এ গ্রন্থ নিষ্ঠাপূর্ণ উপহার ঐ মায়ের জন্য, যিনি সন্তান সম্ভাবা হওয়ার পুলক আনন্দে কৃতজ্ঞায় স্বীয় ললাট সিজদাবনত করেন মহান স্রষ্টার দরবারে। এটি শুভেচ্ছা উপহার ঐ মায়ের জন্য যিনি তার প্রথম সন্তানের মুখ দর্শনের কামনায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে এই দু'আ প্রার্থনা করেন যে, "হে আমার প্রতিপালক! আপনি নিজ অনুগ্রহে আপনার অফুরন্ত ভান্ডার থেকে আমাকে একটি নেক সন্তান দান করুন। নিশ্চয় আপনি আমাদের দু'আ শ্রবণকারী ও কবুলকারী।" এটা উপহার ঐ মায়ের জন্যে, যিনি গর্ভ যন্ত্রণা ও ভূমিষ্ঠকালীন অবর্ণনীয়

কষ্ট সহ্য করে মহান আল্লাহর নিকট এর পূর্ণ ছাওয়াব ও প্রতিদানের আকাংখা রাখেন।

এটি উপহার ঐ মায়ের জন্যে, যিনি স্বয়ং সন্তান সম্পর্কে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এই মর্মে যে, তিনি সন্তানকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন এবং সচ্চরিত্র ও উত্তম আদর্শে আদর্শবান করে গড়ে তুলবেন ।এটা উপঢৌকন ঐ মায়ের জন্যে, যিনি স্বামীর সাথে ঘর সংসার তথা উঠা-বসা, চলা-ফেরা, আচারণ, ব্যবহার সব কিছুই শরীয়ত অনুযায়ী করেন, স্বামীর অনুগত ও বাধ্যগত থাকেন এবং তাকে সন্তুষ্ট করার পাশাপাশি আসল মালিক দয়াময় আল্লাহকেও সন্তুষ্ট করে নিয়েছেন।

গ্রন্থটি প্রকৃত পক্ষে মিছালী মা, ইসলাম আর তরবিয়তে আওলাদ ও নারী জন্মের আনন্দসহ বিভিন্ন গ্রন্থ হতে সংকলিত ও অনুদিত। অনুবাদ ও সংকলনে যারা উৎসাহ দিয়ে, শ্রম ও সময় দিয়ে এবং সম্পাদনা করে সহযোগিতা করেছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলেন, বহুল প্রচারিত ও সমাদৃত, সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক "মাসিক আদর্শ নারী"র সুযোগ্য সম্পাদক বন্ধুবর মাওলানা মুফতী আবুল হাসান শামসাবাদী এবং মুফতী ইবরাহীম হাসান।

গ্রন্থটি পাঠ করে যদি কারো সামান্যতম উপকার সাধিত হয়, তাহলে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে সার্থক জ্ঞান করব। অসতর্কতা বশতঃ ও মুদ্রণগত কোন প্রকার ক্রটি দৃষ্টি গোচর হলে অবগত করানোর জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা গ্রন্থটিকে সকল মা-বোনদের হিদায়াতের জন্য কবুল করুন, এটাই আন্তরিক আকাঙ্খা।

বিনীত
রূহুল আমীন যশোরী
২০-১১-২০ হিঃ
২৭-২-২০০০ ঈসায়ী

গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি যা জানতে পারবেন

☞ শিশুদের প্রতি মায়া-মমতার পদ্ধতি

☞ শিশুদের সাথে আচার-আচরণ পদ্ধতি

☞ শিশুদেরকে হাফেজ, আলেম, মুবাল্লেগরূপে প্রতিষ্ঠিত করার পদ্ধতি

☞ শিশুদেরকে মাতা-পিতার অনুগত করার পদ্ধতি

☞ শিশুদেরকে সমাজে নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত করার পদ্ধতি

☞ শিশুদেরকে আদর্শ সন্তানরূপে গড়ে তোলার পদ্ধতি

☞ শিশুদের আত্মশুদ্ধি ও সংশোধনের পদ্ধতি

☞ শিশুদেরকে ধার্মীকরূপে প্রতিষ্ঠিত করার পদ্ধতি

☞ শিশুদেরকে আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষাদান পদ্ধতি

☞ শিশুদেরকে সমাজসেবকরূপে প্রতিষ্ঠিত করার পদ্ধতি

এ গ্রন্থটি আপনি কিভাবে পাঠ করবেন?

আপনি যদি মুসলমান হন, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, আপনি মহান আল্লাহ তা'আলার সত্তায় বিশ্বাসী। সুতরাং এ গ্রন্থটি পাঠ করার প্রাক্কালে আল্লাহ তা'আলার রেজামন্দী ও সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়্যত অবশ্যই করুন এবং দ্বীন সম্পর্কিত যা কিছু পড়বেন, তার উপর আমল করার প্রচেষ্টা করুন। এরূপ নিয়্যত সহকারে যদি আপনি গ্রন্থটি পাঠ করেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে আপনাকে আমল করার অবশ্যই তাউফীক দিবেন।

যেহেতু এ জাতিয় গ্রন্থ পারিবারিক জীবনের উন্নতির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং আদর্শ সমাজ গঠনে আদর্শ পরিবারের জন্য একান্ত প্রয়োজন, আর আদর্শ পরিবার গঠনের নিমিত্ত কিছু বৈশিষ্ট, দিক নির্দেশনা, পথ নির্দেশিকা, উপমা ও দৃষ্টান্তের খুবই দরকার। তাই মা-বোনদের নিকট আমাদের আবেদন এই যে, "আদর্শ মা" গ্রন্থটিতে উপস্থাপিত হিদায়াত সম্বলিত বিষয়বস্তু এবং আত্মশুদ্ধিমূলক কথা ও দিক নির্দেশনা সমূহকে গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন। আর যে সমস্ত অবহেলা, অলসতা ও ভুল-ত্রুটি থেকে সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে বিরত থাকুন। আমাদের উপস্থাপিত আবেদনটি সামনে রেখে গ্রন্থটি পাঠ করুন।

১। গ্রন্থটি পাঠ করার পূর্বে এই দু'আ অবশ্যই করুন যে,

হে দয়াময় আল্লাহ! এই গ্রন্থটিকে আমার হিদায়াতের উসীলা বানিয়ে নাও এবং আমাকে স্বীয় প্রাণপ্রিয় স্বামীর দৃষ্টিতে (قُرَّةُ أَعْيُنٍ) চোখের শীতলতা এবং (خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا) জগতের উত্তম সামগ্রী বানিয়ে দাও। আর আমার সন্তানদের জন্য আমাকে বানিয়ে দাও আদর্শ মা।

২। গ্রন্থটি পাঠ করার জন্য এমন সময় নির্বাচিত করুন, যে সময়টা আপনি দুশ্চিন্তা-পেরেশানীতে পরিবেষ্টিত না থাকেন। কারণ, দুশ্চিন্তার তিক্ততায় তখন ভাল বিষয় পড়তেও বিরক্ত লাগতে পারে।

৩। গ্রন্থটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে ধারা বাহিকভাবে পাঠ করুন, যদিও বা তাতে মাসের পর মাস বছরের পর বছর পেরিয়ে যায়। তার পদ্ধতি এই যে, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা গণনা করে প্রতিদিনের জন্য কিছু পৃষ্ঠা নির্দিষ্ট করে নিন এবং যেখানে যেয়ে থেমে যাবেন সেখানে একটি নিশানা গালিয়ে নিন।

৪। গ্রন্থটি পাঠ করার সময় একটি কলম সাথে রাখুন এবং যে ব্যাপারে নিজকে অসতর্ক বা অপরিণামদর্শী অনুভব করেন, সেগুলোতে সংকেত বা চিহ্ন দিন এবং বার বার পাঠ করুন। আর নিজের সংশোধন ও হিদায়াতের নিমিত্ত মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করুন।

৫। গ্রন্থটি পাঠ করার প্রাক্কালে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের বিবাহিত নর-নারীর জন্য প্রাণ খুলে দু'আ করুন, যেন আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে মুহাব্বতের বন্যা প্রবাহিত করে দেন এবং তাদেরকে নেক সন্তান ও আদর্শবান প্রজন্মের উসীলা বানিয়ে দেন।

৬। গ্রন্থটি পাঠ করে যদি ভাল লাগে তাহলে অন্য মুসলিম নারীদেরকেও পাঠ করার দাওয়াত দিন। আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদেরকে পাঠ করার জন্য হাদিয়া দিন।

পরিশেষে শ্রদ্ধা-ভাজন, পাঠক-পাঠিকাদের নিকট অনুরোধ এই যে, এ গ্রন্থটি সংকলনে যে সমস্ত উলামাদের কিতাব থেকে সহযোগিতা নিয়েছি এবং যারা আমাকে উৎসাহ দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলের জন্য দু'আ করবেন। সে দু'আয় অধম সংকলকের কথা ভুলে যাবেন না কিন্তু।

শুকরিয়ান্তে

রুহুল আমীন যশোরী

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর

বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর

প্রাপ্তিস্থান

- কাসেমিয়া লাইব্রেরী
- দারুল কিতাব।
- কুরবান একাডেমী।
- হামিদিয়া প্রকাশনী
  বাংলা বাজার, ঢাকা।
- আল–এছহাক প্রকাশনী।
  ২/৩, প্যারিদাস রোড, ঢাকা।
- হাবিবিয়া বুক ডিপো
- হক লাইব্রেরী
  বাইতুল মুকাররম, ঢাকা।
- কুতুবখানায়ে রশিদিয়া
  চকবাজার, ঢাকা।
- তাবলীগী কুতুবখানা।
- সাউদিয়া লাইব্রেরী।
- থানভী লাইব্রেরী।
- হুসাইনিয়া কুতুবখানা
- নাদীয়াতুল কুরআন প্রকাশনী
  চক বাজার, ঢাকা।

- আশরাফিয়া কুতুবখানা।
- রাহমানিয়া কুতুবখানা।
- ইবরাহীমিয়া কুতুবখানা।
- সাউদিয়া কুতুবখানা
  চৌরাস্তা যশোর।
- দারুল কিতাব।
- দারুল কুরআন।
- মদীনা কুতুবখানা,
  দড়াটানা মসজিদ, যশোর।

এছাড়া, ইসলামী ফাউন্ডেশন ও বাংলা একাডেমীর বই মেলার সকল স্টল থেকে আপনার কপি সংগ্রহ করুন।

সন্তান সম্ভাবা হওয়া আল্লাহর একটি বড় নিয়ামত

গর্ভবতী মহিলার কর্তব্য এই যে, সে গর্ভ সঞ্চারের পূর্ণ ইয়াক্বীন ও বিশ্বাস হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলার বেশী বেশী শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা আদায় করবে এই জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা তার ভিতর মানব সৃষ্টির অপার কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছেন। পাশাপাশি আল্লাহ পাক তাকে এক মহান নিয়ামত দ্বারা সম্মানিত করেছেন, যে নিয়ামতের জন্য অসংখ্য নারী-পুরুষ জীবন ভর আকাংখা-ই করতে থাকেন যে, 'হে দয়াময় প্রভু! আমাদের একটি নেক সন্তান দান করে ধন্য করুন।' কিন্তু তাদের ভাগ্যে কোন সন্তানের মুখ দর্শনের সুযোগ হয় না। সন্তান এত বড় নিয়ামত যে, মহান আল্লাহ তা'আলার জলীলুল কদর মর্যাদা সম্পন্ন মহান ও প্রিয় বান্দাগণ অর্থাৎ আম্বিয়াগণও (আঃ) নেক ও সৎ সন্তানের জন্যে কেঁদে কেঁদে দু'আ করতেন। বিশিষ্ট নবী হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত যাকারিয়া (আঃ) জীবনের অপরাহ্ন বেলায়ও নেক সন্তানের নিমিত্ত তৃষ্ণার্তের মত ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে দু'আ করতেন।

সুতরাং, প্রত্যেক মুসলিম মহিলার করণীয় এই যে, সে সদা-সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকবে এবং খুব শুকরিয়া আদায় করবে।

শুকরিয়া আদায় করার পদ্ধতি এই যে, (ক) সদা-সর্বদা মুখে এই কালিমা জারী রাখবে;

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আপনারই এবং সমস্ত কৃতজ্ঞতাও আপনারই। (এই আনন্দে যে, আপনি আমাকে মা হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন)

(খ) কিছু সময় বের করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ স্বরূপ দু'রাক'আত শুকরানা নফল নামায পড়বে। অতঃপর মহান আল্লাহর শাহী দরবারে বিনম্রতা ও ভক্তি সহকারে সিজদাবনত হয়ে প্রাণ খুলে দু'আ করবে। তন্মধ্যে এ দু'আও পড়বে

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে নিজ ভান্ডার হতে নেক ও পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয় আপনি দু'আ শ্রবণকারী।

অতঃপর নিম্নের এ দু'আটিও পড়বে।

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাদের এবং আমাদের সন্তানদের নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানিয়ে দিন। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের দু'আ কবুল করুন।

যখনই সময় সুযোগ পাবে, এ দু'আগুলো পড়তে থাকবে।

(গ) অন্তরের শুকরিয়া এভাবে প্রকাশ করবে যে, সব সময় হাসি-খুশী থাকবে এবং সর্বদা নিজেকে প্রফুল্ল ও আনন্দিত রাখার চেষ্টা করবে। অতীতের দুঃখ-বেদনা মন থেকে বিস্মৃত করবে। হৃদয় গভীরে সন্তানকে মানুষ করার নতুন স্বপ্ন দেখবে। অন্তর কোণে আদর্শ সন্তান নিয়ে জীবন যাপনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা পোষণ করবে। নেক সন্তানের ওসীলায় ইহকালীন সাফল্য তথা জান্নাত এবং তথায় অবস্থিত অফুরন্ত নিয়ামতরাজি ও সুখ-সাচ্ছন্দের কল্পনা করবে।

দৈনন্দিন শ্বাশুড়ী-বৌমার ঝগড়া, ননদ-ভাবীর তিক্ততা, বিষণ্নতা, স্বামীর অশালীন আচণের প্রতিবাদ-প্রতিরোধে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে সবর করবে। কলিজার টুকরার (সন্তান) আগমনের আনন্দে সকলের সাথে এমন মধুর্যপূর্ণ আচরণ করবে যে, তার দ্বারা কারো মনের মধ্যে যেন কোন দুঃখ জন্ম না নেয়। আর যদি কেউ অলক্ষ্যে তার দ্বারা কষ্ট পায়, তাহলে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। অতীতে অনুষ্ঠিত ঝগড়া ভুলে যাবে। মনে রাখবে, যদি গর্ভবতী মা নিজেই গায়ে পড়ে ঝগড়া-ঝাটিতে প্রলিপ্ত হয় এবং খুঁজে খুঁজে পরিবারের সদস্যদের খুঁটিনাটি, ত্রুটি-বিচ্যুতি বের করে, তাহলে এর প্রভাব গর্ভের বাচ্চার উপর পড়বে। কেননা, মা গর্ভাবস্থায় যে পরিস্থিতি, যে মেজাজ ও চিন্তা-চেতনা এবং জযবা ও অনুভূতিসহ কালাতিপাত করে, বাচ্চার সহজাত স্বভাবে তা গভীরে রেখাপাত করে এবং তা অবিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়ার স্বাক্ষর রেখে যায়।

সুতরাং, প্রতিটি লগ্নে প্রতিটি মুসলিম নারীর কথা-বার্তা ও চাল-চলনে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। বিশেষ করে গর্ভাবস্থায়। আর শুকরিয়া আদায়ের মধ্যেমে অন্তরে আল্লাহর মুহাব্বত সৃষ্টি করতে হবে। এছাড়া, মনে মনে এ চিন্তা করতে হবে যে, যখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে এমন বড় নিয়ামত দান করেছেন, তখন আমারও তো আবশ্যকীয় কর্তব্য এই যে, বেশী বেশী তার ইবাদত করব এবং এমন নিয়ামত দানকারীর নাফরমানী করব না। সাধারণ অবস্থায়ও না এবং গর্ভাবস্থায়ও না। কারণ, বেপর্দা চলা-ফেরা করা, টি.ভি, ভি.সি.আর দেখা, গীবত ও চোগলখুরী করা কোন মুসলিম দ্বীনদার, খোদাভীরু নারীর শোভা পায় না। বিশেষ

করে গর্ভাবস্থায় এ জাতীয় অন্যায় ও গুনাহের কাজ করলে, তার বদআছর সন্তানের উপর পড়ে।

(ঘ) গর্ভাবস্থায় বেশী বেশী ইবাদত করা দরকার। ফরজ-ওয়াজিব আদায়ের পাশাপাশি নফল ইবাদত-বন্দেগী, নফল নামায, কুরআনে কারীম তিলাওয়াত, দু'আ, জিকিরের প্রতি অধিক মনোনিবেশ করা কর্তব্য। তাহলে, মায়ের সেই পরহেজগারী গর্ভস্থ সন্তানের উপর সুপ্রভাব ফেলবে। দুনিয়াতে যত বড় বড় ওলী, বুযুর্গ পয়দা হয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে তাদের মায়ের আমল-আখলাকের গুণের উল্লেখযোগ্য ভূমিক ছিল। হতে পারে-আপনার সন্তান বড় বুযুর্গ ও ওলী। তাই সেই আমানতের সংরক্ষণের আপনাকে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে।

গর্ভের প্রথম মাসে করণীয়

আপনাকে এ কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, আপনি এখন একা নন এবং আপনার দেহে শত আকাঙ্খিত বড় আদরের ফুটফুটে বাচ্চার প্রতিপালন হচ্ছে। আপনার সামান্যতম সতর্কতা ও সাবধানতা এ আগন্তুক শিশুকে সুস্থ-সবল, সুন্দর স্বাস্থ্যবান, জ্ঞানী-গুণী, বুদ্ধিমান, সৎ ও দ্বীনদার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

পক্ষান্তরে, নূণ্যতম অবহেলা ও বেপরোয়াভাব তাকে রোগগ্রস্ত, স্বাস্থ্যহীন, দুর্বল ও বিবেক-বুদ্ধিহীন, গর্দভ, বেকুফ হিসাবে সমাজের বোঝা সৃষ্টি করতে পারে।

সুতরাং, এখন গর্ভবতী হওয়ার সাথে সাথেই আপনার জীবন, আপনার চাল-চলন ও কাজ-কর্ম, পদ্ধতি পূর্বের মত হওয়া বাঞ্চনীয় নয়। প্রতিটি লগ্ন, প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত চৈতন্যতা ও সতর্কতার সাথে অতিবাহিত করতে হবে এবং নিজের ও সন্তানের সুস্থতা ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। বিশেষ করে নিম্নে লিপিবদ্ধ বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রতিটি গর্ভবতী মায়ের একান্ত কর্তব্য।

১। সতর্কতার সাথে খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। প্রতি লুকমা খুব চিবিয়ে চিবিয়ে আহার করবে। খুব বেশী এবং পেটপুরে খাবে না। এমন খাদ্যদ্রব্য যা শরীরে কফা সৃষ্টি করে, তা একেবারেই খাবে না।

২। খাদ্যদ্রব্য হিসেবে তাজা, টাটকা শাক-সবজী ধুয়ে খুব পরিষ্কার করে আহার করবে। সালাদ, শশা, ক্ষীরা, কাকড়ী ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে আহার করবে।

৩। দুধ ও দধি প্রচুর পরিমাণে আহার করবে। দেহের যে পরিমাণ হজম শক্তি রয়েছে, ততটুকু পরিমাণ দুধ পান করতে থাকবে। কেননা, মহানবী (সাঃ) যে কোন খাদ্যদ্রব্য আহার করার পর নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেন ঃ اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! এ খাদ্যের চেয়েও আমাদেরকে উত্তম খাদ্য দান কর।"

কিন্তু দুধ এমনি একটি মূল্যবান, পবিত্র ও সুস্বাদু খাদ্য যে, এর চেয়ে উত্তম খাদ্য আর হতে পারে না। তাই তো দুধ পান করার পর তিনি পাঠ করতেন ঃ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এর মধ্যে বরকত দান করুন এবং আমাদের অধিক পরিমাণে দান করুন।"

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, দুধ পান করার প্রাক্কালে এরূপ দু'আ করা হয়নি যে, "এর চেয়ে উত্তম খাদ্য দান করুন।" কেননা, দুধের চেয়ে উত্তম খাদ্য হতেই পারে না। বিধায়, দুধের মধ্যে বরকত এবং অধিক পমিাণের দু'আ করা হয়েছে। সুতরাং গর্ভবতী মহিলাগণ অধিক পরিমাণে দুধ পান করবে। কেননা, মানব দেহের জন্য যতটুকু ভিটামিন, প্রোটিন এবং শক্তির প্রয়োজন, প্রজ্ঞাময় বিশ্ব প্রতিপালক মহান আল্লাহ তা'আলা ততটুকু দুধের মধ্যে কুদরতী ভাবে সন্নিবেশিত করেছেন। যদি খাঁটি দুধ পান করলে কোন ক্ষতির আশংকা থাকে, তাহলে বিভিন্ন পদ্ধতিতে দুধের সাথে অন্য কিছু সংমিশ্রণ করে পান করা যেতে পারে। লাচ্ছি, দধি, কাষ্টার্ড, ক্ষীর ইত্যাদি তৈরী করে খাওয়া যেতে পারে। এগুলো মা এবং সন্তান উভয়ের জন্য উপকারী।

৪। চা, কফি, পান, তেল, ঘি, ঝাল ও চর্বি জাতীয় খাদ্য দ্রব্য আহার করা পরিহার করবে। কেননা, এগুলো হজম শক্তি দুর্বল করা ছাড়াও মস্তিষ্ক এবং গর্ভে অবস্থিত বাচ্চার জন্য ক্ষতিকারক।

৫। খুবই সতর্কতার সাথে যতদূর সম্ভব সর্ব প্রকার ঔষধ সেবন থেকে বিরত থাকবে। প্রচেষ্টা তো এটাই হওয়া চাই যে, গর্ভকালীন অবস্থায় কোন প্রকার প্রতিকূল পথ্য-পদ্ধতি ব্যবহার করবে না। বিশেষ করে মাথা ব্যথা, শরীর ব্যথা ইত্যাদির ঔষধ। যদি একান্ত বাধ্য হয়ে যায়, তাহলে কোন অভিজ্ঞ মহিলা ডাক্তারের পরামর্শক্রমে ঔষধ ব্যবহার করবে। প্রয়োজন বোধে নিজের মনের খবর বিস্তারিত আলোচনা করবে যে, আমি আকাঙ্খিত সন্তানের অপেক্ষায় রয়েছি। এমন যেন না হয় যে, ডাক্তার এমন ঔষধ সেবন করতে বলে, যা গর্ভবতীর জন্য ক্ষতিকারক।

এমনিভাবে কোন কোন ঔষুধের গায়ে লেবেল আঁটা থাকে, "গর্ভবতী মহিলার সেবন করা নিষেধ।" তাই বাধ্যতা বশতঃ যদি ঔষুধ সেবন করতেই হয়, তাহলে ভাল ভাবে যাচাই-বাছাই করে সেবন করবে।

৬। গর্ভের প্রথম তিন মাস এবং শেষের দিকে এক মাস বরং সপ্তম মাসের পর স্বামীর হক আদায় করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবে। কারণ, তাতে অনেক সময় মা এবং গর্ভের সন্তানের স্বাস্থ্যের উপর খারাপ প্রভাব পড়ে।

৭। অধিক রাত পর্যন্ত জাগ্রত থাকবে না। কমপক্ষে আট ঘন্টা শান্তির সাথে নিদ্রা যাওয়ার চেষ্টা করবে।। এতে মস্তিষ্কের ক্লান্তি এবং শারীরিক দুর্বলতা দূরিভূত হয় এবং শরীর ও মস্তিষ্কের প্রশান্তি লাভ হয়। এতে বাচ্চার উপর সুপ্রভাব পড়ে এবং বাচ্চা প্রসবও সহজতর হয়।

৮। অনেক বেশী কাজ করা এবং ভারী জিনিষ বহন করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা, কোন কোন সময় এ কাজ অকাল গর্ভপাতের কারণ হয়। যদি অত্যাচারী শাশুড়ী, ননদ এবং পাষাণ হৃদয় জেঠানী ভারী বোঝা বহন করতে বাধ্য করে, অথবা জেনে শুনে কঠিন এবং কষ্টদায়ক কাজ করতে দেয়, তাহলে তাদের নিকট অত্যান্ত কাকুতি-মিনতি ও বিনম্রতার সাথে দরখাস্ত এবং উযর পেশ করবে যে, এ কাজ আমার ক্ষমতার বাইরে। আমাকে ক্ষমা করুন। অনুমতি হলে, আমি কাজের মাসী বা বুয়া দ্বারা করিয়ে দিব। যদি এতেও পাষাণ হৃদয় শাশুড়ী এবং কঠিন মনের ননদের অন্তর বিগলিত না হয়, তাদের অন্তরে রহম সৃষ্টি না হয়, তাহলে স্বামীর নিকট নিজের অক্ষমতা, অপারগতা বিস্তারিত অবগত করিয়ে তার অনুমতিক্রমে বিশ্রামের জন্য পিত্রালয়ে চলে যাবে। আর যদি স্বয়ং আপনি কারো শাশুড়ী হন, তাহলে পুত্র বধুর উপর জুলুম করবেন না। আর যদি ননদ বা জেঠানী হন, তাহলে ভাবীর উপর জুলুম হতে দিবেন না। ভাবীর গর্ভকালীন সময়ে ভাবীকে বেশী বেশী বিশ্রাম নিতে সহায়তা করুন। এতে আপনি কেবল ভাবীর উপর রহম ও অনুগ্রহ-ই করছেন তা নয়, বরং আপনি এক নিষ্পাপ শিশু, অমূল্য রতন, আপনার ঘরের গোলাপ, বংশেরবাতি, আপনার ভাইয়ের চোখের শীতলতা, পার্থিব জীবনের রশ্মি, পরকালের সদকায়ে জারিয়াহর উপর রহম ও দয়া করছেন। গর্ভকালীন সময়ে আপনার ভাবী, বৌমা, বোন যতটুকু আনন্দে উল্লাসে থাকবে, যতটুকু শান্তি ও বিশ্রামে থাকবে, ততটুকু-ই মহান আল্লাহর হুকুমে আগন্তুক মেহমান সুস্থ-সবল, হাসি-খুশী মুখের অধিকারী হবে। জ্ঞানী-গুণী বিবেকবান ও বাহাদূররূপে জন্ম গ্রহন করবে।

গীবত ও মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকতে হবে

প্রত্যেক মুসলিম মহিলার অবশ্য কর্তব্য এই যে, সর্বাবস্থায় এ দু'টো রোগ থেকে এমন ভাবে বেঁচে থাকবে, যেমনিভাবে বিষধর সাপ, বিচ্ছু থেকে মানুষ বাঁচতে চেষ্টা করে। কেননা, গীবত এবং মিথ্যা এমন বিষাক্ত অভ্যাস, যা অন্য আমল সমূহ ধ্বংস করে দেয়। এর দুর্গন্ধময় বিষের কুপ্রভাব মানুষ এবং তার নেক আমলের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এমনিভাবে যার গীবত করা হয় সে সমস্ত নেকীর অধিকারী হয়। আর মিথ্যা তো এমন গুনাহ, যা অন্যান্য অনেক গুনাহর ভিত্তি। মিথ্যা সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ "মিথ্যাবাদী কখনও মুমিন হতে পারে না"। অর্থাৎ ঈমানদার হতে মিথ্যা প্রকাশ পেতেই পারে না। সুতরাং, আপনি যদি আগন্তুক শিশুকে সৎকর্মশীল, দ্বীনদার, পরহেজগার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তাহলে আপনাকে অবশ্যই সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে বাঁচতে হবে। বিশেষ করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময়মত আদায় করতে হবে। আযানের ধ্বনি শ্রবণ করার সাথে সাথেই কাজ-কর্ম থেকে অবসর হয়ে সুন্দর ভাবে উজু করে ধীরে ধীরে নামায পড়বেন। প্রতিটি আয়াত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পড়বেন এবং নামাযকে দীর্ঘায়িত করবেন। আর যদি সম্ভব হয় তাহলে ইশরাক, চাশ্‌ত, আওয়াবীন ও তাহাজ্জুদ নামাযের এহতেমাম করবেন। এ সমস্ত নামাযের বদৌলতে অন্তরে নূর সৃষ্টি হবে এবং অশ্লীলতা, গীবত, মিথ্যা, বেহায়াপনা, নির্লজ্জতাসহ সর্ব প্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার হিম্মৎ, শক্তি, সাহস সৃষ্টি হবে। অধিকন্তু, বেশী বেশী নেক কাজ করা সহজতর হবে। আগমনী শিশুর উপর নেক কাজের সুপ্রভাব পড়বে।

যে মহিলা গুরুত্ব সহকারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, ইনশাআল্লাহ তার সন্তানরাও নামাযী হবে। আর যে মহিলা গর্ভাবস্থায় বিশেষ ভাবে গুরুত্বসহকারে তাহাজ্জুদ, আওয়াবীন ইত্যাদির অভ্যস্ত হবে, তার সন্তানেরাও ইনশাআল্লহ ঐ সমস্ত নফল নামাযে অভ্যস্ত হবে। এমনি ভাবে যে মহিলা গীবত থেকে বাঁচার প্রচেষ্ঠা চালাবে, তার সন্তানের উপরও এর প্রভাব পড়বে এবং তারাও গীবত থেকে বাঁচবে। গীবত এবং গুনাহর কুপ্রভাব এটিও একটি যে, নেক কাজে মন লাগে না, নেক কাজ করতে মন চায় না। ফজর ও ইশার নামায বহু ভারী অনুমিত হয়। পর পুরুষদের থেকে পর্দা করা বড় মুশকিল মনে হয়।

গীবতকারিনী দু'মহিলার অবস্থা

নবী কারীম (সাঃ)-এর যুগে দু'জন মহিলা রোযা রেখে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ল। তাদেরকে মৃতমুখ দেখে সাহাবায়ে কিরাম তাদের সম্পর্কে মহানবী (সাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন। হুযুর (সাঃ) তাদের নিকট একটি পেয়ালা প্রেরণ করে বললেন, তারা যেন এতে বমি করে। বমি করার পর দেখা গেল, এত টাটকা গোশত এবং তাজা রক্ত রয়েছে। হুযুর (সাঃ) কারণ দর্শিয়ে বললেন, এরা হালাল রুজী দ্বারা রোযা রেখেছে সত্য, কিন্তু গীবত করে হারাম ভক্ষণ করেছে। তাই তাদের এ দুরাবস্থা হয়েছে।

লক্ষ্য করুন, গীবত করার কারণে রোযার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত পালন করা ও কষ্টকর হয়ে গেল। এত মারাত্মক ক্ষুধা লাগল যে, মৃত্যুর পথযাত্রী হয়ে গেল। এটা তো ছিল মহানবী (সাঃ)-এর সোনালীযুগে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমকারী মানুষদেরকে সতর্ক করে দিলেন যে, গীবত এবং গুনাহের মধ্যে এমন বদআছর রয়েছে যে, এর কারণে নেক কাজও কষ্টকর হয়ে যায়।

আজ-কাল অনেক মা নিজ সন্তানের জন্য তাবীয গ্রহণ করেন। মাদের অভিযোগ, "সন্তানেরা কথা মানেনা, নামায পড়তে চায়না, মাদ্রাসায় যেতে চায়না, বড় বিরক্ত করে, টি, ভি ছাড়া কিছু বোঝেনা।" তাবীয গ্রহণ না করে এমন মাদের উচিত আল্লাহ দরবারে কেঁদে কেঁদে স্বীয় পাপাচারের মাফ চাওয়া। তা হলে হয়ত আল্লাহ তা'আলা সন্তানদের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সর্ব প্রকার পেরেশানী ও দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই দিবেন। অন্যথায়, স্বয়ং নিজে পাপে লিপ্ত থেকে সুসন্তান কামনা করা বোকার স্বর্গে বসবাস করা ছাড়া আর কি?

বস্তুতঃ সমাজে সুসন্তান পেতে পিতা-মাতাকে নেককার, পরহেজগার হতে হবে। বিশেষ করে মাকে তো অবশ্যই সর্ব প্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থেকে অধিক পরিমাণে নেক কাজ করতে হবে। বড় বড় ডাক্তারগণ বলেছেন যে, গর্ভকালীন সময়ে মা যে আমল ও কাজ করে, তার আছর ও প্রভাব গর্ভে অবস্থিত সন্তানের উপর অবশ্যই পড়ে। তাই মায়ের উচিত খুব বেশী বেশী নেককাজ করা। কুরআন-হাদীস বিরোধী কোন কাজ না করা। কোন ফরয, ওয়াজিব না ছাড়া। নিদ্রা জাগরণ থেকে নিদ্রা গমন পর্যন্ত দৈনন্দিনের প্রতিটি কাজ-কর্ম প্রিয় নবীজীর (সাঃ) প্রিয় সুন্নাত অনুযায়ী সমাধা করা। তবেই সমাজে সুসন্তান আশা করা যায়।

গর্ভাবস্থায় গর্ভবতী কি নিয়্যত করবে?

গর্ভস্থির হওয়ার পর গর্ভবতী মহিলা এ নিয়ত করবে যে,

(১) হে আল্লাহ! আমি এ বাচ্চাকে দ্বীনের খাদেম বানাব, তার লালন-পালন এমন ভাবে করব যে, সে আজীবন আপনার দ্বীনের উপর আমল করবে। সমগ্র বিশ্বে ইসলামের আলো ছড়াবে, হাজার হাজার কাফেরকে হিদায়াত করবে, নিজেও নেক কাজ করবে, অন্যকেও নেক কাজ করতে উৎসাহিত করবে, নিজেও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে, অপরকেও গুনাহ থেকে বিরত রাখবে।

(২) হে আল্লাহ! আমি একে তোমার পবিত্র কালাম কুরআন মজীদের হাফেয বানাব। যাতে করে সে ইহকাল ও পরকালের অফুরন্ত নিয়ামতের অধিকারী হতে পারে।

(৩) হে আল্লাহ! আমি একে ইলমে দ্বীন অন্বেষণে সর্বক্ষণ ব্যস্ত রাখব, যাতে করে কুরআন মজীদকে খুব ভাল করে বুঝে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। আর মহানবী (সাঃ)-এর মিষ্টি মিষ্টি হাদীসসমূহ বুঝতে পারে এবং অপরকে বুঝাতে পারে।

(৪) হে আল্লাহ! আমি একে খুব মেহনত করে আরবী ভাষা শিক্ষা দেব। যাতে করে আমার এ কলিজার টুকরা কুরআনের ভাষা, নবীজীর (সাঃ) ভাষা, বেহেশ্‌তবাসীদের ভাষা শিখতে পারে এবং ঐ পবিত্র ভাষার মাধ্যমে ভাল ভাল গুণ অর্জন করতে পারে এবং বিশ্বের লাখো লাখো মানুষকে ঐ গুণ সমূহ শিক্ষা দিয়ে সমাজে হিদায়াতের নূর ছড়িয়ে দিতে পারে।

হযরত আনাস (আঃ) বলেন, মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি নিজ সন্তানকে নাযেরা কুরআন শরীফ পড়ায়, তার অগ্রে-পশ্চাতের সমস্ত (ছগীরা) গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আর যে, হিফ্‌য করাবে, তাকে ক্বিয়ামতের দিন পূর্ণিমার চাঁদের মত (উজ্জ্বল নূরানী চেহারাসহ) উঠানো হবে। আর ঐ সন্তানকে বলা হবে, পড়তে থাক এবং জান্নাতের (মর্যাদার) ধাপ সমূহে আরোহন করতে থাক। যখন সন্তান এক আয়াত পাঠ করবে, তখন পিতা-মাতার একধাপ মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এমনি ভাবে সমস্ত কুরআন শরীফ খতম হয়ে যাবে।" (ফাযায়েলে আ'মাল)

মা যেমন নিয়্যত করে, আগন্তুক সন্তানের উপর তার প্রভাব অবশ্যই পড়ে। সুতরাং সন্তান সম্ভাবা মাদের কর্তব্য এই যে, তারা গর্ভকালীন সময়ে এমন কোন নিয়্যত করবে না যাতে পার্থিব ও পরকালীন কোন উপকার নিহিত নেই। যদি কখনও শয়তান এমন কোন কথা অন্তরে নিক্ষেপ করে অথবা কুপ্রবঞ্চনা দেয়, তাহলে "আউযু বিল্লাহ" পড়বে এবং মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে খুব কান্নাকাটি করে দু'আ করবে।

গর্ভবতীর নবম মাসে করণীয়

বিশেষ করে গর্ভধারণের নবম মাসে মায়ের করণীয় কিছু দিক-নির্দেশনা পেশ করা হচ্ছে। গুরুত্বের সাথে আমল করতে পারলে, মা ও আগন্তুক শিশু উভয়ের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী এবং বিভিন্ন প্রকার দুর্ঘটনা, অনিষ্ঠতা ও অসুখ-বিসুখ থেকে নিরাপদ থাকার সহায়ক হবে, ইনশাআল্লাহ।

★ খুব বেশী টাইট ও আঁট-ষাট পোষাক পরিধান করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ, এতে রক্ত চলাচলের গতি ধীর-স্থির হয়ে যায় এবং অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্তি অনুভূত হয়। মনে অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়ারও কারণ হতে পারে। তাই এ সময় ঢোলা-ঢালা পোষাক পরিধান করতে অভ্যস্ত হতে হবে।

★ বড় হাইহিলযুক্ত জুতা-সেন্ডেল পরিধান করা থেকেও বিরত থাকবে। কেননা, এতে গোড়ালীর হাড়ে চাপ পড়ে এবং কোমর, হাঁটু ও জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা সৃষ্টির কারণ হতে পারে।

★ গর্ভের প্রথম মাসগুলোতে প্রতি মাসে নিয়মিত মহিলা ডাক্তারের নিকট যেয়ে নিজের অবস্থা সম্পর্কে অবগত করাবে, সপ্তম-অষ্টম মাসে প্রতি দু'সপ্তাহে মহিলা ডাক্তার দ্বারা চেকআপ করাবে এবং নবম মাসে প্রতি সপ্তাহে নিজের শারীরিক ও মানসিক হালত জানাতে থাকবে।

★ গর্ভাবস্থায় মহিলা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী রক্ত ও প্রস্রাব অবশ্যই টেষ্ট করাবে, যাতে করে সময় মত রোগ নির্ণয় করা যায় এবং দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়।

★ নিজ এলাকায় অভিজ্ঞ মহিলা ডাক্তার বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কখনও পুরুষ ডাক্তারের স্মরণাপণ্য হবে না। বর্তমানে নীতিহীন ডাক্তারের অভাব নেই। গর্ভ বা যৌন রোগের চিকিৎসার জন্য পুরুষ ডাক্তার নির্বাচন করা অনুচিত। এতে হিতে বিপরীত হয়। তবে মহিলা ডাক্তার না থাকলে, দ্বীনদার পুরুষ ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে।

বেহেশতী যেওর হতে কিছু উপদেশ

গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা, দাস্ত ও আমাশয় হতে না পারে, সে জন্য সদা সর্বদা পানাহারে সতর্কতা অবলম্বন করবে। পেটে কষা ভাব অনুমিত হলে, এক দু'ওয়াক্ত ঝোল বা মিষ্টান্ন ও তৈলাক্ত পদার্থ আহার করবে।

★ ক্ষুধা মন্দা হলে, মিষ্টান্ন ও তৈলাক্ত খাদ্যদ্রব্য আহার করা কিছু দিনের জন্য বন্ধ রাখবে। বমি আসলে বন্ধ করবে না। ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত্রিম উপায়ে বমি করবে না। মহিলা ডাক্তারের পরামর্শ মত চলবে।

★ গর্ভবতীর জন্য সুপথ্য হল আঙ্গুল, পেয়ারা, আপেল, নাশপাতি, ডালিম, আম; জাম, আমলকী, ছোট পাখী, ও খাসী বা বকরীর গোশত। এ

ছাড়া গমের রুটি, মুগডাল, মাখন, ঘি, দুধ, চিনি, মিশ্রি, কলা, কিসমিস, মোনাক্কা, আনজীর, মধু, চন্দন, ঘোল ইত্যাদি বেশ উপকারী। আর নিয়মিত গোছল করা, নরম বিছনায় শয্যা গ্রহণ, বিশ্রাম প্রভৃতি তার স্বাস্থ্যের সহায়ক বিষয়।

★ আমাশয় বা দাস্ত হতে পারে- এমন খাদ্যদ্রব্য কখনও আহার করবে না। কারণ, প্রবল আমাশয় হয়ে গেলে, মলত্যাগের প্রাক্কালে কুন্থনে সন্তান রক্ষা করা দুঃসাধ্য বটে। একান্ত আমাশয় হলে পরে ১০/১৫ বৎসরের পুরাতন তেঁতুলের শরবত পান করবে। তাতে আমাশয় নিরাময় হয়।

★ গর্ভকালে অকাল বেদনার সাথে সাথে রক্তস্রাব দেখা দিলে, সন্তান বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে; রক্তস্রাব দেখা দিলে অবিলম্বে ডাক্তারের পরামর্শ নিবে।

★ যদি গর্ভাবস্থায় পা ফুলে যায়, তাহল চিন্তাযুক্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। গর্ভাবস্থায় কোন কোন মহিলার এমনটি হয়ে থাকে। তবে চিকিৎসা করতে অবহেলা করবে না।

★ যাদের অকালে গর্ভপাত ঘটে থাকে, তারা চার মাস পর্যন্ত অতঃপর সপ্তম মাসের পর খুব সতর্কতা অবলম্বন করবে। কোন জিনিষ গরম গরম খাবে না। কোন ভারী বোঝা, পানির কলস ইত্যাদি উঠাবে না। দ্রুতগতিতে সিড়ি, মই ইদ্যাদি দ্বারা নীচে নামবে না। কারণ, কোন কোন সময় সামান্য অসতর্কতায় বড় কোন বিপদ ঘটে যেতে পারে। তাই খুব সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করবে।

★ রেউচিনি, হোলা, মূলা, গাজর, হরিণের গোশত, অতিরিক্ত ঝাল, বেশী টক ও তিক্তদ্রব্য, তরমুজ, বাঙ্গী, অধিক মাষকালাইয়ের ডাল, অধিক খাদ্য গ্রহণ, রাত্রি জাগরণ, অপ্রিয় বস্তু দর্শন, অধিক ব্যায়াম, বেশী ভার বহন, দিবানিদ্রা, শোক, ক্রোধ, ভয়,মল-মূত্রের বেগ চেপে রাখা, উপবাস, চিৎ হয়ে শোয়া, উপর হতে নীচে লাফিয়ে পড়া, অধিক পরিমাণে গোলাপ, ক্যাষ্টার ওয়েল ব্যবহার, সর্দি, কাশি, সুগন্ধি ব্যবহার প্রভৃতি গর্ভবতীর জন্য ক্ষতিকর।

পেট নড়াচড়া করানো থেকে বিরত থাকবে। কোন কষ্টের কাজ করবেনা।

★ গর্ভবতীর হৃদকম্প দেখা দিলে ২/৪ ঢোক গরম পানি পান করবে। সামান্য চলাফেরা করবে। এতে পূর্ণ সুস্থতা অনুভব না করলে, চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হবে এবং তার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবে।

গর্ভাবস্থায় কোন প্রকার ঔষধ ব্যবহার করবে না। তবে অভিজ্ঞ মহিলা ডাক্তারের পরামর্শক্রমে প্রয়োজনে ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে।

গর্ভবতী সম্পর্কিত একটি কুপ্রথা

আমাদের সমাজে গর্ভবতী মহিলাদের ব্যাপারে একটি কুপ্রথার প্রচলন রয়েছে। তা এই যে, "সন্তান প্রসব" মায়ের বাড়িতে হতে হবে। বিশেষ করে প্রথম সন্তান প্রসব তো মায়ের বাড়িতে হতেই হবে। এর কোন মাফ নেই। মায়ের বাড়ি যদি দূর দেশে হয়, তবুও গর্ভবতীকে যেতেই হবে- যাইয়ে ছাড়বে। বাপ-মার আর্থিক সামর্থ কম বা অসচ্ছল থাকলেও। অথচ মায়ের বাড়িতে সন্তান প্রসব হওয়া কোন জরুরী কিছু নয়। তদুপরি গর্ভ মোচনের পূর্বে এক/ দু'মাসের মধ্যে বেড়াতে যাওয়া, সফর বা জার্নি করা মোটেও সমীচীন নয়। এতে গর্ভবতী মা ও আগন্তুক শিশুর বিভিন্ন প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্য মায়ের বাড়ি যদি সন্নিকটে হয় অথবা সফর আরামদায়ক হয়, কিংবা স্বামীর বাড়িতে যত্নের অবহেলা হওয়ার আশংকা থাকে এবং মায়ের বাড়িতে যত্নের সুব্যবস্থা থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা। তবে নিছক প্রথা হিসেবে মায়ের বাড়ি প্রেরণ করা অনুচিত।

সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর করণীয় সুন্নত সমূহ

আল্লাহ পাক যখন মানুষকে একটি সন্তান দান করেন, তখন সেই সন্তানের পিতা-মাতার উপর এক মস্ত বড় দায়িত্বের বোঝা অর্পিত হয়। সন্তান প্রকৃত পক্ষে পিতা-মাতার নিকট মহান আল্লাহর গচ্ছিত অতি বৃহৎ একটি আমানত। সন্তানের লালন-পালন করা, সন্তানের দেহ-মনের যত্ন করে সুস্থ ও সতেজ রাখা যেমন পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য, তেমনি সন্তানের দেহ পালনের সাথে সাথে আত্মার প্রতিপালন তথা দ্বীনী সবক দানও পিতা-মাতার এক মহান দায়িত্ব।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে অন্য কোন কথা বা শব্দ শিশুর কানে প্রবেশ করার পূর্বেই তার কর্ণকুহরে আল্লাহর নাম প্রবেশ করানো প্রয়োজন। ধাত্রী বিসমিল্লাহ পড়তে পড়তে প্রসূত শিশুকে ঈষৎ উষ্ণ পানি দ্বারা গোসল দিয়ে গা, হাত, পা মুছে কাঁথা বা কম্বল দ্বারা আবৃত করে কোলে নিয়ে এবং কোন পুরুষ লোক দ্বারা সেই শিশুকে মহল্লার কোন বুযুর্গ আলেম, ইমাম বা কোন নেক লোকের কোলে দিবে। তিনি স্বল্প আওয়াজে সুমধুর স্বরে ডান কানে আযান শুনাবেন এবং বাম কানে ইকামত শুনাবেন।

ভুমিষ্ঠ সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক উভয়ের ক্ষেত্রেই ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত বলা সুন্নত।

হযরত আবু রাফি' (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি

হুযূর (সাঃ)কে দেখেছি যে, তিনি হাসান ইবনে আলীর কানে আযান দিলেন, যখন তিনি (নবী-নন্দিনী) মা ফাতিমার ঘরে ভূমিষ্ঠ হন। আর ঐ আযান নামাযের আযানের মতই ছিল। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

"মুসনাদে আবু লাইলা মুসলী" নামক গ্রন্থে হযরত হুসাইন (রাঃ) হুযুর (সাঃ)-এর ইরশাদ বর্ণনা করেছেন যে, "যার ঘরে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় এবং সে শিশুর ডান কানে আযান এবং বাম কানে তাকবীর (ইকামত) বলে, সেই শিশুকে মৃগী রোগ ক্ষতি সাধন করতে পারে না।"

তাহনীক করা সুন্নত, অর্থাৎ কোন বুযুর্গ দ্বারা মধু অথবা তার বদলে খুরমা কিংবা অন্য কোন মিষ্টি দ্রব্য চিবিয়ে রস বের করে লালার সাথে মিশ্রিত করে তা আঙ্গুল দ্বারা শিশুর মুখের ভিতরে তালুতে লাগিয়ে দেয়া এবং বুযুর্গ দ্বারা দু'আ করানো। (বুখারী, মুসলিম)

শিশুর বয়স সাত দিনের পর কিছু করণীয় কাজ

(১) সন্তানের জন্মের সপ্তম দিবসে তার মাথার চুল মুড়িয়ে দেওয়া।

(২) চুলের ওজন পরিমাণ স্বর্ণ বা রূপা (অথবা তার মূল্য) গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করে তাদের দ্বারা শিশুর জন্য দু'আ করানো। (তিরমিযী)

(৩) কোন নেক আলেম বা বুযুর্গ দ্বারা দু'আ করিয়ে ভাল ইসলামী নাম রাখা। (আবু দাউদ)

(৪) আক্বীকা করা। হযরত সালমান ইবনে আমির (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলে পাক (সাঃ)কে একথা বলতে শুনেছি, "সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে, আক্বীকা করতে হবে। তার পক্ষ থেকে পশু যবাহ করো এবং তার থেকে কষ্ট (অর্থাৎ তার মাথার চুল এবং ময়লা-আবর্জনা) দূর করো।" (বুখারী)

(৫) সন্তান ছেলে হলে, তার জন্য দুটি বকরী বা খাসী যবাহ করে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও গরীব-দুঃখীকে খাওয়ায়ে তাদের থেকে শিশুর জন্য দু'আ নেয়া। যাতে শিশু দীর্ঘজীবী হয়, সুস্থ থাকে, সন্তান সচ্চরিত্রবান হয় এবং নেকবখতী (সৌভাগ্য ও পরহেজগারী) লাভ করতে পারে। বকরীর পরিবর্তে গরু যবাহ করলে তাও জায়িয আছে। তবে গরুতে ৭টি ছাগলের হিসাব ধরে আক্বীকা পূর্ণ করা যায়।

মাসআলাহ ঃ যে পশু দ্বারা কুরবানী জায়িয নয়, তা দ্বারা আক্বীকাহও জায়িয নয়। আর যে পশু দ্বারা কুরবানী জায়িয আছে তা দ্বারা আক্বীকাহ জায়িয আছে।

মাসআলাহ ঃ আক্বীকার গোশত চাই কাচা বন্টন করুক, অথবা রান্না করে বন্টন করুক, কিংবা দাওয়াত করে খাওয়াক, সবই দুরস্ত আছে।

মাসআলাহ ঃ আক্বীকার গোশত নিজে খাওয়া, মাতা-পিতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী ও সকল আত্মীয়-স্বজনদের খাওয়ানো জায়িয আছে।

শিশুর বয়স যখন প্রায় পাঁচ বৎসর হবে, তখন শিশুকে কোন নেক বুযুর্গ আলেম দ্বারা দু'আ করিয়ে দ্বীনি শিক্ষা লাভের জন্য মক্তবে পাঠাতে হবে। কারণ–শৈশবেই যদি শিশুকে আল্লাহর কালাম শিক্ষা না দেয়া হয়, তাহলে পরে আর সন্তানের সুচরিত্র গঠন সম্ভব হয়ে উঠে না, কথায় বলে–"কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, শেষে করে ঠাস ঠাস"; অর্থাৎ কচি বয়সে শিশুকে ধর্ম-কর্ম শিক্ষা অভ্যাসগত করিয়ে না দিলে, পরবর্তীতে আর সন্তানকে বাধ্যগত ও সচ্চরিত্রবানরূপে গঠন করা যায় না।

ছেলে বা মেয়ের বয়স যখন ৭ বৎসর হবে, তখন হতে ছেলে-মেয়েদেরকে ভালবাসা দিয়ে স্নেহ-মমতা দিয়ে নামাযের অভ্যাস করাতে হবে। তাদের কৌশলে আদর-যত্ন করে লোভ-লালসা ও পুরস্কারের লোভ দিয়ে সুপরিবেশে রেখে যেভাবেই হোক ১০ বৎসরের মধ্যে নামাযে অভ্যস্ত করাতেই হবে। দশ বৎসর বয়সের ভিতর উপরোক্ত কৌশল অবলম্বন করা সত্ত্বেও নামায পড়ার অভ্যাস পাকাপোক্ত না হলে, কিছু কঠোরতা করে প্রয়োজনে প্রহার করে বা কিঞ্চিৎ শাস্তি দিয়ে হলেও নামাযের অভ্যাস করতে হবে। তবে চেহারায় কোন প্রকার আঘাত করা যাবে না।

ছেলের বয়স যখন ৭/৮ বা ৯/১০ বৎসর হবে, তখন তার খাৎনা অর্থাৎ মুসলমানী করাতে হবে। খাৎনা করা শুধু মাত্র একটি ধর্মীয় প্রথাই নয়, এটা ইসলাম ধর্মের একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত।

কন্যা সন্তান অপছন্দ করা আল্লাহর ফয়সালাকে অপছন্দ করার নামান্তর

ইসলাম পূর্ব জাহিলিয়্যাতের যুগে কন্যা সন্তানের জন্মকে পাপ বা অভিশাপ মনে করা হত। সে জন্য কোন পরিবারে কন্যা সন্তান জন্ম নিলে, লজ্জায় ঘৃণায় পিতা কাউকে চেহারা দেখাত না। বর্তমান এ আধুনা যুগেও অনেক মাতা-পিতা এমন রয়েছে, যারা পুত্র সন্তান জন্ম নিলে খুশীতে আত্মহারা হয়ে যায় বটে, কিন্তু কন্যা সন্তান জন্ম নিলে মুখ শুকিয়ে কালো চামচিকে হয়ে যায়, আথচ এমনটি হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নয়। এটা

জাহিলিয়্যাতের মানসিকতা। বরং কন্যা সন্তানের জন্মে ছেলের চেয়েও খুশী প্রকাশ করা উচিত। কেননা, মেয়ে সন্তান হলে হাদীস শরীফে পিতা-মাতার যে ফযীলতের কথা বলা হয়েছে, ছেলে সন্তানের ব্যাপারে তা নেই। কত খুশীর খবর যে, আল্লাহ তা'আলা দয়া করে আপনার ঘরের সৌন্দর্যরূপে, সৌভাগের ফুলরূপে, অঢেল ফযীলতের অধিকারীণীরূপে একটি ফুটফুটে পূর্ণিমার চাঁদ (মেয়ে) দান করেছেন।

পৃথিবীতে হাজার হাজার নিঃসন্তান দম্পতি এমনও রয়েছে, যাদের সন্তানের কচি হাত, মধুমাখা কচি মুখ দর্শনের সৌভাগ্য হয় না। সোনা মুখের কচি কণ্ঠের আব্বু-আম্মু ডাক শ্রবণ করতে তারা সদা প্রত্যাশী। কিন্তু সে সৌভাগ্য তাদের হয় না। আল্লাহ আপনাকে সেই নিয়ামত দিয়েছেন। আর এটা ফযীলতের নিয়ামত। তাই কন্যা সন্তান জন্ম নিলে অসন্তোষ প্রকাশ না করে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে ঈমানের পরিচয় দেয়া কর্তব্য।

মনে রাখবেন–কন্যা সন্তান অপছন্দ করা আল্লাহর সিদ্ধান্তকে অপছন্দ করা একই কথা।

নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায় যে, যারা কন্যা সন্তানের কারণে মনঃস্তাপে ক্লিষ্ট হয় , দুঃখিত ও লজ্জিত হয়, তাদের ঈমানে রয়েছে দুর্বলতা; একীন বিশ্বাসে রয়েছে অসচ্ছতা। তাদের একথা হৃদয়ঙ্গম করা একান্ত প্রয়োজন যে, তারা এবং তাদের পরিবারের, বংশের সমাজের সমগ্র বিশ্ববাসীর শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আল্লাহর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারবে না। আল্লাহ যা চান, তাই করেন, করবেন। তিনি সর্ব শক্তিমান, রাজাধিরাজ, সর্বকর্মবিধায়ক। যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

"নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব আল্লাহ তা'আলারই। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দেন। অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই। কিংবা যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল।"

(সূরাহ শুরা ঃ ৪৯-৫১)

কন্যা সন্তান কেবল মায়ের কারণে হয় না, পিতারও তাতে দখল থাকে। তাই মায়ের তাতে কোন দোষ নেই। মহান আল্লাহই পিতা-মাতা উভয়ের মাধ্যমে কন্যা সন্তানের ফয়সালা করেন। এটা কারো ব্যক্তিগত আনয়ন নয়, মহান আল্লাহর কুদরতী দান। কাজেই কন্যা সন্তানের কারণে

যে পুরুষরা স্ত্রীকে গালী-গালাজ, মারধর করে, তারা বেকুফ, কাপুরুষ। আল্লাহর প্রতি তাদের পরিপূর্ণ ঈমান নেই।

ইতিহাস গ্রন্থে একটি চমৎকার ঘটনা উল্লেখ রয়েছে। আরব দেশে আবু হামজা নামক এক ব্যক্তি এক মহিলাকে বিবাহ করে। লোকটি পুত্র সন্তানের প্রত্যাশী ছিল। কিন্তু তাদের গৃহে কন্যা সন্তান জন্ম নিল। লোকটি তখন ক্ষোভে-দুঃখে স্ত্রীর নিকট যাতায়াত বন্ধ করে দিল এবং স্ত্রীর থেকে পৃথক হয়ে অন্য একটি বাড়ি ভাড়া করে বসবাস করতে লাগল। দীর্ঘ এক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন ঐ লোকটি তার স্ত্রীর গৃহের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল। তখন তার কর্ণে স্বীয় স্ত্রীর সুপরিচিত মধুর কণ্ঠে একটি কবিতার পংক্তি ভেসে এল। স্ত্রী তার কন্যাকে আদর সোহাগ ছলে বললেন-

مالأبى حمزة لا يأتينا　　يظلّ فى البيت الذى يلينا

"আবু হামজার কি হল যে, আমাদের কাছে আসে না?
পাশের বাড়িতে ভাড়া থাকে, তবু আমাদের খোঁজ নেয় না!

غضبان ألانلد البنينا　　تالله ما ذلك فى أيدينا

অসন্তুষ্ট সে, কেন পুত্র সন্তান জন্ম দিলাম না?
শপথ আল্লাহর, এসব কিছু তো আমার ক্ষমতার অধীনে না।

وانّما نأ خذ ما أعطينا

মহান আল্লাহ যা কিছু দেন, তাই তো মোদের সান্তনা।"

স্ত্রীর কণ্ঠের এ কথাগুলো স্বামীকে দারুণ ভাবে প্রভাবান্বিত করে এবং ঈমান, একীন ও আল্লাহর ফয়সালার সম্মুখে মস্তক অবনত করতে বাধ্য করে। তখন আবু হামজা গৃহে প্রবেশ করে স্ত্রী ও কন্যার কপালে কৃতজ্ঞতার চুম্বন একে দিয়ে কন্যা সন্তানরূপে করুণাময় আল্লাহ তা'আলা যে মহান নিয়ামত তাকে দান করেছেন, তার প্রতি সন্তোষ ও আনন্দ প্রকাশ করে। এভাবে তাদের সংসার সুখের সংসারে পরিণত হয়।

কন্যা সন্তান আল্লাহ প্রদত্ত এক শ্রেষ্ঠ নেয়ামত

কন্যা সন্তান মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মাতা-পিতার জন্য একটি বিশেষ শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। কন্যা সন্তানকে অশুভ মনে করা কাফিরদের বদস্বভাব। কন্যা সন্তানকে অপছন্দ করা খাঁটি মুমিনের পরিচায়ক নয়। কন্যা সন্তান অশুভ, অকল্যাণকর নয়। বরং কন্যা জন্ম নেয়া খোশ

কিসমতী ও সৌভাগ্যের নিদর্শন। যেমন, হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন– "ঐ স্ত্রী স্বামীর জন্য অধিক বরকতময়, যার দেন-মহরের পরিমাণ কম হয় এবং যার প্রথম সন্তান হয় মেয়ে। (টিকা, আল-ফিরদাউল, ১ঃ২১৫)

অপর একটি হাদীস হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেন, "নারী ভাগ্যবতী হওয়ার প্রমাণ এই যে, তার প্রথম সন্তান মেয়ে হবে। এ জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ 'তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।' (কানযুল উম্মাল, ১৬ ঃ ৬১১)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে অন্য একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ "যার গৃহে কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করল, অতঃপর সে তাকে (কন্যাকে) কষ্টও দেয়নি, তার উপর অসন্তুষ্টও হয়নি এবং পুত্র সন্তানকে প্রাধান্যও দেয়নি, তাহলে ঐ কন্যার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।"(মুসনাদে আহমাদ, ১ঃ২২৩)

কন্যা সন্তান যে কত বরকতময়, তার প্রমাণ আমরা হযরত আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারা জানতে পাই। মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেন, যখন কোন মহিলার (গৃহে) কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার নিকট একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। সেই ফেরেশতা বরকত নিয়ে দ্রুতগতিতে তার নিকট দৌড়ে আসে এবং বলে- দুর্বলা হতে আর এক দুর্বলা জন্ম নিয়েছে, যে তার প্রতিপালন করবে, সে কিয়ামত পর্যন্ত সাহায্য প্রাপ্ত হবে।" (কানযুল উম্মাল, ১ঃ৪৫০)

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, কন্যা সন্তান আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ উত্তম নেয়ামত। সুতরাং কন্যা সন্তানকে ভালবাসুন। আদর-সোহাগ, মায়া-মমতা দিয়ে লালন-পালন করুন। সে তো আপনার কলিজার টুকরা, দেহের এক বিশেষ অংশ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অমীয় ব্যণীর প্রতি লক্ষ্য করে কন্যা সন্তানকে পুত্রের চেয়ে বেশী আদর-যত্ন করুন।

সুপ্রিয় পাঠক/পাঠিকাবৃন্দ!

গ্রন্থটি পাঠ করার সময় মুদ্রণগত বা ভুল বশতঃ কোন প্রকার ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে অবগত করানোর জন্য অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে, ইনশাআল্লাহ!

সন্তানের জন্য মায়ের প্রথম উপহার

সদ্য প্রসূত সন্তানের জন্য মায়ের পক্ষ থেকে প্রথম উপহার হল মায়ের দুধ। মায়ের দুধ একটি পরিপূর্ণ খাদ্য। সদ্য প্রসূত স্তন্যপায়ী শিশুর উপকারের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, মায়ের দুধের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই রেখেছেন। বাস্তবিক পক্ষে মায়ের দুধের বিকল্প পৃথিবীর অন্য কোন দুধ-ই হতে পারে না। টিনজাত বোতলজাত গুড়ো দুধ অনেক ক্ষেত্রে শিশুর ক্ষতি করে। শিশুর দেহে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি জন্মায়। কিন্তু মায়ের দুধ অসংখ্য দুরারোগ্য থেকে শিশুকে রক্ষা করে।

জনৈক শিশু বিশেষজ্ঞের মতে শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার এক ঘন্টার মধ্যেই মায়ের দুধ খাওয়ানো উচিত। ইউনিসেফ এর সিদ্ধান্ত এই যে, সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর মায়ের প্রথম যে-বর্ণিলা দুধ হয়, যাকে শাল দুধ বলে, তা সদ্যজাত শিশুর জন্য বড়ই উপকারী। অথচ আমাদের দেশে কোন কোন এলাকায় এ শাল দুধ ফেলে দেয়া হয়, তা খাওয়ানো হয় না। এটা ভুল। আবার কোন কোন শিশু সদন, মাতৃসদন ও ক্লিনিক সমূহে এরূপ প্রচলিত রয়েছে যে, সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর সন্তানকে মায়ের থেকে পৃথক রাখা হয়। সদ্য প্রসূত সন্তানকে দুধ পান করানো দূরের কথা, সন্তানের সাথে মায়ের সাক্ষাত পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে পড়ে। তা কিছুতেই উচিত নয়। বরং যতদুর সম্ভব, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, প্রসূত সন্তানকে মায়ের দুধ পান করাতে হবে। এতে মায়ের এক বিশেষ উপকার এই হবে যে, মায়ের হৃদয় গভীরে, মন-মস্তিস্কে, চিন্তা-চেতনায় এক নতুন অনুভূতির রঙিন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। তা এই যে, আমি তো এখন মা। আমার নিয়মিত বাচ্চাকে দুধ পান করাতে হবে। বাচ্চার খাওয়া দাওয়ার প্রতি যত্নবান হতে হবে। অন্যথায় বাচ্চা আমার ক্ষিদেয় কষ্ট পাবে। অন্য এক উপকার এই হবে যে, নয়নের মনি, কলিজার টুকরা, চোখের শীতলতা সন্তানকে বুকের মাঝে পেয়ে মায়ের মনে আনন্দের বন্যা বয়ে যাবে, অনাবিল সুখ অনুভব করবে। বিশেষ করে প্রসব যন্ত্রণা বে-মালুম ভুলে যাবে, যা মায়ের স্বাস্থ্য রক্ষায় মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। অন্যদিকে সদ্যাগত প্রসূত মেহমান (শিশু) মায়ের স্তন থেকে দুধপান করার পদ্ধতি শিখে নিবে সহজেই। এছাড়াও সন্তানকে নিয়মিত দুধপান করানোর দ্বারা মায়ের অনেক রোগ প্রতিরোধ হয়। বিশেষ করে স্তন ক্যান্সার থেকে বাঁচা যায়।

যদি বুকের দুধে স্বল্পতা দেখা দেয়?

মায়ের বুকের দুধের পরিমাণে যদি স্বল্পতা দেখা দেয়, তাহলে দুঃশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। কেননা, দুধ বৃদ্ধি নির্ভর করে বাচ্চার চাহিদা এবং মায়ের দুধ খাওয়ানোর প্রতি যত্নবান হওয়ার উপর। সুতরাং, বাচ্চা যত বেশী বেশী স্তন চুষবে তত বেশী মায়ের বুকে দুধ বৃদ্ধি পাবে। এ কারণেই বাচ্চা যখনই ক্ষুধার তাড়নায় কাঁদবে, তখনই তাকে দুধ পান করানো উচিত। *আল্লাহ তা'আলা প্রসূত কচি শিশুর প্রতিপালনের এই সুব্যবস্থা রেখেছেন যে, বাচ্চার এতটুকু ভালভাবে জানা হয়ে যায় যে, তার পেট ভরতে কতটুকু দুধের প্রয়োজন। তাই সে ততটুকু দুধ পান করে চুপচাপ নীরবে সুখনিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে।* তখন কিন্তু শিশুকে আরামছে ঘুমুতে দেয়া উচিত।

শিশু বাচ্চার মানসিক ও শারীরিক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রথম চার বা ছয় মাস বিশেষভাবে মায়ের দুধই নির্বাচিত করা উচিত। যে বাচ্চারা মায়ের দুধ পান করে, তাদের ঐ সমস্ত বাচ্চাদের তুলনায় পেটের পীড়ার অভিযোগ কম থাকে, যারা বোতলে বা ফিডারে করে দুধ পান করে। কারণ, যে বাচ্চারা মায়ের দুধ পান করে, তাদের হজম শক্তি ভাল থাকে।

মায়ের খাদ্য, ঔষধ ও সতর্কতা

মায়েদের এ কথার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তিনি যে ধরণের ঔষধই সেবন করেন না কেন, তা কিন্তু বুকের দুধের সাথে মিশ্রিত হয়। সুতরাং তাকে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ ক্রমেই ঔষধ সেবন করতে হবে। ডাক্তারকে একথা অবশ্যই অবগত করাতে হবে যে, তার শিশু বাচ্চা তার বুকের দুধ পান করে। এমনিভাবে অনেক খাদ্য এমনও রয়েছে, যা অধিক পরিমাণে আহার করলে, মায়ের দুধের মধ্যে শামিল হয়ে যায়। অথচ তা অনেক ক্ষেত্রে শিশুর জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই মাকে খুবই সতর্কতার সাথে পানাহার করতে হবে।

নিঃসন্দেহে মায়ের দুধ শিশুর জন্য শুধুমাত্র কুদরতী উত্তম খাদ্যই নয়, বরং মায়ের পক্ষ থেকে নিজ সন্তনের জন্য উৎকৃষ্ট, সর্বোত্তম উপহার।

স্তন্যপায়ী শিশুর রোগের এক বিশেষ কারণ

নিজ শিশুর সুস্থতা কে না কামনা করে? প্রত্যেক মা-ই আকাঙ্খা করে যে, তার সন্তান সুস্থ, সবল, স্বাস্থ্যবান এবং শক্তিশালী হোক। ফুলের মত, কলির মত প্রস্ফুটিত হোক। কচি কণ্ঠের কিচির-মিচির কলরবে গৃহকানন সদা মুখরিত হোক। কিন্তু শিশু সন্তান যদি কোন রোগ-শোকে কষ্ট পেতে থাকে, ব্যথা অনুভব করে, তাহলে মায়ের দুঃশ্চিন্তার অন্ত থাকে না। অনেক মা অশনি সংকেত মনে করে আশংকা বোধ করেন। অনেকে নামায পড়ে দু'আ করেন এবং দান-সদকা ও মান্নত মানতেও কুণ্ঠিত হন না। শিশুদের বিভিন্ন রোগে রোগগ্রস্ত, এমনকি দুরারোগে আক্রান্ত হওয়ার এক বিশেষ কারণ উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি। আশা করি মায়েরা এটা পাঠ করে অসতর্কতামূলক ভুল ও অলসতা থেকে বাঁচার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাবেন এবং পরিবার ও পাড়া প্রতিবেশী অন্যান্য মা-বোনদের ভুল সংশোধনে উৎসাহিত করবেন। তা হচ্ছে-

শিশুদের জন্য ফিডার ও চুশনী ব্যবহার

শিশুদের বিভিন্ন রোগে রোগাক্রান্ত করতে চুশনী যতটুকু কৃতিত্ব ও ভূমিকা রাখে, অন্য কোন জিনিষ তা রাখতে পারে না। অনেক মায়েরা শিশুদেরকে কাজে ব্যস্ত রাখার জন্য এবং নিজে একটু অবসর হয়ে সময় কাটানোর জন্য শিশুর মুখে প্লাষ্টিকের চুশনী গুজে দেয়। কোন কোন শিশুর গলায় তো সার্বক্ষণিকভাবে সুতা দ্বারা চুশনী ঝুলিয়ে দেয়া হয়। যখনই সে কান্না শুরু করে, তখনই মুখে চুশনী এঁটে দেওয়া হয়। আর অবুঝ শিশুও সান্তনার কিছু একটা পেয়ে অথবা মায়ের স্তন মনে করে খামুশ হয়ে যায়। ইংরেজীতে একে Baby Soothers বলে। সত্য বলতে কি, শিশুকে চুপ করানো অথবা সান্তনা দেয়ার জন্য এই চুশনীই তাদের পেটে বিভিন্ন রোগ জীবাণু প্রবেশ করায়।

আর তা এভাবে যে, গলায় জুলানো চুশনী বা নিপলের উপর মাছি, মশা প্রভৃতি জীবাণু নিয়ে উড়ে এসে বসে এবং মল ত্যাগ করে।

শিশু ক্ষুধার তাড়নায় অথবা অন্য কোন অসুবিধার কারণে কান্না জুড়ে দিলে, তখন ঐ নিপল বা চুশনীই তার মুখে দেওয়া হয়। আর এতেই রোগ-ব্যাধির উৎপত্তি হয়।

এছাড়া শিশুর মা অধিকাংশ সময় গৃহস্থালী কাজ-কর্মে লিপ্ত থাকেন। যেমন, রান্না-বান্না, তরকারী কোটা, ঘর ঝাড় দেওয়া ইত্যাদি। তার হাতে

বিভিন্ন রোগের জীবাণু বিদ্যমান থাকতে পারে। শিশুর মুখে ফিডার বা চুশনী দেওয়ার সময় মায়ের জীবাণুভরা হাত তাতে অবশ্যই স্পর্শিত হয়। তখন শিশু জীবাণুভরা হাতের স্পর্শিত ফিডার বা চুশনীর মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি গলধঃকরণ করতে থাকে। তাতে শিশু বিভিন্ন রোগে রোগাক্রান্ত হয়ে যায়। পেটফাপা সহ বিভিন্ন অসুবিধায় পতিত হয়।

জনৈক শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার স্বীয় অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে বলেছেন যে, চুশনী ব্যবহারকারী বাচ্চারা কখনও পরিপূর্ণরূপে সুস্থ-সবল থাকতে পারে না। তার গলা সর্বদা খারাপ থাকে। তার কণ্ঠনালী ও ফেপড়া ফুলে যায়। বিধায়, সর্বদা কাশতে থাকে। যখন এ জীবাণু মিশ্রিত থুথু অথবা কফ পেটে যায়, তখন পেট ব্যথাসহ দাস্ত ইত্যাদি হতে পারে। নিয়মিত চুশনী ব্যবহারের কারণে কাশির সাথে সাথে শিশুর সম্মুখের দাঁত ও তার বরাবর উপরের তালুও বক্র হয়ে যায়। এছাড়া চুশনী টানার জন্য অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ তার হার্ডকে দুর্বল করে দিতে পারে।

অপারগতার ক্ষেত্রে ফিডার, নিপল পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য গরম পানিতে ফুটিয়ে নেওয়ার পদ্ধতি অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে।

কিন্তু একান্ত অক্ষমতা ও অপারগতা প্রকাশ না পেলে ফিডার চুশনী ব্যবহার না করাই শ্রেয়। পেয়ালা, গ্লাস অথবা চামচ দ্বারা দুধ পান করানোর অভ্যাস সৃষ্টি করা উচিত।

শিশুর বয়স চার মাসে পৌঁছলে, শুধুমাত্র দুধের উপর ভরসা না করে দুধের সাথে সেমাই, কাসটার্ড, দালিয়া, সাগু ইত্যাদি মিশ্রিত করে হালকা শক্ত খাবার এবং আলু, কলা, জাউ ও নরম খিচুড়ীসহ শক্তি ও বলবর্ধক অন্যান্য খাদ্য খাওয়ানো উচিত। তবে তা শিশুর চাহিদা অনুযায়ী, মাত্রাতিরিক্ত নয়। অন্যথায় হিতে বিপরীত হওয়ার আশংকাও রয়েছে।

সন্তান প্রতিপালনে মায়ের করণীয়

সন্তান প্রতিপালনে মায়ের করণীয় সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়ঃ

(১) শিশুদের জন্য সবচেয়ে উত্তম খাদ্য মায়ের দুধ। তবে শর্ত হচ্ছে, মায়ের দুধে যেন কোন প্রকার ত্রুটি না থাকে। যদি স্তন ক্যান্সার অথবা অন্য কোন রোগের কারণে মায়ের দুধ খারাপ হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু ঐ মায়ের দুধের চেয়ে সন্তানের জন্য ক্ষতিকারক আর কিছুই নেই। সুস্থ-সবল মা যদি এই নিয়ম পালনে অভ্যস্ত হয়ে যান যে, শিশুকে প্রতিবার

স্তন্যদানের পূর্বে এক দু'ফোটা খাটি মধু চুষিয়ে দেবেন, তাহলে তা শিশুর জন্য খুবই উপকারী হবে।

(২) শিশুর বয়স যখন সাত দিন, তখন থেকে দোলনায় ঘুম পাড়ানোর অভ্যাস করা যায়। ঘুম পাড়ানোর সময় শিশুকে (শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে) ইসলামী কবিতা বা ছন্দ শোনানো যেতে পারে। কোলে বা দোলনায় ঘুম পাড়ানো বা শোয়ানোর সময় শিশুর মাথা যেন উঁচু থাকে, সে-দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৩) শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন থেকেই তার মস্তিস্ক (BRAIN) ক্যামেরার মত কাজ করে। বরং ক্যামেরার যে বৈশিষ্ট্য, তার চেয়েও অধিক বৈশিষ্ট্য রাখে ঐ কচি শিশুর মস্তিস্ক। শিশু যা কিছু দর্শন করে, যা কিছু শ্রবণ করে, সব সংরক্ষণ করে। তাই তার সম্মুখে অন্য কোন শিশুকে উচ্চ শব্দে ধমকানো বা শাসানো উচিত নয়। যতটুকু নম্রতা, ভদ্রতা ও শিষ্ঠাচারের সাথে কথা-বার্তা বা আচরণ করা হবে, ঐ শিশু বাচ্চাও ততটুকু নম্রতা ও ভদ্রতার সাথে কথা বলতে শিখবে। মা কখনই শিশুর সামনে খিটখিটে মেজাজে, রুক্ষ ভাষায়, উচ্চ আওয়াজে কথা বলবেন না, বরং যিকির করতে থাকবেন, দু'আ পড়তে থাকবেন। অথবা ইসলামী ছড়া, কবিতা, বা ছন্দ আবৃতি করতে থাকবেন। এতে শিশুর ইসলামী মন-মানসিকতা তৈরী হতে থাকবে।

(৪) যখন দুধ ছাড়ানোর সময় নিকটবর্তী হবে এবং শিশু অন্য কিছু আহার করতে অভ্যস্ত হতে থাকবে, তখন এ বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তাকে কোন প্রকার শক্ত খাদ্য চাবাতে দেওয়া যাবে না। এতে দাঁত ডেবে যাওয়ার, বেঁকে যাওয়ার এবং দুর্বল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমনি ভাবে চকলেট, সুইট এবং টকমিষ্টি টফি ইত্যাদি খেতে না দিয়ে ঘরে তৈরী নরম পিঠা, হালুয়া, পায়েশ ইত্যাদি আহার্যরূপে দেওয়া উত্তম।

(৫) দুধ ছাড়ানোর নিকটবর্তী সময়ে শিশুকে পেট ভরে খাওয়াবেন না। পানিও বেশী পান করাবেন না। এতে হজম শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। শিশুর পেট ফুলে বা ফেঁপে থাকলে খাওয়ানো বন্ধ করে দিতে হবে। খাওয়ানোর পর শিশুকে ঘুম পাড়ানোর জন্য শুইয়ে দিতে হবে। এতে খাদ্য দ্রুত হজম হয়ে যায়। বদ হজম হতে পারে এমন খাদ্য মোটেই খাওয়ানো উচিত নয়।

(৬) যখন দাঁতের মাড়ি শক্ত হয়ে যায় এবং দাঁত উদিত হওয়ার সময় নিকটবর্তী হয়ে যায় বা দু'একটি দাঁত বের হতে দেখা যায়, তখন শিশুর

মাথায় এবং গ্রীবায় নিয়মিত ভাবে তেল মালিশ করতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শক্রমে এমন ঔষধ ব্যবহার করতে হবে- যাতে করে শিশুর দাঁত সহজেই বেরিয়ে আসে। কখনও কখনও লবন এবং মধু মিশ্রিত করে দাঁতের মাড়িতে নিয়মিত মৃদুভাবে মলতে থাকলে, দাঁত সহজেই প্রকাশ পেতে পারে।

(৭) চিকিৎসা গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বদস্বভাবের কারণেও শিশুর স্বাস্থ্য বিনষ্ট হয়। সুতরাং শিশুর মন-মানসিকতায় যেন বদস্বভাব স্থান না পায়, তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। ইসলামী আদর্শের মাধ্যমে একজন আদর্শ মা সমাজে আদর্শ সন্তান উপহার দিতে পারেন। বড় হয়ে সে সন্তান যে সৎকাজ, নেককাজ করবে তার সমপরিমাণ ছাওয়াবের অধিকারী মা-ও হবেন।

(৮) সামান্য ত্রুটি বা ভুলের কারণে বেত্রাঘাত, চপেটাঘাত, প্রচন্ড ক্রোধ, গোস্‌সা, ধমকানো, শাসানো থেকে বিরত থাকতে হবে। তুচ্ছ ঘটনা বা ছোট খাট জিনিষ হারিয়ে ফেললে অথবা ভেঙ্গে ফেললে, ফুলের মত সুন্দর, নিস্পাপ, কলিজার টুকরা, অবুঝ শিশুদের অপমানিত, লাঞ্ছিত করা ঠিক নয়। ভয়-ভীতি, মার-ধর, তিরস্কার, ভর্ৎসনা করা যাবে না। বরং নম্রতার সাথে তার ভুলটা ধরিয়ে দিতে হবে। প্রতিবারেই বলতে হবে, আগামীতে যেন এমন ভুল না হয়।

(৯) কচিকাচা শিশুদের বিশেষ এক প্রকারের খাদ্যে অভ্যস্ত করাবেন না। বরং সব ঋতুর খাদ্য খাওয়াতে থাকুন। তবে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে খাওয়াবেন। যখন এক খাদ্য হজম হয়ে যাবে, তখন অন্য খাদ্য দিতে পারেন। খাদ্য যতই সুস্বাদু ও উন্নতমানের হোক না কেন, অধিক পরিমাণে খাওয়াবেন না। পানি বেশী পান করাবেন না। টক খাদ্য খাওয়াবেন না। বিশেষ করে তেঁতুল বা তেঁতুলের তৈরী কোন খাদ্য দিবেন না। ভাল কাপড়, দামী কাপড়, অলংকার ইত্যাদির পিছনে মাত্রাতিরিক্ত খরচ না করে স্বাস্থ্যকর, পুষ্টিকর খাদ্য, ফল-ফলাদি বেশী করে খেতে দিন।

গর্ভকালীন সময়ে মাকে এবং শিশুর শৈশবের ক'টি বৎসর শিশুকে শক্তি বর্ধক, বলবর্ধক ফল-মূল, খদ্যদ্রব্য আহার করাতে হবে। শৈশবে যে শক্তি ও স্বাস্থ্য অর্জিত হবে, জীবনভর তা কাজে আসবে।

(১০) শিশুকাল থেকেই শিশুকে টুকিটাকি মেহনত ও কাজ-কর্মে অভ্যস্ত করানো প্রয়োজন। সীমালঙ্ঘন না হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখে দৌড়-ঝাঁপ, খেলা-ধুলা করতে নিষেধ করবেন না। বরং সৎ ও ভাল

ছেলে-মেয়েদের সাথে অবশ্যই খেলা-ধুলা করতে দিন। শিশুকে শিশু সুলভ আচরণ করতে দিন। যদি শিশুর স্ফুর্তি, দুষ্টমি, চঞ্চলতা, উচ্ছাসকে কঠোর হস্তে দমন করতে চান, যেমন–খবরদার! চিৎকার করো না, মোটেও জোরে কথা বলো না, কোন প্রকার চঞ্চলতা করো না, ঘরের মধ্যে দৌড়া-দৌড়ি করো না, হাসা-হাসি করো না ইত্যাদি, তাহলে কিন্তু শিশু মেধাবী ও বুদ্ধিমান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। তাই তো কথায় বলে, "শৈশবে যে যতটুকু চালাক, চতুর, চঞ্চল হয়, বড় হয়ে সে ততটুকু বুদ্ধিমান, বিদ্বান ও জ্ঞানী হয়।" যদি শিশুকাল থেকেই সে দুর্বল, ভীত ও অলস হয়, তাহলে বড় হয়ে কর্মঠ ও সচেতন কিরূপে হবে? বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় কিভাবে দিবে? তাই শিশুকে শিশু সুলভ আচরণ করতে দিবেন। তবে শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন যাতে না হয়, সে দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখুন।

সুসন্তান গড়ে তোলার সাতটি ধাপ

সন্তান মানুষ করার ফিলসফি সম্পর্কে কি আপনার ধারণা আছে? আমাদের মধ্যে যারা বাচ্চা-কাচ্চা বড় করছেন তাদের কাউকে যদি এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা হয়, তারা নিখুঁতভাবে কেউ হয়ত উত্তর দিতে পারবেন না। কারণ, আমাদের সন্তান মানুষ করার নিজস্ব কোন দর্শন নেই। আমরা বাচ্চার ডায়াপার বা ন্যাপি বদল, তার কান্না থামান, গল্প শোনান, বাচ্চার স্কুল ব্যাগ, বা টিফিন তৈরী করার কাজে অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকি। বাচ্চাকে সঠিক উপায়ে মানুষ করার সঠিক দর্শনটি কি? সে সম্পর্কে আমরা মাথা ঘামাই না। এক মাকে ঠিক উপরের প্রশ্নটি করা হলে তিনি হেসে ফেলে বললেন, "ফিলসফি আবার কি? বাচ্চা মানুষ করার যে সব নির্দেশিকা বই কিনেছি, সেগুলো সব তাকের মধ্যে সাজানো আছে। সেগুলোর উপরে এক স্তর ধুলোও জমেছে। তবে আমার কাছে সন্তান মানুষ করার দর্শন হল ভালবাসা দ্বারা চালিত হওয়া এবং যে সময় যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তা বুদ্ধি ও বিবেক মত সামাল দেয়া।"

এই মায়ের পন্থা একেবারে মন্দ নয়।, বিশেষজ্ঞরাও তার সঙ্গে একমত। বস্টনভিত্তিক সন্তান পালন শিক্ষা এবং পোষণ সংস্থা ফ্যামিলিয ফার্ষ্ট-এর নির্বাহী পরিচালক লিন্ডাব্রন বলেন, "এটা সত্য কথা যে, ভাল বাবা-মা হরার জন্য নির্দিষ্ট করা কোন পথ নেই। স্বাস্থ্যবান এবং সুখী শিশু কিন্তু বিভিন্ন রকম পরিবার এবং পরিবেশ থেকে আসতে পারে।"

বিশেষজ্ঞ যদিও আপনাকে এমন নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, আপনার ভালবাসা এবং বিবেক-বুদ্ধি দিয়েই আপনি সঠিকভাবে সন্তান পালন করতে পারেন তাতেও আপনি সম্ভবত সঠিক নির্দেশনাটি পাননি, আপনি ভাল বাবা বা মা হবার পথের খোঁজে এখনও হয়ত আপনি আঁধারে হাতড়ে ফিরছেন। তাদের জন্য সুসংবাদ, লিন্ডা ব্রাউন এবং তার মত আরও ক'জন সন্তান পালন বিশেষজ্ঞ আপনার সন্তানকে আত্মবিশ্বাসী এবং চৌকস করে গড়ে তোলার ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করার জন্য সাতটি প্রয়োজনীয় ধাপ উদ্ভাবন করেছেন।

১। মনোযাগ দিন

আপনার সন্তানের প্রতি আপনার খেয়াল রাখার মাত্রাটি বাড়াতে হবে। তার প্রতিটি চাহিদার দিকে আপনার নজর রাখতে হবে। এমনকি সে যদি তার স্বপ্নটি আপনাকে বলতে চায়, তাও আপনার শুনতে হবে। বাচ্চার প্রতি মনোযোগ দেয়াটা বাবা-মায়ের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তবে দিন দিন আপনার মনোযোগ দেয়ার মিশনটি চ্যালেঞ্জিং মনে হতে পারে। কারণ, বাচ্চারা খুব দ্রুত নিজেকে বদলাতে পারে।

ইউনিভার্সিটি অফ পিটসবার্গ-এর চাইল্ড ডেভলপমেন্ট বিভাগের অ্যাসিসটেন্ট প্রফেসর জারলিন ড্যানিয়েল পি এইচডি বলেন, "আপনি যখন মনে মনে নিশ্চিত হয়ে আছেন যে, আপনার সন্তানের মানসিক বিকাশে আপনার পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। ঠিক তখনই এমন হতে পারে যে, তার মধ্যে শারীরিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক এবং সামাজিক সম্পর্ক বৃদ্ধির এক বিস্ফোরণ ঘটেছে এবং তার মানে আপনার সন্তান একটু হলেও বদলে গেছে। আর এখন একটু অন্যরকম আরেক জনকে নিয়ে আপনার ভাবতে হবে অর্থাৎ আপনার পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে হবে।"

এমন অবস্থায় পড়েছিলেন ২ বছর বয়সী এক মেয়ে সন্তানের মা। তিনি তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "আমি মেয়েটিকে ছুড়ে দেয়া এবং গড়িয়ে দেয়া জিনিস কিভাবে ধরতে হয়, তা শেখাচ্ছিলাম। হঠাৎ করে সে এমন ভাব করল, যেন আমি ছেলেমি কাজ করছি। নিজের অবস্থার কথা ভেবে আমি হাসি চেপে রাখতে পারিনি। তবে আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিয়েছি যে, আমার বাচ্চার বোঝার পরিধি আরও একটু বেড়েছে। সুতরাং তাকে "অবোধ শিশু" না ভেবে শুধু "শিশু" হিসেবে দেখা শুরু করলাম।"

লিটল রক-এ অবস্থিত ইউনিভার্সিটি অফ আরক্যানসা ফর মেডিকেল সায়েন্সেস এ শিশু রোগ বিদ্যা বিভাগের- অধ্যাপিকা বেটি ক্যান্ডওয়েল পি এইচ ডি জানিয়েছেন, আপনি যখন আপনার শিশু সন্তানের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন, তখন পরোক্ষভাবে সে সৎ মূল্যবোধগুলো শিখে নেয়। যখন সে কোন মন্দ বা খেয়ালী কাজ করতে উদ্যোগী হয়, তখন এই সৎবোধগুলো তার মনের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় ভাবে কাজ করতে শুরু করে। তিনি বলেন, "তবে এটাও মনে রাখবেন, সে যখন শুকরিয়া বা ধন্যবাদ বলে, তখন অবশ্য এজন্য তাকে প্রশংসা করা উচিত। প্রতিবার না হলেও বলা উচিত, 'তুমি যখন ধন্যবাদ বল তখন আমার খুব ভাল লাগে।"

আমাদের প্রতিপাদ্য হচ্ছে, শিশুর প্রতি আপনাকে সার্বক্ষণিক মনোযোগ দিতে হবে। এটা সত্যিই একেবারে অসম্ভব। তবে আপনার সন্তানকে এটা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে হবে, কখন আপনি সময় দিতে পারবেন, কখন পারবেন না। যেমন এমন একটি সকালের কথা বিবেচনায় আনা যাক। পুরো পরিবার নিয়ে আপনি গ্রামের বাড়িতে যাবেন। খুব ঝুট-ঝামেলায় দিনটি শুরু হয়েছে। আর আপনার সাড়ে তিন বছরের মেয়েটি ঘ্যান ঘ্যান শুরু করল, তার পোষা ময়নাটার কি হবে এই বলে। বার বার একটা কথা বলে সে কানের পোকা নাড়িয়ে দিয়েছে। ব্রাউন এ ধরনের পরিস্থিতির উল্লেখ করে বলেছেন, "আপনি সাধারণত বলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ মা ওটা কি করা হবে বলছি' আপনি তাকে একটা কিছু বলেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনি তার কথাকে তেমন পাত্তা দিচ্ছেন না। কিন্তু এ সময় আপনার সন্তানটির প্রতি আপনার মনোযোগ আরও একটু বাড়ান উচিত এবং বলা উচিত 'মা তোমার কথা শোনা এখন আমার পক্ষে সম্ভব নয়, একটু অপেক্ষা কর। সব গুছিয়ে তোমার কথা শুনব।"

আর এ ধরনের প্রতিশ্রুতি দিলে তা পালন করা আপনার জন্য আবশ্যক। কারণ, প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে আপনি এটাই বুঝিয়েছেন যে, তার মতামতকে আপনি দাম দেন এবং তার মনে তার প্রিয় ময়নাটা নিয়ে আপনি কিছু করবেন এমন ধারণা জন্মেছে। সুতরাং সব ঝামেলা শেষ হবার পর তাকে বলুন, 'কিছুক্ষণ আগে তুমি তোমার ময়নাটির সম্পর্কে কিছু বলছিলে,এখন আমার হাতে কোন কাজ নেই, বল তো মা কি বলছিলে?'

আর বাচ্চার কথা শোনার ব্যাপারে সৎ হোন। ব্রাউন বলেছেন, "আপনার সন্তানরা যখন খুব ছোট তখন যদি তাদের কথায় পাত্তা না দেন,

তাহলে ওদের বয়স যখন ৬ বা ৭ হবে তখন দেখবেন, তারা কোন আবদার বা পরামর্শের জন্য আপনার কাছে আসছে না। এমন পরিস্থিতির শিকার বাবা-মায়েদের মুখে প্রায়শই, 'আমার বাচ্চাটা আমার সঙ্গে তেমন কোন কথাই বলে না, ধরনের উক্তি করতে শোনা যায়।"

২ সিদ্ধান্তে অটল থাকুন

শিশু বয়স থেকে আপনার শিশুটি আপনার কাছে যত সহজবোধ্য এবং স্বচ্ছ হবে, তার বড় হওয়াটাও হবে ততটা গঠনমূলক। সে যতটা রুটিন বাধা এবং নিয়মাবর্তী জীবন যাপন করতে শিখবে ততই তার ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় এবং নিরাপদ জীবন সুনিশ্চিত হবে। লিন্ডা ব্রাউন বলেছেন, 'বাচ্চাদের জগৎটা যদি রুটিনে বাঁধা থাকে, তাহলে তাদের জীবনটাও অনেক সবল হয়। এর ফলে তারা বুঝতে পারে কখন খেতে হবে, কখন কাপড় বদলাতে হবে, কখন গোসল করতে হবে এবং কখন ঘুমাতে হবে।"

'সীমা' শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এ বিষয়ে লিন্ডা বলেছেন, "আপনি যখন বলেন, 'কোন মারামারি চলবে না' তখন আপনার তৈরী নীতিতে আপনার অটল থাকতে হবে, তা যতবারই হোক না কেন। ধরুন, আপনার বাচ্চা যদি আপনাকে হালকা করে থাপ্পড় দিয়েছে, আপনি হয়ত 'ওর মেজাজটা খারাপ' বলেই একে ধর্তব্যের মধ্যে আনবে না। কিন্তু এমনটি করা কখনও ঠিক হবে না। আপনার নীতিতে অটল থাকুন। তার হাত ধরুন এবং জোরের সঙ্গে বলুন, কোন মারামারি চলবে না', যদি এর পরও সে থাপ্পড় মারা না থামায়, তাহলে তাকে নিরাপদ স্থানে অন্তরীণ করে রাখার মত হাল্কা শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে এতে যেন তার মেজাজ আরও বিগড়ে না যায়।"

নিউইয়র্ক নগরীর লেনক্স হিল হসপিটাল-এর শিশু মনোজ্ঞোবিদ স্ট্যানলি ট্যুরেকি এম.ডি বলেন, "নিয়মিত রুটিন আপনাকে মনোপীড়া থেকে বাঁচাবে এবং শিশুকেও শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করবে। 'নরমাল চিলড্রেন হ্যাভ প্রবলেমস টু' -এর লেখক বলেন, 'আপনার সন্তানটি যদি এমন হয় যে, প্রতিদিন সকালে কাপড়-চোপড় পাল্টানোর সময় সে ভীষণ ঝামেলা করে, তাহলে তার জন্য একটি পরিষ্কার রুটিন তৈরী করুন। এই রুটিন তৈরী করার জন্য এমন জায়গায়, এমন কিছু উপদেশ লিখে রাখতে পারেন যাতে ঘুম থেকে ওঠা, বাথরুমে যাওয়া কাপড়-চোপড় বদলান এসব দেখান হয়েছে। এমনটি করলে দেখবেন, তাকে বিভিন্ন কাজ

করাতে আপনার তেমন বেগ পেতে হচ্ছে না। আপনার তৈরী নিয়মনীতিগুলো ব্যাখ্যা করাও জরুরী। কারণ, এতে সে বুঝতে পারবে কোন কাজটি কেন করা দরকার। তবে আপনার ব্যাখ্যা যেন দুর্বোধ্য না হয়ে পড়ে। ব্যাখ্যা এমন হতে পারে- সকালে ঘুম থেকে তৈরী হওয়া মানে তাড়াতাড়ি তোমার ময়না পাখিটাকে খাবার দিতে পারা।

৩। ভালবাসা প্রকাশ করুন।

নিয়ম-নীতিতে অটল থাকা যতটা জরুরী, তারচেয়েও জরুরী আবেগ সংক্রান্ত ব্যাপারে অটল থাকা। জনৈক শিশু বিশেষজ্ঞ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "শিশু যদি বুঝতে পারে, যাই হোক না কেন তার বাবা মা তাকে নিঃশর্ত ভাবে ভালবাসে, তাহলে মা যখন বলবে, 'তোমার এ ধরনের আচরণে আমি সত্যিই দুঃখিত' তখন সে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়বে না।"

আপনি যদি আপনার সন্তানকে নিয়ম নামের একটি সীমার মধ্যে বাঁধতে চান, তাহলে দেখা যাবে সারাদিনই এটা করো না, ওটা ধরো না বলতে হচ্ছে; অর্থাৎ "না" বলায় আপনার আর সীমাবদ্ধতা রইল না। এতবার 'না' শুনলে আপনার শিশুর কল্পনা করার ক্ষমতা এবং ইচ্ছাশক্তি বাঁধা গ্রস্ত হতে পারে; এই দুটো বিষয়ই বাচ্চাদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। সুতরাং ধনাত্মক পন্থায় কিভাবে তাকে কোন অযাচিত কাজ থেকে দূরে রাখা যায়, তার চেষ্টা করতে হবে আপনাকে। তাকে মনে করিয়ে দেয়ার আগে যদি বিছানা ঠিক করার মত কাজ করে, তাহলে তার প্রশংসা করুন। এর পুরস্কারস্বরূপ মাঝে মাঝে নিয়ম শিথিল করুন। এর ফলে এটাই তার কাছে স্পষ্ট হবে আপনি তার এ প্রচেষ্টার মূল্যায়ন করছেন।

যতটুকু সম্ভব তার আগ্রহকে আমল দিন, যদি সেটি অনেক সময় আপনার সাথে না-ও মেলে। মনে রাখবেন, যেসব ব্যাপারে আপনার আগ্রহ বেশী, সেগুলো তার উপরে চাপিয়ে দেবেন না। যেমন যেসব বাবা-মা খেলা-ধুলা করেন বা ভালবাসেন, তারা চান, তাদের ছেলেমেয়েরা বেশী বেশী খেলাধুলা করুক এবং এ ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশ নিক। অথচ দেখা গেল, এ ধরনের বাবা-মায়ের সন্তানের আগ্রহ রয়েছে অন্য ক্ষেত্রে। জনৈক ডাঃ বলেন, আপনার বাচ্চার যেটুকু ক্ষমতা, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুন। আপনার ফ্যান্টাসি বা আপনার বাচ্চাটা যেন 'ওর মত হয়' এ ধরনের মানসিকতাকে প্রাধান্য দেবেন না। আপনার সন্তানের আগ্রহকে যদি আপনি প্রাধান্য দেন, তাহলে সে তার ক্ষেত্রে প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারবে এবং তার মনে নিজের প্রতি বিশ্বাস বাড়বে এবং আপনার প্রতি শ্রদ্ধাও বাড়বে।

৪ নিয়ম-কানুন সাময়িক শিথিল

অধিকাংশ বাবা-মায়ের মনে একটা দ্বন্দ্ব সব সময় কাজ করে। তারা অনেক সময়ই গোলক ধাঁধায় পড়ে যান যে, নিয়মনীতিতে অটল থাকবেন নাকি একটু ঢিল দেবেন। কিন্তু একটা ব্যাপার সব সময় মনে রাখা উচিত যে, আপনি যে নিয়ম-কানুন স্থির করেছেন, তা প্রয়োগ করাই হল আসল কথা। তবে কখনও কখনও রুটিনে যদি পরিবর্তন আনতে হয়ই, তাহলে সন্তানের কাছে তার কারণ পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করুন। যেমন বলতে পারেন, "তুমি তো জানো, ঘুম যাবার সময় হল রাত ৮টা। কিন্তু তোমার নানা-নানু আসায় তুমি আজ আরও কিছুক্ষণ জেগে থাকতে পারো।"

তবে আপনার সন্তান যদি ঘুম যাওয়ার ব্যাপারে গোয়ার্তুমি করে, তাহলে আপনার রুটিন কার্যকর হচ্ছে না ভেবে তা শিথিল বা বাতিল করবেন না। ডাঃ ট্যুরেরি বলেন, "কাঠামোকে কখনও খুব বেশী কঠিন করবেন না। যখন আপনার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তখন আপনার রুটিনকে পেছনে রেখে সেই সময়ের জন্য বিশেষ রকম পদক্ষেপ নিন।" আপনি যদি যৌক্তিক কারণে আপনার রুটিন শিথিল করেন, তবে বোঝা যাবে আপনি আপনার সন্তান, পরিবার এবং বাবা বা মা হিসেবে নিজের চাহিদার দিকে পূর্ণ নজর রাখছেন। ব্রাউন বলেন, "তবে আপনার সব সময়ই মনে রাখা প্রয়োজন যে, আপনার সন্তান যেন বুঝতে না পারে, তার গোয়ার্তুমির কারণেই আপনি রুটিন শিথিল করেছেন।"

তবে আবশ্যই কখনও কখনও আপনার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-কানুন শিথিল করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে জনৈক ডঃ বলেছেন, "আপনার নিয়মে আপনার বাচ্চাটি শুধু দেয়ালের বা গেটের ভেতরেই খেলাধুলা করতে পারবে। কিন্তু বাচ্চার বয়স যতই বাড়বে, সে গেটের বাইরে যেতে চাইবে। তখন আপনি তাকে বলতে পারেন, 'তুমি অবশ্যই মাঠে খেলতে পারো, তবে তোমার বাবা বা আমি তোমার উপর নজর রাখার জন্য কাছে থাকব।" ডাঃ ট্যুরকির মতে, নিয়ম-কানুনের ভেতর এবং ব্যাখ্যা সাপেক্ষে যৌক্তিকভাবে নিয়ম শিথিল করার ফলে শিশুর মধ্যে সমস্যা সমাধান করার সহজাত গুণের বিকাশ ঘটে। এছাড়া আপনার এ ধরনের সময়োচিত ব্যাখ্যাধীন নিয়ম শিথিল করার প্রবণতা আপনার সন্তানকে ভবিষ্যৎ জীবনে চলার পথে নীতি বিসর্জন না দিয়ে সমস্যা মোকাবিলায় সহায়তা করবে। তার সামনে চলার পথে সে দেশ আর সমাজে প্রতিষ্ঠিত নিয়মগুলো মেনে চলতে শিখবে।

৫। খোঁজখবর রাখুন

জনৈক ডঃ বলেন, "জীবনে বাবা-মা হবার মত জটিল অবস্থা বোধ হয় আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু এর পরও আমরা মনে করি বাচ্চা-কাচ্চা লালন-পালন করার জন্য আমাদের বিচারবুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতাই যেন যথেষ্ট। তবে এটা যদি সত্যিই কাজ করত, তাহলে সন্তান পালনে আমরা কখনই সমস্যার মুখোমুখি হতাম না।"

বাবা-মায়েদের জন্য সবচেয়ে যেটা প্রয়োজনীয়, তা হল বাচ্চার বয়সের সাথে তার শেখার ক্ষমতা কতটুকু তা জেনে নেয়া। যেমন আপনি ধারণা করতে পারেন, ৩ মাসের শিশুই 'না' ব্যাপারটি বুঝতে পারে, কিন্তু আপনি কি জানেন? এই বয়সের বাচ্চারা নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারটি বুঝতে পারে না। এ প্রসঙ্গে ক্যালনডওয়েল বলেন, 'যে বাবা-মায়েরা সর্বশেষ খোঁজখবর রাখেন না, তারা বাচ্চার থেকে বেশী কিছু আশা করেন।'

আধুনিক বাবা-মায়েদের জানার জন্য অনেক অনেক উপায় আছে। পরামর্শ পাবার জন্য বিশেষজ্ঞ আছেন অনেক। ডঃ ড্যানিয়েল পরামর্শ দিয়েছেন, "যারা আপনার বাচ্চাকে নিয়মিত দেখে এবং তার সম্পর্কে জানে, তাদের পরামর্শও অনেক সময় কাজে লাগতে পারে। এর মধ্যে আছে পরিবারের অন্যান্য সদস্য, বন্ধু-বান্ধব, পরিবারিক ডাক্তার।"

প্রথমবার বাবা হয়েছেন এমন এক ভদ্রলোক জানান, যখনই তিনি তার বাচ্চাটিকে ঘুম পড়ানোর জন্য শোয়ান, সে তার স্বরে কান্না জুড়ে দেয়। তার আরেক বন্ধু যিনি অনেক আগে বাবা হয়েছেন, তিনি তাকে বললেন, "তাকে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত কাঁদতে দাও, কোন অসুবিধা নেই।" "ভদ্রলোক বললেন, আমি চেয়ারে বসে হাতল ধরে আছি, বাচ্চাটা ভীষণ কান্না করছে, সইতে পারছি না। বারবার ঘড়ি দেখছি। কিন্তু তিন মিনিটের মাথায় দেখলাম, সে সুন্দর ঘুমিয়ে গেছে। আমি ভাবলাম, আমার বন্ধুটা জিনিয়াস।"

তবে পরামর্শ নেবার ব্যাপারে কখনও কখনও বাছবিচার করবেন। যেমন দাদা-দাদীরা নাতী-নাতনীদের সন্তান হলে প্রায়শই বলেন, 'আমি বুঝি না, তুমি এমনটা করছ কেন, আমার সময়ে তো আমি এমনটা করিনি।" মনে রাখবেন, আপনার নিয়ম যদি বিজ্ঞানসম্মত এবং যৌক্তিক হয়, তাহলে এটা করতে কেউ আপনাকে বাধা দিলে তা পাত্তা দেবেন না।

৬ যথেষ্ট বিশ্রাম নিন

ব্রাউন বলেছেন, "বাচ্চা মানুষ করা কতটা পরিশ্রমের কাজ, তা কোন বাবা-মাই তলিয়ে দেখেন না, বিশেষ করে বাচ্চা যখন একেবারে ছোট, তখন তো পরিশ্রম করতে হয় উদয়াস্ত। আপনি যদি বাচ্চার কারণে

নিয়মিত কাহিল হতে থাকেন, তাহলে এ সময় আপনার মেজাজ খিটমিটে হয়ে পড়তে পারে। আপনি যদিও আপনার সন্তানকে খুবই ভালবাসেন, কিন্তু খাওয়ানো, ন্যাপি-ডায়াপার পরিবর্তন এবং বাচ্চার জন্য আর সব কাজে আপনি এক সময় সামান্য হলেও বিরক্ত হতে পারেন। বাচ্চারা কিন্তু আপনার বিরক্ত হওয়াটা ধরে ফেলতে পারে। মুখে হয়ত বলবে না, কিন্তু *মনে মনে বাচ্চা ভাববে, 'মাকে খুব বিরক্ত মনে হচ্ছে বোধ হয় আমার* কোন ভুল হয়েছে।"

আপনি যদি বিশ্রামের জন্য সময় নেন, তাহলে আপনার সন্তানও আপনার চাহিদা সম্পর্কে সচেতন হবে না। এমন মত দিয়ে ডঃ ড্যানিয়েল বলেন, "আমার প্রথম বাচ্চাটির বয়স তখন এক বছরও হয়নি, সে ছিল অত্যন্ত অধৈর্য এক বাচ্চা। তার চাহিদা মেটানোর জন্য সারাক্ষণ আমার ছুটোছুটি করতে হত। একদিন আমার স্বামী বলল, "কোন দিনও আমাদের চাহিদা বুঝতে পারবে?' সাথে সাথে আমার চোখ খুলে গেল। আমি বুঝলাম, আমি তো আমার বাচ্চার কাছে আমার বিশ্রামের সময়টি চাইনি। আর চাইলে সময় দেয়ার মত বুদ্ধি ওর হয়নি। সুতরাং আমার সময়টি আমারই বের করে নিতে হবে।"

ভাল বাবা-মা হতে হলে বেশী না, এক বারে ১৫ মিনিট করে বিশ্রাম নেয়ার একটি রুটিন তৈরী করুন। আর এ সময় যদি আপনি আপনার বাচ্চাকে বলেন, "আমি খুব কাহিল বোধ করছি, আমি এখন কয়েক মিনিট বিশ্রাম নেব।" আর এক সময় বিশ্রাম নেয়ার রুটিন করে নিলে দেখবেন, বাচ্চার কাজগুলা করতে আপনার একটুও বিরক্ত লাগছে না। বাচ্চা আপনার চাহিদা বুঝে ফেললে নিঃসংকোচে তাকে বলতে পারবেন, "আব্বু, এখন তোমার সঙ্গে খেলতে পারব না, দুপুরের খাবার খেয়েই আমরা খেলব-কেমন?"

৭। আত্মবিশ্বাসী হোন

আগের ছয়টি ধাপে নির্দেশনা দেয়া হল, আপনি যদি সঠিকভাবে তা প্রয়োগ করতে পারেন, দেখবেন, নিজের উপর আপনার একটি প্রগাঢ় বিশ্বাস এসে গেছে। এবং এ অবস্থায় বাবা-মা হিসেবে আপনি হয়ে উঠবেন দুরদৃষ্টিসম্পন্ন। সন্তানের অনেক ব্যাপার আপনি তখন আগেই বুঝতে পারবেন। আপনি আত্মবিশ্বাস হারাবেন না কখনও। যদিও মাঝে মধ্যে ভুল হতেই পারে। আর আপনার আত্মবিশ্বাসই আপনার সন্তানকে নিশ্চয়তা দেবে যে, তার বাবা-মা যা করছেন, তা তার জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে।

শিশুকে একাকীত্বের আনন্দ উপভোগ করতে দিন

আপনার শিশুর বয়স যখন অনুর্ধ্ব এক বছর তখন যদি তাকে কিছুটা সময়ের জন্য তার বিছানায় একা রেখে আপনি অন্য কাজে ব্যস্ত হন বা ক্ষণিক সময় একাকীত্বে কাটান, তাহলে আপনার মনে অপরাধবোধ জাগতে পারে। কিন্তু আপনার বাচ্চাটিকে এ রকম একাকীত্বে সময় কাটাতে দেয়ায় কোন দোষ নেই। প্রকৃতপক্ষে এই বয়সে বাচ্চাকে দিনের কিছুক্ষণ একা থাকতে দেয়া উচিত। কারন এটি তার বেড়ে উঠার জন্য দরকারী।

'দ্য কল অফ সলিচ্যুড ঃ অ্যালোন টাইম ইন আ ওয়ার্ল্ড অফ অ্যাটাচমেন্ট'? বইটির লেখক এবং ক্লিনিকাল সাইকোলজিস্ট শেলার বুশোল্য জানিয়েছেন, আপনার যেমন একাকী বিশ্রাম নেয়া দরকারী মনে হতে পারে, শিশুর জন্য তার নিজস্ব জগতে একাকী থাকাটা জরুরী। তিনি বলেন, "মনে রাখতে হবে শিশু মাত্র কিছু দিন বা মাস আগে এক নিরাপদ স্থান থেকে পৃথিবীতে এসেছে। সেখানকার উদ্দীপক পরিবেশ বাইরের জগতের মত এতটা শক্তিশালী নয়।" আসলে গর্ভের বাইরের জগতের এসব উদ্দীপক তার কাছে বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে।

মাতৃগর্ভ থেকে যখন পৃথিবীর আলো দেখে, তারপর থেকেই শিশুর জন্য নিয়মিত নিজস্ব জগতে বিশ্রামের প্রয়োজন পড়ে। বুশোলয বলেন, শিশুর শেখার জন্য অনেক কিছু আছে। কিন্তু সে একবারে প্রচুর বিষয় শিখতে পারে না।" বুশোলয-এর মতে, "শিশু যখন একা থাকে তখন সে যা শিখল, তা খতিয়ে দেখার সুযোগটি পায়। এছাড়া এ সময় নীরবে তার আশপাশের দুনিয়াটা পর্যবেক্ষণ করারও সুযোগটি পায়। একাকী থাকার সময় শিশু নিজের উপযোগী করে শেখার পন্থা উদ্ভাবন করে।"

স্বল্প সময়ের একাকীত্ব শিশুর শারীরিক বিশ্রামের জন্যও খুব জরুরী। এ সময় নিজের মত করে বিশ্রাম করার সুযোগ পায়। এই বিশ্রাম তার মানসিক, শারীরিক বিকাশ এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম অব্যাহত রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া সাময়িক একাকীত্ব তাকে আত্মনির্ভর হতেও উদ্বুদ্ধ করে। এর ফলে সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার কিছু কাজে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। যেমন একাকী থাকলে শিশুর মধ্যে নিজেকে শান্ত রাখার একটি আত্মপ্রচেষ্টার জন্ম নেয়। এছাড়া, এমন অবস্থায় সে নিজে নিজে ঘুমাতে শেখে। একবার নিজে নিজে ঘুমাতে শিখলে ঘুম পাড়ানোর জন্য বাবা-মায়ের আর তাকে দোলাতে বা ছড়া শোনাতে হয় না।

সময় নির্ধারণ করা

গড়পড়তা শিশুর জন্য একাকী রাখার একটি রুটিন পালন করা উচিত। বাবা-মায়েদের দিনে কয়েকবার ১৫ থেকে ৩০ মিনিট করে শিশুকে একা বিশ্রাম করতে দেয়া যেতে পারে। তবে এসব নির্ভর করে বাচ্চার মেজাজের উপর। ইনট্রোভার্ট ধরনের শিশুরা সাধারণভাবে অতিরিক্ত সময় একা থাকতে পছন্দ করে না। অন্যদিকে এক্সট্রোভার্টরা এরচেয়েও বেশী সময় একা কাটাতে সক্ষম। শিশুর ব্যক্তিত্ব বুঝে নির্ধারণ করুন, কতটা সময় তাকে একা একা বিশ্রাম করতে দেয়া যাবে।

বাচ্চার মেজাজটিকেও খুব ভালভাবে বুঝতে হবে আপনার। আপনার সে-সব মুহূর্তগুলোকে বুঝতে হবে যখন আপনার বাচ্চাটি একা থাকতে চায় বা তাকে একা রাখা সম্ভব। বাচ্চা অনেক সময় নিজেই বিভিন্ন লক্ষণ প্রদর্শন করতে পারে। এ ধরনের লক্ষণের মধ্যে আছে, অন্যদিকে মুখ ফেরান, বাচ্চাকে খাওয়ানোর সময় হয়ত সে বিরক্ত করবে নতুবা খেতেই চাইবে না, কান্নাকাটি বা চোখ বন্ধ করে থাকা। অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চাকে স্পর্শ করলে সে রেগে যাচ্ছে অথচ ছেড়ে দিলে বা কোলে থেকে নামালে খুব শান্ত হয়ে যাচ্ছে, এ অবস্থাটিও নির্দেশ করে সে একা থাকতে চাচ্ছে। এমন অবস্থায় শিশুকে তার দোলনা, ঘের দেয়া বিছানা বা মেঝেতে কম্বল বিছিয়ে শুইয়ে শিশুর আগোচরে থাকুন, অথবা এমন স্থানে থাকুন, যেখান থেকে শিশুর নড়াচড়ার আওয়াজ পাওয়া যায়। অন্য রুমে থাকলে বেবী মনিটরের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। অনেক শিশু তার একাকী সময়টি ঘূর্ণায়মান কোন খেলনা অথবা অন্য কোন খেলার সামগ্রী নিয়ে কাটাতে চাইতে পারে। সুতরাং তার হাতের কাছে বা দৃষ্টিসীমানার মধ্যে এমন খেলনা রাখুন। অনেক সময় এমনও হতে পারে যে, সে শুধুই মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক দেখতে চাইছে বা আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে চাইছে।

অনেক শিশু ঘুমানোর আগে বা পরে নিজে নিজে সময় কাটাতে চায়। এ সময় একাকী সময়টির অর্থ হল নিদ্রাপূর্ব বা নিদ্রাপর ক্রান্তিকাল। অবশ্য অনেক শিশুই চায় তার ঘুমের আগে বা পরে তার আশপাশে কেউ একজন থাকুক। আসলে শিশুর বৈশিষ্ট্যগত বিভিন্নতার অভাব নেই। সুতরাং একেক জনের জন্য একেক ব্যবস্থা।

শিশুর মধ্যে একাকী থাকার মুড আনার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা অনেক সময় জরুরী হয়ে পড়ে। যেমন এ সময় লাইট ডিম করে দেয়া বা

জানালার পর্দা টেনে দিতে হতে পারে। এছাড়া কোমল না'ত বা গজল শুনালেও বাচ্চার মুড আসতে পারে। যেভাবেই আপনি আপনার অনূর্ধ্ব এক বছরের শিশুকে একাকীত্বের আনন্দ বোঝাতে চান না কেন, একটা বিষয় সব সময় মনে রাখবেন, তাকে কিন্তু চিৎ করে শোয়াতে হবে এবং লক্ষ্য রাখবেন, সে যেন উপুর হয়ে না শোয়।

বাচ্চা যে সময়ই একাকীত্বের স্বাদ অনুভব করবে, আপনার জন্যও যে বিশ্রামটি প্রয়োজন তা আপনি উপভোগ করুন। এতে সন্তান দেখাশোনায় আপনি প্রাণ শক্তি পাবেন। যেহেতু শিশু ও পিতা-মাতা খুব বেশী সম্পৃক্ত , সুতরাং এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, একজনের সমস্যা অন্যজনকেও প্রভাবিত করে। আর আপনি যদি উল্লসিতভাবে থাকেন, তাহলে আপনার সন্তানকেও হাসি-খুশী, সুস্থ এক মানুষ হিসেবে বড় করতে পারবেন।

সাত বছরের বাচ্চার জন্য কতটুকু ঘুম যথেষ্ট?

শিশু এবং বয়োপ্রাপ্ত সবার জন্যই শরীর ও মনকে বিশ্রাম দেয়ার জন্য ঘুম অত্যাবশ্যক। আমাদের দেহের বায়োলজিক্যাল ঘড়িকে রিসেট করার জন্যও ঘুমের প্রয়োজনীয়তা আছে। যদি কোন অবস্থায় দীর্ঘদিনের জন্য আমাদের ঘুম কম হতে থাকে, তবে আমাদের মধ্যে স্থায়ী অবসন্নভাব, উত্তেজনা এবং অসুস্থতা দেখা দিতে পারে।

শিশুদের জন্য ঘুমের প্রয়োজনীয়তা এর বাইরেও আরেক কারণে। যখন তারা ঘুমিয়ে থাকে, তখন তাদের বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি জোরদার থাকে। বাচ্চারা যখন সবচেয়ে বেশী বাড়-বাড়ন্ত তখনই তাদের ঘুমের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশী। আর এ কারণেই বয়োপ্রাপ্তদের তুলনায় শিশুরা অনেক বেশী ঘুমায়।

যে বয়সে শিশুদের বেড়ে ওঠার হার একটু কমে যায়, অর্থাৎ ৫ থেকে ১০ বছর বয়সে শিশুদের ৯ থেকে ১১ ঘন্টা ঘুম অত্যাবশ্যক। এ বয়সসীমায় শিশুরা যদি কম ঘুমায়, তাহলে খুঁজে বের করতে হবে কেন সে মনে করছে, তার আর ঘুম প্রয়োজন নেই, অর্থাৎ তার ঘুমটি কেন বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে– তা বের করতে হবে।

এখন ধরুন ৭ বছর বয়সী একটি শিশু যদি সারাদিনে ৮ ঘন্টা ঘুমায়, তাহলে তার মানসিক ও শারীরিক অবস্থাটি পর্যবেক্ষণ করাটা জরুরী। যদি দেখা যায়, সকাল বেলা খুব স্বাভাবিকভাবে তার ঘুম ভেঙেছে এবং সারাদিন সে হেসে-খেলে, পড়ালেখা করে তাহলে ধরে নিতে হবে কোন

অসুবিধা নেই। তবে এ থেকে যদি বিচ্যুতি ঘটে, তাহলে বুঝে নিতে হবে তার আরও ঘুম প্রয়োজন।

এমন অনেক শিশু আছে, যারা ঘুমানো পছন্দ করে না বলে ঘুমায় না। এমনও হতে পারে যে, তার সহোদর কেউ একজন জেগে থাকে বলে তাকে অনুসরণ করে সেও জেগে থাকে। অথবা বাবা-মায়ের আদর কাড়ার জন্য সে এমনটি করে। সারাদিনে বাবা-মাকে কাছে পাবার মত এমন সময় আর হয় না।

যদি আপনাদের সন্তানের মধ্যে কেউ কম ঘুমায়, তাহলে তার জন্য একটি কঠোর রুটিন বেঁধে দিতে পারেন। সঠিক সময়ে খাওয়া-দাওয়া তো আছেই, খেলাধুলার জন্য সঠিক সময় বেঁধে দিন, হোম ওয়ার্ক এবং রাতের খাবারও যেন নির্দিষ্ট সময়ে হয়। শেষে কিছুক্ষণের জন্য তাকে খেলতে বা হামদ-নাত শুনতে দিতে পারেন, তবে মনে রাখবেন মাদ্রাসা, স্কুল দিনগুলোতে তা যেন কখনও ৩০ মিনিট ছাড়িয়ে না যায়।

এই রুটিনের অর্থ হল, শিশু যেন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমায়। সময়টি বেঁধে দেয়া হয়েছে ঘুমে যাবার আগে আধঘন্টার জন্য। এরপরও তার ঘুম না এলে ১৫ মিনিট গল্প বা হামদ-গজল শুনতে পারে, কিন্তু এরপর অবশ্যই বাতি নেভাতে হবে।

এছাড়া বাচ্চাদের খাবারের দিকে বিশেষ নজর রাখা উচিত। বাচ্চা যদি কোলা, চা, কফির মত ক্যাফেইনযুক্ত পানীয় পান করে, তবে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবেই। এছাড়া সারাদিন অন্তত যদি আধঘন্টার পরিশ্রমসাধ্য খেলাধুলা না করে, তাহলে তার দেহে ঘুমের চাহিদা দেখা দেবে দেরী করে।

এরপরও যদি আপনার মনে কোন প্রশ্ন থেকে থাকে, তাহলে আপনার কম ঘুম যাওয়া শিশুটিকে যে কোন ভাল শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিন।

দৈনিক ইনকিলাব হতে সংকলিত।

শিশুদের কান্নার কারণ ও প্রতিকার

ফুলের মত কচি প্রিয় মুখের দুধের শিশুরা কোন না কোন কারণে যখন কাঁদে, তখন অন্যান্যদের মত কোন কোন মাও বিরক্তির আতিশয্য ক্রন্দনরত শিশুর প্রতি মন্তব্য করে যে, "কাঁদা ছাড়া যেন ওর কোন কাজ নেই।" ক্ষিধে লাগুক বা কোলে চড়তে ইচ্ছে করুক, অথবা নিজের ইচ্ছার

পরিপন্থী কোন কথা বা কাজ হোক, কিংবা কোন জিনিষ নিতে মনস্থ করুক–শিশু কাঁদতে শুরু করে দেয় এবং অধিকার ও মনের দাবী পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত কাঁদতে থাকে। বিশেষ করে ক্ষিধে পেলে তো কাঁদবেই। সম্ভবতঃ কুদরতীভাবে শিশুদের জানা হয়ে যায় যে, না কাঁদলে মা জননীও দুধ দিবেন না। না চাইলে দুধ বিক্রেতাও দুধ দেয় না। ক্রেতাকে প্রশ্ন করে, কতটুকু দুধ দেব? তারপর সে দুধ মেপে দেয়।

কচি কলিজার টুকরা অবুঝ শিশুদের সম্পর্কে কান্নার কারণে অলীক ও অসাড় মন্তব্য করা উচিত নয়। শিশুরা নিষ্পাপ, মা'সুম, অবুঝ। বড়দের মত চালাক, চতুর, বুদ্ধিমান হয় না যে, স্বার্থ হাসিলের জন্য অথবা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কাঁদবে। শিশুরা বিনা কারণে বা অপ্রয়োজনে কাঁদে না–এ কথা প্রতিটি মায়ের স্মরণ রাখতে হবে। কি কি কারণে শিশুরা কাঁদে তার কিছু তথ্য তুলে ধরা হল ঃ

❒ জন্মের পর শুধু প্রাথমিক দিনগুলোতে অধিকাংশ শিশুর কাঁদা তাদের জন্মগত, মজ্জাগত স্বভাব। যেমন, দু'সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক শিশু প্রতিদিন গড়ে দ'ঘন্টা করে ক্রন্দন করে। এক থেকে তিন মাসের শিশুরা সন্ধা বা রাত্রের গুরুলগ্নে কিছুক্ষণ অবশ্যই ক্রন্দন করে আত্মপ্রশান্তি লাভ করে থাকে। এর চেয়ে সামান্য বড় অর্থাৎ পাঁচ/ছয় মাস বা তার অধিক বয়সের শিশুরা হাত-পা নেড়ে, দাপা-দাপি করে খেলাধুলা করতে চায়। তাদেরকে বিছানায় কিংবা দোলনায় শুইয়ে দিলে কাঁদতে আরম্ভ করে।

❒ দরজার আংটা বা শিকলের ঝংকার শিশুদের মনোরঞ্জনের খোরাক জোগায়। খেলনা বা ঝুনঝুনির মিষ্টিমধুর আওয়াজে শিশুরা কান্না ভুলে গিয়ে ফোকলা দাঁতে হাসতে শুরু করে। কিন্তু যদি অনবরত কাঁদতেই থাকে, আর চুপ করার নামও না নেয় , তখন কিন্তু বুঝতে হবে যে, এটা নিছক কান্না নয়, বরং কোন রহস্য আছে। পেটে অথবা শরীরে নিশ্চয় কোন ত্রুটি বা অসুবিধা দেখা দিয়েছে। তখন অবশ্যই শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করুন।

❒ ক্ষুধার কারণেও শিশুরা কাঁদে, খ্যান খ্যান করে। অধিকাংশ শিশুর দু'তিন ঘন্টা পর পরই ক্ষুধা পায়। দুধ পান করালেই চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ে।

❒ পিপাসার কারণেও শিশু কাঁদে। গরম কালে এবং জ্বর চলা কালে শরীর থেকে প্রচুর পরিমানে ঘাম নির্গত হয়। তাই শিশুদের বার বার পানির পিপাসা পায়। পিপাসার সময় পানি না পেলে কাঁদতে থাকে। যদি সামান্য পানি পান করানো হয়, তাহলে তৎক্ষনাত চুপ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে

অথবা খেলতে থাকে। অনেক মা-ই পিপাসার কারণে শিশুর কান্নার ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারেন না। বরং ক্রন্দনরত শিশুর উপর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলে থাকেন-"কাঁদুক, যত মনে চায় কাঁদুক"। কোন বিবেকবান আদর্শ মায়ের জন্য এ আচরণ সমীচীন নয়। এটা সরাসরি ঐ অবুঝ শিশুর উপর জুলুমের শামিল।

❒ পেশাবে ভিজে যাওয়ার কারণেও শিশু কাঁদে। কাঁথা, লেপ বা প্যাক করা প্যান্ট পেশাবের পানিতে ভিজে গেলে শিশু ঝঞ্ঝাটাবস্থা অনুভব করে, তাই কাঁদতে থাকে। ভিজে কাঁথা অথবা পেশাব প্লাবিত জামা পরিবর্তন করে দিলে চুপ হয়ে যায়। কোন কোন মা নিজ সুবিধার্থে শিশুকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত PAMPAR অথবা প্যাকিং করা প্যান্ট পরিয়ে রাখেন, যাতে করে বার বার প্যান্ট বা কাঁথা পরিবর্তন করার ঝামেলা পোহাতে না হয়। এটা করা উচিত নয়। এটা অবুঝ শিশুর প্রতি মায়ের পক্ষ থেকে জুলুমের নামান্তর। এতে শিশুর শারীরিক বর্ধন প্রক্রিয়া বাঁধাগ্রস্ত হয়।

❒ পাতলা পায়খানা বা আমাশয় দেখা দেয়, তখন বারবার পায়খানা হওয়ার কারণেও শিশুরা কাঁদে। যদি বাচ্চার পাতলা পায়খানা জনিত কষ্ট অথবা পেট ব্যথার কারণে শিশু কাঁদতে থাকে। এক্ষেত্রে স্যালাইন খাওয়ানো ও ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

❒ চুলকানীর কারণেও শিশু কাঁদে। শিশুরা শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে দুই উরুতে অথবা লজ্জাস্থানে চুলকানী. দাউদ, একজিমাজনিত কষ্টে কাঁদতে থাকে। এর চিকিৎসা হল-জ্বলা নিরামক কোন ঠান্ডা ক্রীম ব্যবহার করা। ক্রীম ব্যবহার অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শক্রমে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

❒ পেট ব্যথা ও পেটে গ্যাস হওয়ার কারণেও শিশু কাঁদে। গ্যাসজনিত কারণে পেট মোচড়ানো, পেট কামড়ানো দুধের শিশুর কাঁদার হেতু। যদি দুধপান করানোর পর শিশুকে বুকের সাথে লাগিয়ে ঢেকুরের মাধ্যমে পেটের গ্যাস গলা দিয়ে নিঃসারণ করিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে হয়ত শিশু পেটের ব্যথায় কাঁদবে না। কিন্তু ঢেকুরের মাধ্যমে গ্যাস বের করার পরও যদি শিশু একাধারে কাঁদতে থাকে, তাহলে অবশ্যই শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শ্মরণাপন্ন হোন।

❒ একাকীত্বের কারণেও শিশুরা কাঁদে। শিশু যদি কামরায় একাকী ঘুমায় এবং ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে আশে-পাশে কাউকে দেখতে না পায়, তখন বেজার হয়ে কাঁদতে থাকে। শিশুরা নির্জনতা ও একাকিত্বকে খুব ভয়

পায়। এমতাবস্থায় কোলে নিয়ে মন ভোলানোর চেষ্টা করলে, চুপ হয়ে যায়।

❒ দাঁত ওঠার সময়ও শিশুরা কাঁদে। যখন শিশুর প্রথম দাঁত উঠতে শুরু করে, তখন দাঁত উঠার ব্যথায় কাঁদতে থাকে।

❒ শিশুদের নিদ্রা যদি পূর্ণ না হয়, তাহলেও শিশুরা কাঁদতে থাকে। তাছাড়া নিদ্রার বেগ হলে, যদি মা ঘুম পাড়াতে বিলম্ব করে অথবা ঘুমাবার উপযোগী জায়গা না পায় কিংবা ঘুম পাড়ার বিছানা মন মত না হয়, তাহলেও শিশুরা কাঁদতে থাকে।

❒ জ্বর, সর্দি ও কাশির কারণেও শিশুরা কাঁদে। শিশুর যদি জ্বর, সর্দি, কাশি হয় তখনও বিতৃষ্ণার কারণে সে কাঁদে। জ্বর বা সর্দির প্রচন্ডতায় শিশুর মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। খাওয়া-দাওয়া, নিদ্রা-জাগরণ কিছুই ভাল লাগে না। ভাল লাগে শুধু কান্না আর কান্না। শিশুর এ নাজুক পরিস্থিতি মাকে ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে সামাল দিতে হবে।

❒ অনেক সময় শিশু কানের ব্যথায়ও কাঁদে। কথা দিয়ে বুঝাতে পারে না বলে বার বার কানে হাত দেয়। এতে মায়ের বুঝে নিতে হবে যে, নিশ্চয় কানে কিছু হয়েছে।

❒ মাথা ধরার কারণেও শিশু কাঁদে। জ্বর বা সর্দির প্রচন্ডতায় অবুঝ শিশুর মাথা ধরতে পারে। চোখ দিয়ে পানি পড়তে পারে। তখন শিশুর মাথা ও কপাল প্রচন্ড গরম হয়ে যায়। মাথা ব্যথার কারণে শিশু কাঁদতে থাকে।

অনেক মায়েরা কান্নার প্রকৃত কারণ উদঘাটন না করেই শিশুকে ধমকাতে থাকে। অনেক মায়েরা কান্না থামানোর জন্য মুখ চেপে ধরে। কেউ কেউ গালে চর কষে দেয়। এটা শিশুর প্রতি সরাসরি জুলুম। এতে শিশু মারাত্মক ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন তাকে যে-ই কোলে নিতে চায়, আশ্রয় মনে করে তার কোলে চলে যায়।

যদি শিশু দুধ পান করা ছেড়ে দেয়, চেহারায় রোগের ছাপ লেগে থাকে, জ্বরে আক্রান্ত হয়, ডায়রিয়া দেখা দেয়, অস্থিরতায় ভোগে, সারাক্ষণ কাঁদতেই থাকে, তাহলে কিছুমাত্র বিলম্ব না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোন শিশু বিশেষজ্ঞের স্মরণাপন্ন হোন। আর সদা-সর্বদা শিশুর স্বাস্থ্য, সুস্থতা ও উন্নতির জন্য মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করতে থাকুন।

শিশুদের শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া

আদর্শ মায়ের কর্তব্য এই যে, শিশুদেরকে সালাম দেওয়া শিক্ষা দিবেন। যাতে করে যখন তাদের কারো সাথে দেখা-সাক্ষাত হবে, তখন যেন 'স্বাগতম' 'আদব' 'খোশ আমদেদ' 'কেমন আছেন'? 'ভাল আছেন'? না বলে সর্ব প্রথম "আস্‌সালামু আলাইকুম" বলতে অভ্যস্ত হয়। এমনি ভাবে কারো ফোন এলে হ্যালো (Helo) না বলে সর্ব প্রথম "আস্‌সালামু আলাইকুম" বলতে শিখে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে সালামের খুব তাকীদ ও গুরুত্ব এসেছে। এতে পারস্পরিক স্নেহ-মমতা ও ভালবাসা সৃষ্টি হয় এবং উপস্থিত শ্রোতাদের মাঝে এর খুব সুন্দর প্রভাব পড়ে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ "যখন তোমাদেরকে সালাম দেওয়া হয়, তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তম অথবা অনুরূপ সালাম দ্বারা উত্তর দাও। (সুরাহ নিসা, ৮৬)

উল্লেখিত আয়াতে মুসলিম জাতিকে সালাম ও তার উত্তর প্রদানের আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

সালাম প্রথা সূচনার ইতিহাস

ইসলামপূর্ব জাহিলিয়্যাতের যুগে প্রাচীন আরবের অধিবাসীদের অভ্যাস ছিল যে, যদি তারা পারস্পরিকভাবে মিলিত হত, তাহলে তারা অভিবাদন স্বরূপ বলত, "হাইয়্যাকাল্লাহু" অর্থ-আল্লাহ তোমায় দীর্ঘজীবী করুন। ইসলাম এই প্রথা পরিবর্তন করে "আস্‌সালামু আলাইকুম" বলার নিয়ম জারী করে। যার অর্থ-"তুমি সর্বপ্রকার দঃখ-কষ্ট, বালা-মসীবত, বিপদাপদ হতে নিরাপদ ও শান্তিতে থাক।"

তবে সালামের মাধ্যমে অভিবাদন, শ্রদ্ধা বা সম্মান প্রকাশের পদ্ধতি কবে থেকে সূচনা হয়েছে, সে সম্পর্কে জানা যায় যে, মহানবী (সাঃ) ইসলামের প্রারম্ভ অর্থাৎ মক্কী জীবনের শুরুতেই মুসলমানদেরকে সালাম প্রদানের আদেশ দেন। আর এরপর থেকেই সালাম প্রথার প্রচলন শুরু হয়।

সালাম বিধানের সূচনা যে ইসলামের শুরু মক্কী যিন্দেগীতেই হয়েছে, তার প্রমান আমরা বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারা জানতে পাই। তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের সুদীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন-আমি মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হলে, তিনি আমাকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে অভিবাদন জানালেন। তখন

আমি উত্তরে বললাম- ওয়া আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।' অতঃপর হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন, ইসলমের ইতিহাসে সর্ব প্রথম যাকে সালাম দেয়া হয়, আমি-ই সেই ব্যক্তি। (ফাতহুল বারী, ১১ ঃ পৃ ঃ৪)

সালাম দেয়ার ফজীলত

ইসলাম প্রদর্শিত সালামের বিধান একাধারে অভিবাদন, দু'আ ও ইবাদত। হাদীস গ্রন্থসমূহে সালামের ফজীলত সম্পর্কিত একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হল ঃ

❒ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন- "তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না-যতক্ষণ না তোমরা ঈমানদার হও। আর তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না-যতক্ষণ না তোমরা একে অপরকে ভালবাস। আমি কি তোমদেরকে এমন কাজের পথ বাতলে দিব-যা করলে তোমরা একে অপরকে ভালবাসতে পারবে? তা হল- তোমরা নিজেদের মাঝে সালামের ব্যপক প্রচলন ঘটাও।" (আবু দাউদ,৭০২)

অন্য একটি হাদীসে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন- জনৈক ব্যক্তি প্রিয় নবীজী (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা করল, ইসলামের সর্বোত্তম আমল কি? উত্তরে তিনি বললেন-(ক্ষুধার্তদের) খাবার খাওয়ানো এবং চেনা-অচেনা সকলকে সালাম দেওয়া। (আবু দাউদ, ৭-৬)

অপর একটি হাদীসে নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করেন, "তোমরা করুণাময় আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর এবং সালামের ব্যাপক প্রচলন কর।"

শিশু-কিশোরদেরকে সালাম দেওয়া

বড়রা কচি কচি কোমলমতি শিশু-কিশোরদেরকে সালাম দিবেন। এটা প্রিয় নবীজীর আদর্শ ও সুন্নত। এতে করে সেও অন্যকে সালাম দিতে শিখবে। কচি কন্ঠের "আস্‌সালামু আলাইকুম" অভিবাদনটি শুনতে বড় মজাদার হয়। মুসলিম শরীফের ২য় খন্ডে হযরত আনাস (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে. তিনি বর্ণনা করেন-মহানবী (সাঃ) একবার একদল শিশু-কিশোরদের নিকট দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তখন তিনি তাদেরকে সালাম দিলেন।

হযরত বুনানী (রহঃ) বলেন, (নবীজীর সুন্নত অনুযায়ী) হযরত আনাস (রাঃ) যখনই ছোট ছোট শিশু-কিশোরদের পার্শ দিয়ে কোথাও যেতেন, তখন সালাম দিতেন। তিনি বলেন, নবীজীও (সাঃ) এরূপ করতেন।

শিশুদেরকে সালাম দেয়ার ফায়িদা

বড়রা সংকোচ পেরিয়ে শিশুদেরকে সালাম দিলে—

❒ শিশুরাও অন্যকে সালাম দেয়ার অভ্যস্ত হবে।

❒ বড়দেরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

❒ শিশুদের মাঝে ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত হবে।

❒ এর দ্বারা বড়দের মাঝে বিনম্রতার ভাব প্রকাশ পাবে।

❒ ছোটদেরকে সালাম দেওয়ার মধ্যে 'সৎকাজের আদেশ'—এর দায়িত্ব পালনের অভ্যাস গড়ে উঠবে। কারণ, শিশুদেরকে সালাম দেয়ার অর্থ, এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা যে, তোমরাও সালাম বিনিময়ে অভ্যস্ত হও।

সালামের মাধ্যমে শিশুরা বড়দের থেকে শান্তির দু'আ লাভ করে ।

মুসলিম সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ, ভ্রাতৃত্ব, আন্তরিকতা, মায়া-মমতা ও ভালবাসা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলাম যে সকল সৌজন্যমূলক আচার-আচরণের নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধান প্রবর্তন করেছে, তা সন্তানদেরকে শিক্ষা দেওয়া প্রত্যেকটি আদর্শ মায়ের পহেলা নম্বর দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, বিজাতীয় সভ্যতা ও শিক্ষা সংস্কৃতির ভক্ত অনেক আপটুডেট মায়েরা কোমলমতি কচি-কাচা শিশুদেরকে সালাম ও ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন শিক্ষাদানের পরিবর্তে "গুড মর্নিং", "গুড আফটারনুন", "গুড ইভিনিং", "থ্যাংক ইউ", "টাটা", "হ্যান্ডশেক", ধন্যবাদ", শুভাগমন", "স্বাগতম", "বিদায়", "শুভযাত্রা", "ওকে" ইত্যাদি শিক্ষা দেয়। এটা আমাদের জন্য অবশ্যই অশোভনীয়। নিজস্ব কৃষ্টি-কালচার বাদ দিয়ে বিজাতীয় ধ্যান-ধারণার আমদানীতে শিশু-কিশোরদের ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত হওয়ার পরিবর্তে নৈতিক অবক্ষয়ের দ্বার সুগম হওয়া ছাড়া আর কি হবে? অবশ্য নিয়মতান্ত্রিক সালামের পর কুশল বিনিময়ে "স্বাগতম", "খোশ আমদেদ" ইত্যাদি বলা যেতে পারে।

সন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতা আল্লাহ তা'আলার দান

একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট ও বাস্তব পরীক্ষিত সত্য যে, মাতা-পিতার বিশেষ করে মায়ের অন্তরে সন্তানের জন্য গচ্ছিত স্নেহ-মমতা মজ্জাগত, জন্মগত ও সহজাত স্বভাবের বহিঃপ্রকাশ। এটা নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ তা'আলার দান। সন্তানের পরিচর্যা, দেখা-শুনা ও হিফাজত করা, তাদের প্রতি স্নেহ-মমতা, দয়া, অনুগ্রহ, আদর-সোহাগ, কৃপা-করুণা

প্রদর্শন এবং তাদের সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান ও সার্বিক প্রয়োজন সমূহের সুব্যবস্থা করা। এসব কিছু কুদরতীভাবে মাতা-পিতার হৃদয় গভীরে জমাট পাথরের মত গেঁথে দেয়া হয়েছে। তাদের শিরা-উপশিরায়, রন্ধ্রে রন্ধ্রে, ধমনীর প্রতিটি কণায় কণায় সন্তানের প্রতি ভালবাসা প্রথিত হয়ে আছে। সন্তানের জন্য মাতা-পিতার অন্তরের পূঞ্জিভূত এ মায়া-মমতা যদি বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত না হত, তাহলে এ ধরণীর বক্ষ থেকে মানবজাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যেত। কারণ, মাতা-পিতা তখন কিছুতেই সন্তানের রক্ষনাবেক্ষণ, লালন-পালন ও পরিচর্যার সীমাহীন কষ্ট ও ঝামেলা বরণ করে নিত না এবং তাদের খোরপোষ, নাওয়া-দাওয়া, দেখা-শুনা ও লেখা-পড়া করিয়ে সমাজে শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করত না। অধিকন্তু, সন্তানের কাজ-কর্ম, সুখ-শান্তি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদির জন্য দৌড়-ঝাঁপ, মেহনত ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করত না। আল্লাহ প্রদত্ত স্নেহ-মমতা অন্তরে আছে বলেই পিতা-মাতা সন্তানের জন্য সব রকমের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে যায়।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মাতা-পিতার মনের মনিকোঠায় রক্ষিত ঐ জন্মগত মায়া-মমতা ও সহমর্মিতার চেতনাবোধ, উপলব্ধি শক্তি এবং আবেগ-প্রবণতাকে চিত্রায়িত করেছে। এ মর্মে পবিত্র কুরআন সন্তানকে জাগতিক সৌন্দর্য আখ্যায়িত করেছে। যেমন সূরাহ কাহাফের ৪৬ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ "ধন-সম্পত্তি ও সন্তান- সন্ততি পার্থিব জগতের সৌন্দর্য।" কোথাও তাদেরকে মহান আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় নিয়ামত ঘোষণা করা হয়েছে। সূরাহ বণী ইসরাঈলের ৬ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছেঃ "আমি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দ্বারা অনুগ্রহিত করলাম এবং তোমাদেরকে জনসংখ্যার দিক দিয়ে একটা বিরাট বাহিনীতে পরিণত করলাম।"

এছাড়া পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার অন্তরে মায়া-মমতার যে আবেগ, উপলব্ধি, স্নেহবোধ ও সহমর্মিতা বিদ্যমান, তার বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

মহানবী (সাঃ) সন্তানের প্রতি মায়া-মমতা, আদর-সোহাগ ও দয়া-করুণা প্রদর্শনের খুব তাগিদ করেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থ 'কিতাবুল মুফরাদ'- এ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, জনৈক সাহাবী নবীজীর (সাঃ) দরবারে এক শিশু সন্তানসহ উপস্থিত হন। তিনি আদর-মায়ায় আপ্লুত হয়ে তাকে নিজের দেহের সাথে জাপটে

ধরছিলেন। নবীজী (সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওর জন্য কি তোমার মায়া লাগছে? তিনি উত্তরে বললেন, জি, হ্যাঁ। তখন মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করলেন-"আল্লাহ তা'আলা তার চেয়ে বেশী তোমার প্রতি করুণাময় ও অনুগ্রহশীল-যতটুকু তুমি এ বাচ্চার প্রতি স্নেহশীল। তিনি অত্যন্ত করুণাময় ও দয়ালু।"

নবী করীম (সাঃ) যদি কোন সাহাবীকে নিজ সন্তানের প্রতি বে-রহম, দয়া-মায়াহীন দেখতেন, তাহলে তাকে সাবধান করতেন। আর তার পরিবার বংশ, সমাজ ও সন্তানদের উপকার সাধিত হয়- এমন কিছু দিক নির্দেশনা ও হিদায়াত প্রদান করতেন। ইমাম বুখারী স্বীয় গ্রন্থ 'কিতাবুল মুফরাদ'- এ হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন- একদা এক গ্রাম্য লোক নবীজীর (সাঃ) দরবারে উপস্থিত হল এবং বলল, আপনারা কি আদর সোহাগচ্ছলে নিজ সন্তানদের চুম্বন করেন? আমরা তো চুম্বন করি না। তখন মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করলেন, "যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তর থেকে দয়া-মায়া দূর করে দেন, তাহলে আমি কি আর করতে পারি?"

তাই প্রতিটি আদর্শ মায়ের কর্তব্য এই যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে, কথা-বার্তায় সন্তানদের সাথে দুর্ব্যবহার, মারপিট, কুশাসন ও অশালীন আচরণ না করে বরং তাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত স্নেহ-মায়া, আদর-সোহাগ দিয়ে ইসলামী অনুশাসনের মাধ্যমে আদর্শ সন্তান হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন।

সন্তানকে শাসন করার পদ্ধতি

নিঃসন্দেহে সমস্ত মা-ই নিজ নিজ সন্তানকে ভালবাসেন, আদর সোহাগ করে থাকেন, স্নেহ-মমতা দিয়ে তাদেরকে ঢেকে রাখেন। কোন কোন মা তো খুব বেশী-ই আদর সোহাগ করেন। এ-ই আদর সোহাগ, স্নেহ-মায়া কোন কোন শিশুর জীবনের পাথেয় হয়ে ভবিষ্যতে তাকে "মহান ব্যক্তিত্ব" রূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে এবং কোন কোন শিশুকে অজ্ঞ, অমানুষ, অশিক্ষিত, অভদ্র, অবাঞ্ছিত রূপে সমাজে ধিকৃত করে তোলে।

এর কারণ হল- আদর-সোহাগ মায়া-মমতা করার স্থান, কাল, পাত্র বুঝতে পারা, চিনতে পারা অথবা চিনতে ভুল করা। যেমন, যে সময়টায় করণীয় ছিল মায়ের পক্ষ থেকে শিশুকে সান্ত্বনা দেওয়ার, স্নেহ করার, সে

সময়ে তাকে শাসন করা, ধমকী দেওয়া, ভয় দেখানো বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। আর যে সময়টায় করণীয় ছিল তাকে সতর্ক করার, শাসন করার, সে সময়ে তাকে আদর-সোহাগ করা, ধন্যবাদ দেওয়া তাকে বেপরোয়া করে তোলে। এটা শিশুর জন্য অবশ্যই ক্ষতিকর।

উপমা স্বরূপ বলা যেতে পারে, যেমন-শিশু আত্মীয়-স্বজন বা অন্য কারো বাড়িতে দাওয়াত খেতে বা বেড়াতে যেয়ে "আদেখলাপনা" শুরু করেছে এবং দস্তরখান থেকে বা প্লেট থেকে কিংবা ট্রে থেকে খাদ্যদ্রব্য উঠিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করছে। তখন তার এ দৃশ্য দেখে মা জননী আনন্দে আত্মহারা হয়ে স্বগর্বে উপস্থিত মেহমানদের সম্বোধন করে বলছেন, দেখ, দেখ, আমার বাচ্চাটা কেমন নির্ভীক সাহসী! এখানে কত সুন্দর মনটা ভরে তৃপ্তি সহকারে খাচ্ছে। অথচ আমার ঘরে খেতেই চায় না। খাক, মন ভরে খাক। যেভাবেই খেতে চায় খাক। কেউ বাঁধা দিও না। এটা কিন্তু অনুচিত। বরং বাড়িতে ফেরার পর সন্তানকে উৎসাহিত করার পরিবর্তে কঠোর ভাবে বুঝানো উচিত যে, "প্রিয় বৎস! আমাদের ঘরে কি কখনও ঐ সমস্ত খাদ্য দ্রব্য দেখনি, যা মেহমানদের জন্য ঐ বাড়িতে তৈরী করা হয়েছিল? খাদ্য দ্রব্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে খাওয়া বা ফেলে দেওয়া খুবই খারাপ অভ্যাস। এমন নোংড়া স্বভাব তো ঐ সমস্ত শিশুদের থাকে-যারা কোন দিন এমন খাদ্য চোখে দেখে না বা এমন খাদ্য খাওয়া যাদের ভাগ্যে জোটে না। আল্লাহ তা'আলার কত বড় অনুগ্রহ আমাদের প্রতি যে, তিনি আমাদেরকে পানাহারের জন্য কত নেয়ামত দান করেছেন। যদি তুমি এমনটি কর, তাহলে তা হবে আল্লাহর নাশুকরী, অকৃতজ্ঞতা। আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তাহলে যা কিছু আমাদেরকে দান করেছেন, তা ছিনিয়ে নিবেন। আর তখন আমরা গরীব হয়ে যাব। সুতরাং আগামীতে এমনটি কখনও করবে না।" এমন নসীহত আর কঠোর শাসন না করে যদি শিশুকে উৎসাহিত করা হয়, সাবাস দেয়া হয়, ধন্যবাদ দেয়া হয়, তাহলে তা হবে শিশুর সাথে খিয়ানত ও প্রবঞ্চনা।

যদি কারো শিশু সন্তানের মধ্যে এমন ঘৃণ্য অভ্যাস থাকে, তাহলে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে কিছু পানাহার করিয়ে নেওয়া উচিত।

কারণ, শিশুদের পেট শান্ত থাকলে মনটাও শান্ত থাকে। এটা অনেক মায়ের পরীক্ষিত। তাই এটা অনেক মায়ের জন্য লক্ষণীয়।

এমনিভাবে লক্ষণীয় এই যে, কোন কোন শিশুর জন্য এমনও হয় যে,

অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে, তবুও ঘুমাচ্ছে না বা কোন বস্তুর জন্য জেদ ধরে কাঁদছে। তখন অনেক মা আদর-সোহাগ করে শান্ত করার পরিবর্তে তৎক্ষণাৎ গরম মেজাজে শাসিয়ে দেন অথবা এমন বলেন যে, আরে অলক্ষুণে ঝঞ্ঝাটে! ঘুমাচ্ছিস না কেন? সারা দিন জ্বালিয়েছিস, এখন রাতেও বিরক্ত করছিস? একটু শান্তিতে ঘুমাতে দে--- ইত্যাদি, ইত্যাদি বলতে থাকে। অথচ তখন মায়ের করণীয় ছিল এই যে, যদি সে কোন কেচ্ছা-কাহিনী শ্রবণ করার জন্য জেদ সাঁধে, তাহলে তাকে কোন সাহাবীর ঈমানদীপ্ত সাহসিকতার ঘটনা শুনিয়ে দেওয়া। আর যদি ক্ষুধার তাড়নায় কাঁদতে থাকে, তাহলে তাকে কিছু আহারের ব্যবস্থা করা। আর মাথায় স্নেহমাখা হাত বুলিয়ে তার জন্য দু'আ করা। সুতরাং, শিশুদের আখলাক-চরিত্র ও স্বভাব বিগড়ে যাওয়ার এটাই কারণ যে, যে সময়টা ছিল আদর-সোহাগ ও সান্ত্বনা দেওয়ার, সে সময় তাকে শাসানো ও ধমকানো হল। এটা তার জন্য বড়ই ক্ষতিকর।

শিশুদের বদ স্বভাব প্রতিরোধে মায়ের করণীয়

শিশুদের বদস্বভাব, অসদাচরণ ও অপছন্দনীয় কর্মকান্ডের মধ্যে সর্বাপেক্ষা চিন্তার বিষয় এটা-যা দূর করার এবং তার মূলোৎপাটন করার জন্য প্রতিটি মা-ই সর্বক্ষণ সক্রিয় থাকেন, কিন্তু শিশু নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে কেন যেন আরো বেশী সে কাজে আকৃষ্ট হয়। মা হয়ত চাচ্ছেন, সন্তান পুনরায় যেন দুষ্টামী না করে, কিন্তু সে কঠোর থেকে কঠোরতার শাস্তি ভুলে যেয়ে সে কাজের পুণরাবৃত্তি ঘটায়। তার এ স্বভাব কি কোন দিন পরিবর্তিত হবে না? অবশ্যই হবে। তবে মায়ের জন্য প্রয়োজন ধৈর্য-সহ্য ও বিনম্রতার। এক্ষেত্রে ক্রোধ ও উত্তেজনা পরিহার অপরিহার্য।

আদর্শ মায়ের জন্য এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, শিশুর আচরণগুলো শিশুসুলভ হিসেবে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। শিশুর প্রতিটি কাজ-কর্ম, কথাবার্তাকেই যদি দোষণীয় বিবেচনা করা হয় এবং ডাইরেক্ট এ্যাকশন হিসেবে তৎক্ষণাৎ কিছু উত্তম মধ্যম দেওয়া হয়, তাহলে তা হবে শিশুর জন্য খুবই ক্ষতিকারক। এতে শিশুর মন ভেঙ্গে যাবে এবং সংশোধনের পরিবর্তে আরো বেশী বিগড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন, একবার এক ভদ্র মহিলা-তার শিশু কন্যাটিকে নিয়ে এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে সে বাড়িতে কচি মুখ ও অল্প বয়সের বাচ্চা-কাচ্চা

না থাকার কারণে নিষ্পাপ ছোট্ট মেয়েটিকে দেখে সকলেই খুব আনন্দিত হল এবং কচি মুখের আধো ভাঙ্গা, মিষ্টি মিষ্টি, মায়া জড়ানো কথা শ্রবণ করার নিমিত্ত সকলেই তার সাথে অন্তরঙ্গ ও ফ্রি হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে লাগল। কেউ কেউ বিস্কুট, পানীয় ইত্যাদি পেশ করতে লাগল। কিন্তু এই ভদ্র মহিলাটি তার শিশু কন্যাটির প্রতি খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

যখনই সে কোন কথা বলত, তৎক্ষণাৎ ধমক দিয়ে বলতেন, "বদ তমীজ, বে-আদব কোথাকার! পাকনী বুড়ীর মত মুখ চালিয়ে যাচ্ছিস।" অতঃপর মেজবানদের বললেন, "কি বলব বোন! এই বাচালের কারণে আমি কোথাও আসা-যাওয়া ছেড়েই দিয়েছি। যেখানেই যাই, অভদ্রের মত কথা বলতে থাকে। এর কারণে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়"। আর যখন কেউ কিছু দিচ্ছিল, আর মেয়েটি তা নিতে ইচ্ছা করছিল, তখন মা বললেন, আদেখলা কোথাকার! দূর-হ এখান থেকে। মনে হয় জীবনে কোন জিনিষ চোখে দেখিস্‌নি। তুই তো আমাকে সকল স্থানে অপমান করেই ক্ষান্ত হোস্, ইত্যাদি। এখন পাঠক নিজেই বলুন, এই ভদ্র মহিলা কোন্ দৃষ্টিকোন থেকে স্বীয় নিষ্পাপ-নির্দোষ শিশু কন্যার সকল আচরণকে অবলোকন করছিলেন? মেয়েটির সকল আচরণ কথা-বার্তা কি অপছন্দনীয়, দোষণীয় ছিল? শিশুকাল এমন একটা সময় যখন শিশুর শিরা-উপশিরায়, রন্ধ্রে রন্ধ্রে, প্রতিটি জোড়ায় জোড়ায়, ধমনীর প্রতি কণায় কণায় প্রকৃতিগত, মজ্জাগতভাবে চঞ্চলতা, চতুরতা, ফুর্তি প্রবণতা কানায় কানায় পরিপূর্ণ থাকে। সেহেতু শিশু নিজেই নিজের কাছে এমন অক্ষম, অপারগ থাকে যে, সে সব সময় তুরতুর করতে থাকে, কিছু না কিছু একটা করতেই থাকে। এখন তার এ চঞ্চলতাকে যদি জঘন্যতম অপরাধ ধরে নেওয়া হয় এবং তাৎক্ষণিক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে এটা হবে শিশুর প্রতি নির্ঘাত জুলুম। তবে শরীয়ত পরিপন্থী কোন কুঅভ্যাসে শিশু অভ্যস্ত হতে থাকলে, অবশ্যই তাকে শাসন করতে হবে, শাস্তি দিতে হবে।

শিশুদেরকে শাস্তি দানের পরিমাণ

শিশু যতদিন ছোট থাকে, ততদিন পিতা-মাতার আদর-সোহাগে, মায়া-মমতায়, স্নেহের ছায়ায় লালিত পালিত হতে থাকে। আর যখন শিক্ষা-দীক্ষা ও শাসনের বয়সে পৌঁছে যায়, তখন পিতা-মাতা ও লালন-পালনে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের কর্তব্য এই যে, শিশুদের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে সংশোধনের সর্ব প্রকার মাধ্যম ব্যবহার করা। এ

ছাড়া তার বক্রতা শুদ্ধিকরণ এবং তার আবেগ, তার কামনা-বাসনা, তার স্বভাব-চরিত্রের সংশোধন ও আমূল পরিবর্তনের সমস্ত পথ অবলম্বন করা। এর বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা অভিভাবকের কর্তব্য। যাতে করে সে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী মন-মানসিকতা, ধ্যান-ধারণা ও উচ্চাঙ্গ সামাজিকতার শিষ্টাচারে অলংকৃত হতে পারে।

* শিশুদের লালন-পালন ও চারিত্রিক সংশোধনের জন্য ইসলামের এক বিশেষ পদ্ধতি ও স্বতন্ত্র পন্থা রয়েছে। সুতরাং ইসলাম এই শিক্ষা দেয় যে, যদি শিশুদের জন্য আদর-সোহাগ দ্বারা বোঝানো উপকারী হয়, তাহলে অভিভাবকদের জন্য তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা বা তাকে উপেক্ষা করা, রাগ দেখানো দুরস্ত নয়। আর যদি রাগ দেখানো বা ধমক দেওয়া, শাসন করা তার সংশোধনের জন্য উপকারী হয়, তাহলে প্রহার করা, দৈহিক শাস্তি দেওয়া ঠিক নয়। আর যদি আদর-সোহাগ, ওয়াজ-নসীহত, ধমক, শাসন, সম্পর্ক ছিন্ন করা, এবং কড়াকড়ির সকল পন্থাই অকার্যকরী সাব্যস্ত হয়, তখন এমতাবস্থায় এতটুকু প্রহার করার অনুমতি রয়েছে, যা শরীয়তের সীমার মধ্যে গণ্য এবং যা অমানুসিক-অমানবিক না হয়। তবেই হয়ত শিশুর সংশোধনের পথ সুগম হবে এবং তার চাল-চলন, আখলাক-চরিত্র, স্বভাব-অভ্যাস দুরস্ত হবে, মার্জিত হবে।

শিশুদের লালন-পালন ও সংশোধনের সমস্ত স্তর মহানবী (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-এর জীবন বিধান অনুযায়ী হবে। শিশুদের লালন-পালন, সংশোধন এবং আদর-সোহাগ ও নম্রতার সাথে বুঝানো সম্পর্কিত একটি ঘটনা ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত উমর ইবনে আবী সালামা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি প্রিয় নবীজী (সাঃ)-এর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত এক কিশোর ছিলাম। আহারের সময় আমার হস্ত খাবার প্লেটের এদিক-ওদিক ঘুরা-ফেরা করত। এ দৃশ্য অবলোকন করে মহানবী (সাঃ) আমাকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করলেন ঃ "হে বৎস! আল্লাহর নামে আহার শুরু কর, ডান হাতে আহার কর এবং নিজের নিকটবর্তী পার্শ্ব থেকে আহার কর।"

শিশুদের শাসন এবং প্রহার করা সম্পর্কিত একটি হাদীস আবু দাউদ শরীফে হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ "যখন তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বৎসর পূর্ণ হয়, তখন তাদের নামায পড়ার আদেশ দাও। আর

যখন দশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করে, তখন তাদের নামাযের জন্য প্রহার কর এবং তাদের শোয়ার বিছানা পৃথক করে দাও।"

শিশুদের সাথে নম্র ব্যবহার বা কর্কশ ব্যবহার যা-ই করা হোক না কেন, তা হতে হবে তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উপকারার্থে এবং চারিত্রিক সংশোধনের উদ্দেশ্যে। যদি উদ্দেশ্য হয় তাকে লোক সমাজে অপমানিত করা, লজ্জিত করা, তাহলে তা হবে হিতে বিপরীত। কারণ, যেমনিভাবে আমরা আত্মমর্যাদাবোধ- সম্মানবোধ অন্তরে গচ্ছিত রাখি এবং অন্যের সম্মুখে, লোক সমাজে অপমানিত হওয়া, লজ্জিত হওয়া পছন্দ করি না, তেমনিভাবে শিশুরাও আত্মমর্যাদাবোধ হৃদয়ে সংরক্ষিত রাখে এবং লোক সমাজে অপমানিত হওয়া পছন্দ করে না। তাই যখন সে কোন অপরাধ করে, তখন মাতা-পিতা তাকে যে শাস্তি দেয়, এ শাস্তিকে সে কেমন যেন মানহানী এবং তার ইজ্জত ও সম্মানবোধে আঘাত মনে করে। যখন সে লক্ষ্য করে যে, কাজটা বড় অপরাধের, অমার্জনীয় এবং তাতে অন্যদের সম্মুখে অপমানিত হতে হবে, তখন সে ঐ কাজ থেকে তাওবা করতে বাধ্য হয়। কিন্তু কোন মা যদি এক অপরাধের কারণে, বার বার শিশুর আত্মমর্যাদায় আঘাত হানতে থাকেন, তখন সে মনে মনে এ কথাই উপলব্ধি করতে থাকে যে, লোক সমাজে তার কোন মান-সম্মান ও মূল্য নেই। আর তখনই সে একগুঁয়ে ও বে-শরম, নির্লজ্জ হয়ে যায়। এরপর তাকে কেউ আর অপরাধ জগত থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে না। এমন হয় অধিকাংশ সময় মায়ের ভুলের কারণে।

সুস্থবিবেকহীন অনেক মায়ের মুখের ভাষা অলংকৃত হয় অবাঞ্ছিত ধমকী ও ভীতিপ্রদ বাক্য দ্বারা। যেমন–"থাপ্পড় দেব এখনই" "জুতা মেরে মুখ ভেঙ্গে দিব" "দাঁত ভেঙ্গে দিব লাথি মেরে" ইত্যাদি। এভাবে বে-সাহারা, অসহায়-অবুঝ শিশুকে স্নেহহীন মায়ের পক্ষ থেকে হয়রানী ও ভীতি প্রদর্শন করা কাঁহাতক দুরস্ত হবে? এতে শিশুর উপর কতটুকু কুপ্রভাব পড়বে, সেদিকে সামান্যতমও ভ্রুক্ষেপ কি করা হয়?

অনেক শিশু এমন রয়েছে- যারা মায়ের ঐ অনবরত ধমকীমূলক কথাগুলোকে 'নিছক মুখের জোর' মনে করে নেয় এবং এ সিদ্ধান্ত নেয় যে, মায়ের কথায় কিছু-ই আসে যায় না। এমন কথা তিনি সর্বদা বলে থাকেন, কিন্তু বাস্তবে কাজে পরিণত করেন খুব কমই। এখানে লক্ষণীয় এই যে, উক্ত বাক্যগুলো স্বীয় প্রভাব হারাতে বসেছে। পক্ষান্তরে শিশুও শাস্তিকে উপেক্ষা করতে শুরু করেছে। শাস্তিকে সে এখন পরওয়া করে না। কিন্তু যে

শিশুরা ঐ ধমকীমূলক বাক্যগুলোকে সত্য এবং বাস্তবিক মনে করে, তাদের পরিস্থিতি ভিন্নরূপ পরিলক্ষিত হয়।

এটা চিন্তা করা মারাত্মক ভুল যে, শিশু যেন এমন একটাও অপরাধ বা ভুল না করে–যার কারণে শাস্তি দিতে হয়। শিশুতো ভুল করবেই। অবশ্য এটা হতে পারে যে, মা তার শাস্তির বিধানকে শিথিল করতে পারেন, অথবা শাস্তি রহিত করতে পারেন।

একথা প্রণিধানযোগ্য যে, শিশু কিন্তু প্রত্যেকটা দুষ্টামী জেনে-শুনে, সেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে করে না। কিছু দুর্ঘটনা তো এমন হয় যে, তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তার ক্ষতিকর দিকটা তার জানাও থাকে না। তা হঠাৎ সংঘটিত হয়ে গেলে, সে নিজে নিজেই দুঃখিত ও অনুতপ্ত হয়। এমতাবস্থায় তাকে বিবেক দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা বাঞ্ছনীয়।

এক অবুঝ শিশুর কান্ড

এক অবুঝ শিশু তার পিতার পড়ার টেবিলে কলমদানীতে সযত্নে রাখা লাল এবং কালো রঙ্গের ঔষধ, একটি কলম, একটি পেন্সিল, রবার, কাগজ ও কালীর দোয়াত ইত্যাদি দেখতে পেল। শিশু পিতার অনুপস্থিতির সুযোগে ঐ জিনিষ সমূহ উঠিয়ে নিল এবং নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা ও শিশুসুলভ আচরণ অনুযায়ী সেগুলোকে উল্টাতে-পাল্টাতে ও নাড়া-চারা করতে লাগল। কালীর দোয়াতের ক্যাপ খুলে উল্টিয়ে দেখতে চাইল, কি রয়েছে এর মধ্যে? অমনি সমস্ত কালি তার হাত ধরে প্রবাহিত হয়ে কাগজ, কলমদানী এবং টেবিলের বারোটা বাজিয়ে ছাড়ল। শিশুর তো এটা জানাই ছিল না যে, কালি ভরা দোয়াত উল্টালে কি বিশ্রী কান্ড হয়: তাই ঘাবড়িয়ে, হতচকিত হয়ে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দ্রুত গতিতে হাতে ভরে যাওয়া কালিকে পাঞ্জাবী দ্বারা পরিস্কার করে নিল। অতঃপর কান মলা খাওয়ার ভয়ে মেঝেতে পড়ে যাওয়া কালিকে কাগজ দ্বারা তাড়াতাড়ি পরিস্কার করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হল। এখন বলুন, এমন অবুঝ শিশুকে শাস্তি দেওয়া তাকে আরো বেশী ভীত-সন্ত্রস্ত করা নয় কি? তবে তাকে অবশ্যই বুঝিয়ে এ সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া কর্তব্য, যাতে ভবিষ্যতে সে সতর্ক হয়ে যায়। প্রয়োজনাতিরিক্ত শাস্তি দেওয়া কখনই সমীচীন নয়। শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে এমন পছন্দনীয় পদ্ধতি অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয় যাতে সে নিজেই লজ্জিত হয় এবং ঐ কাজের প্রতি তার ঘৃণা সৃষ্টি হয়।

মায়ের ভুল মায়া-মমতা

যদি শিশু একটি অপরাধ বার বার করতে থাকে, তাহলে তাকে হালকা হলেও শাস্তি দেয়া উচিত। যেমন–মা বললেন যে, যদি তুমি অমুক কাজটি কর, তাহলে শাস্তি দিব, মারব, পিটাব। এতদসত্ত্বেও শিশু কাজটি করে বসল। তাহলে অবশ্যই তকে কিছু শাস্তি দিতে হবে। এমতাবস্থায় ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে মায়া দেখালে শিশু মনে করবে, ওটা (মায়ের ধমকী) কোন ব্যাপারই না। মা আমার এমনি বলেছিলেন এবং আগামীতেও এমনি বলতে থাকবেন। এটাই শিশুর জন্য সর্বনাশের কারণ। এতে শিশুর মনে অঙ্গীকার পূরণের প্রতি দূর্বলতা প্রকাশ পেতে থাকবে।

আমাদের পারিবারিক জীবনে শাস্তি প্রদানের এক অভিনব ও ব্যতিক্রমধর্মী ভুল প্রথা প্রচলিত রয়েছে। পৃথিবীর খুব কম দেশেই এই প্রথার প্রচলন রয়েছে। তা হল শাস্তি প্রদানে মায়ের অভিনয়। শুনুন তাহলে তার ব্যাখ্যা। মনে করুন, শিশু এমন একটি অন্যায় বা অপরাধ করেছে- যা অবশ্যই শাস্তির উপযুক্ত। যেমন, দিনভর সে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে রইল। কোথায় আছে, কি করে বেড়াচ্ছে, কেউ জানে না। কিন্তু যে সময়টা আব্বাজানের ঠিক বাড়ী ফেরার, তার পূর্ব মুহূর্তে বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে গেল। তখন মা জিজ্ঞাসা করেন, দিনভর কোথায় ছিলি? সত্যি কথা বল। কিন্তু প্রত্যুত্তরে সে কিছুই বলে না। অবশেষে মা বিরক্ত হয়ে তার পিতার নিকট বিচার দিবেন বলে হুমকী দেন যে, আজ আসুক তোর আব্বা। সারদিন বাইরে ঘোরাফেরা করার মজা দেখিয়ে ছাড়ব, ইত্যাদি। এত কিছুর পরও শিশু কোথায় ছিল কিছুই বলে না। অতঃপর যখন পিতা বাড়ী ফেরেন, তখন মা অভিযোগও করেন যে, সে সারাটা দিন বাইরে বাইরে ছিল। ঠেং ভাঙ্গুন এখনই। কোথায় ছিল? কাদের সাথে ছিল? জিজ্ঞাসা করুন। তখন পিতা শিশুর এ চাল-চলন ও অসদাচরণ বড় জঘন্য অপরাধ বলে বিবেচনা করেন এবং তাকে কঠোর শাস্তি দিতে উত্তেজিত হন। তাকে শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজনও রয়েছে বটে। কিন্তু ঠিক ঐ মুহূর্তে আম্মাজানের হৃদয় সাগরে মুহাব্বত, স্নেহ-মমতার বন্যা বয়ে যায় এবং স্বামীর ক্রোধ প্রশমিত করতে আর নয়নমনি আদরের সন্তানকে রক্ষা করতে, তাকে আড়াল করতে, খুব অনুনয়, বিনয় করতে থাকেন এবং বলতে থাকেন যে, ওকে না মেরে আমাকে মারুন, ওকে ক্ষমা করে দিন, মাফ করে দিন, ইত্যাদি। এর ফলশ্রুতিতে শিশুর দুঃসাহস দ্বিগুণ হয়ে যায় এবং তার অন্তর এ ব্যাপারে আশ্বস্ত হয় যে, তার স্নেহময়ী মা জননী যতদিন এ বিশ্ব

বসুন্ধরায় জীবিত আছেন, কেউ তাকে শাস্তি দিতে পারবে না। পক্ষান্তরে দরদী মা মনে মনে আনন্দ অনুভব করেন যে, মাতৃস্নেহের হক আদায় করে দিলাম। অথচ তার খবরও থাকে না যে, এ ক্ষতিকারক ভুল স্নেহ-মমতা শিশুকে অধিকাংশ অপরাধ ও অন্যায়ের পথে চলার স্বাধীনতা দান করে।

একজন "আদর্শ মা" হিসেবে মায়ের কর্তব্য এটাই ছিল যে, তিনি নিজেই ছেলেকে কিছু শাস্তি দিয়ে দেওয়া এবং পিতার কাছে অভিযোগ উত্থাপন না করা। এখন যেহেতু অভিযোগ করা হয়ে গেছে, তখন শিশুকে শাস্তি দেয়ার জন্য স্বামীকে সুযোগ দেওয়া এবং বাধা না দেওয়া কর্তব্য। এক্ষেত্রে অতিশয় আদর দেখিয়ে অনেক মায়েদের এমন ভুল সিদ্ধান্তের কারণে শিশুদের চারিত্রিক অবক্ষয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয়। শিশুরা হয়ে পড়ে বে-পরওয়া, উচ্ছৃঙ্খল, সন্ত্রাসী, সমাজের কলংক।

সন্তানকে শাসন করা ও শাস্তি দেওয়ারও একটা মাত্রা আছে। অধিকার পেলাম বলে ইচ্ছে মত মনের ঝাল মিটালাম, সম্পূর্ণ দাপট অবুঝ শিশুর উপর প্রয়োগ করলাম,এমন হওয়া উচিত নয়। অনেক মা-বাবা এক্ষেত্রে ভুল পথে এগোন। তারা নির্বোধ শিশুকে শক্তি কষিয়ে মারপিটে মারাত্মক যখম করে ফেলেন। অনেক সময় আবার এজন্য চড়া মাশুলও দিতে হয়। একজন মা তার সন্তানের মাথা সজোরে দেয়ালে মেরে জিদ মিটিয়ে পরে দেখেন-মাথা ফেটে দরদরিয়ে রক্ত ঝরছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনুশোচনায় ক্লিস্ট হন এবং সন্তানকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের নিকট যেতে বাধ্য হন। এরূপ কান্ডজ্ঞানহীন কাজ কোন বিবেকবান মা-বাবা করতে পারেন না।

মনে রাখতে হবে, সন্তানকে শাস্তি দেওয়া জিদ মিটানোর জন্য নয়, বরং সন্তানকে সংশোধন করার জন্য। তাই এক্ষেত্রে শক্তির মহড়া নয়, বিবেকের ব্যবহারই কাম্য। তার শাসন ও শাস্তির ধরণ এমন হতে হবে- যাতে সন্তান কষ্ট বা ব্যথা পায় ঠিকই, কিন্তু তাতে কোন যখম বা ক্ষতির উদ্ভব না হয়।

আদর্শ অভিভাবককে এসব বিষয় ভালভাবে রপ্ত করে নিতে হবে। সন্তানকে সৎমানুষ করতে চাইলে এসব কিছু মেনে চলতেই হবে।

জেদী ও রাগী শিশুর প্রতিপালন

অনেক শিশু জেদী হয়ে থাকে। শিশুদের জেদ করার কারণ ও অর্থ এই যে, সে কোন কথা বা কাজকে ন্যায় সঙ্গত মনে করছে এবং তার উপর দৃঢ়পদ ও অনড় থাকছে। আমরাও এটাই করে থাকি যে, যে কথা বা কাজকে ন্যায় ও বাস্তব সম্মত মনে করি, তা থেকে পিছু হটা পছন্দ করি না। তাহলে অবুঝ শিশু কেন জন্মগত স্বভাবের বিপরীত কিছু করবে? আল্লাহ তা'আলা এ জন্যেই মানুষের অন্তরে এ গুণটি গচ্ছিত রেখেছেন যে, মানুষ যদি সৎ স্বভাবের অধিকারী হওয়ার ইচ্ছা রাখে, তাহলে সৎ স্বভাবের অধিকারী হতে পারবে। আর যদি কু-স্বভাবের অধিকারী হতে চায়, তাহলে তাও হতে পারবে। সুতরাং, এ একরোখাপনা স্বভাব প্রারম্ভ থেকেই যদি তার মধ্যে না থাকে, তাহলে সে আগামী জিন্দেগীতে কিভাবে কর্মে দৃঢ়তা দেখাবে?

শিশুদের মধ্যে জেদ করার প্রবণতা এ কারণেও সৃষ্টি হয় যে, সে যখন উপলব্ধি করে যে, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিকট তার কোন গুরুত্ব ও মূল্য নেই, যেমনটি পূর্বে ছিল, তখন সে অন্যান্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার নিমিত্ত নতুন পদ্ধতিতে নতুন ইস্যুতে জেদ শুরু করে দেয়। কারণ, তার জানা আছে যে, জেদ করে যখন সে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে থাকবে, তখন তাকে আর কেউ না হলেও আম্মু তো অবশ্যই কোলে তুলে আদর করবেন। কোলে তুলে আদর না করে হালকা উত্তম-মধ্যম দিলেও তো ভাল। কেননা, আম্মু কোলে তুলে নিয়েছেন- এটাই তো চরম পাওয়া।

অনেক মা এমন আছেন- যাদের নিকট মেহমান, পাড়া-প্রতিবেশী বা আত্মীয়-স্বজন বেড়াতে এলে, জেদী সন্তানের মান-অভিমানকে বদনামের সুরে (প্রশংসা স্বরূপ) আলোচনা করে আত্মপ্রশান্তি লাভ করেন। যেমন "আর বলবেন না, বোন! কি বলব, ছেলেটার জেদের কথা। এত জেদ ওর মধ্যে তা বলার নেই। জেদ পূরণ না করা পর্যন্ত রক্ষা নেই। জেদ পূরণ না করলে পুরো বাড়িটা মাথায় করে চিল্লাতে থাকে, ইত্যাদি। শিশুর সামনে এ ধরনের ভুল প্রশংসায় শিশুও মায়ের মত আত্মপ্রসাধ লাভ করতে থাকে। বিশেষ করে নিজেকে একজন সফল অভিমানী ও গর্বিত জেদী মনে করে। এ জাতীয় ভুল প্রশ্রয় থেকে শিশুদের রক্ষা করা উচিত।

শিশুর রুক্ষ মেজাজ ও জেদ যদি রোগ বা শারীরিক অস্বস্তি কিংবা দুর্বলতার কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে এর দ্রুত চিকিৎসা করা

প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পাশাপাশি পথ্য স্বরূপ পুষ্টি ও সুষম খাদ্য-দ্রব্য খাওয়ানো প্রয়োজন, যা শক্তিবর্ধক, বলবর্ধক এবং প্রাণে আনে চাঞ্চল্য। সেক্ষেত্রে রোগ ও দুর্বলতা দূর হয়ে গেলেই রুক্ষ মেজাজ ও জেদ দূর হয়ে যায়।

অনেক মাতা-পিতা মনে করেন যে, জেদের একমাত্র চিকিৎসা হল জেদী শিশুর দাবী পূরণ করে দেওয়া, চাই দাবী ন্যায় হোক বা অন্যায়। এতে একটি ক্ষতিকর দিক ও ভুল দৃষ্টিভঙ্গি এই পয়দা হবে যে, শিশু সামান্য দাবীর জন্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে যাবে এবং সামান্য জিনিষের জন্য হৈ চৈ ও চিৎকার করাকে দাবী আদায়ের উপায় মনে করতে থাকবে। দ্বিতীয় ক্ষতিকর দিকটি হল এই যে, তার জেদের গন্ডি দৈনন্দিন বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তাই জেদপ্রসূত দাবী পূর্ণ করার পূর্বে জেদের কারণ চিহ্নিত করে তা দূর করার চেষ্টা করতে হবে এবং ভুলিয়ে বুঝিয়ে জেদ হটানোর জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

জেদকে আদর-সোহাগ ও স্নেহ-মমতার মাধ্যমে যত দ্রুত ও সহজে দূরীভূত করা সম্ভব, অন্য কোন পদ্ধতিতে এত সহজ নয়। কোন কোন সময় শিশু এটা কামনা করে যে, মাতা-পিতার পক্ষ থেকে তাকে আদর-সোহাগ করা হোক। যখন তা করা হয় না, তখন সে কোন নতুন বাহানায় বা ইস্যুতে জেদ করতে থাকে। তাই তাকে যদি বিভিন্ন সময় একথা বুঝিয়ে দেয়া হয় যে, তার জেদের কারণে তার অভিভাবকদের কত দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা সইতে হয় এবং কত ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। এমন হলে হয়ত সে আগামীতে জেদ করার হিম্মতও করবে না। বরং কোন কোন সময় কৃতকর্মের কারণে লজ্জিত হয়ে যাবে। অতঃপর সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা এটাই করবে যে, যাতে করে জেদের পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

জেদ সম্পর্কে একথাও লক্ষণীয় যে, শিশু একবার জেদ করার পর কি কারণে জেদ করেছিল, তা ভুলে যায়। পুনরায় সে ঐ কথাকে তুলে আবার জেদ করতে প্রয়াসী হয়। তাই আদর্শ মায়ের কর্তব্য এই যে, জেদের মধ্যে মূল্যবান সময় বিনষ্ট না করে তাকে সাহাবীদের জীবনী শুনিয়ে অথবা খেলা-ধুলায় এমনভাবে লিপ্ত রাখা-যাতে সে অযথা ও অনর্থক জেদ করার প্রতি ধাবিত না হয়।

শিশুর জেদ পূর্ণ করা কেমন?

জেদ ও একরোখাপনা খুবই খারাপ স্বভাব। মাতা-পিতা যদি শিশুদের উন্নতি, কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করেন, তাহলে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে– শিশুদের মধ্যে জেদ করার স্বভাব ও খাছলত সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে তা দাবিয়ে দেওয়া। যদি এমন না করা হয়, তাহলে শিশুও হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং নিজেরাও মুসীবতে পতিত হবে। অনেক শিশু এমনও হয়, যারা জন্মগত ভাবে জেদী হয়ে থাকে। আর এমন জেদী হয় যে, কথায়-কথায়, মুহূর্তে মুহূর্তে চিৎকার করতে থাকে এবং কেঁদে কেঁদে সবাইকে পেরেশান করে ফেলে। ঘন্টার পর ঘন্টা কাঁদতে থাকে। জেদ পূর্ণ করার পরও নিশ্চুপ হয় না। সত্যি বলতে কি, নিঃসন্দেহে এটা একটা রোগ, যা পেটের বিভিন্ন ত্রুটির কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় প্রহার বা কঠোরতা না করে তড়িৎ চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

যে শিশু জেদ করে এবং কোন বস্তুর আবদার করে, সে বস্তু দিতে যদি কোন ক্ষতি বা অসুবিধা না থাকে, তাহলে জেদ করার পূর্বে তা দিয়ে দেওয়া উচিত। তবে যদি জেদ করেই বসে, তাহলে তা কখনও দেওয়া উচিত হবে না। এতে স্বভাব বিগড়ে যাবে। তখন সে প্রতিটি দাবীই জেদের মাধ্যমে পূর্ণ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। এ জন্য তার প্রার্থিত বস্তুটি দেওয়ার ক্ষতিকর দিকটা তার বিবেক-বুদ্ধি ও বুঝ অনুযায়ী তাকে বুঝানো প্রয়োজন যে, জেদ করা খুবই খারাপ স্বভাব। বুঝানোর সাথে সাথে তার মনোযোগের মোড় অন্য কোন কাজের প্রতি ঘুরিয়ে দিতে হবে। যদি দু'চারবার শিশুর জেদকে ও দাবীকে পূর্ণ না করা হয়, তাহলে সে বুঝে নিবে যে, কান্নাকাটি আর জেদে কোন উপকার হবে না। তখন দেখবেন, কিছু দিনের মধ্যেই সে তার বদঅভ্যাস ইনশাআল্লাহ পরিত্যাগ করবে।

শিশু কেন রাগ করে?

রাগ-গোসসা ও ক্রোধ শিশুদের মধ্যে তখনই সৃষ্টি হয়, যখন সে কিছু একটা করতে চায় বা বলতে চায়, আর সে কাজে বা কথায় বাধা এসে যায়। আর রাগ যখন চরম সীমায় পৌঁছে যায়, তখন সে আবেগের তোড়ে ভাসতে থাকে এবং বিবেক দিয়ে কাজ করতে অক্ষম হয়ে যায়। তখন সে

সকল কাজ বিবেকহীন আবেগ দ্বারা সম্পাদন করতে চায়। শিশুদের এ বিপর্যস্ত মানসিক অচলাবস্থা কখনই পছন্দনীয় নয়।

মহানবী (সাঃ) পরিষ্কার ভাষায় নিষেধ করে বলেছেন ঃ "রাগ করো না"। এর কারণ চিন্তা করলে সহজেই উপলব্ধি করা যাবে যে, ক্রোধাগ্নিতে ও রাগের বশবর্তী হয়ে মানুষ কি-না করতে পারে? কিন্তু কোন কোন গৃহে এটাকে এক প্রকার আদর বা স্নেহ মনে করা হয়। যেমন, সময়-অসময়ে শিশুকে উত্যক্ত করা বা বিরক্ত করা অথবা ভয় দেখানো– যাতে করে সে কেঁদে দেয় বা বিরক্ত হয়ে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করতে থাকে। মনে রাখা উচিত–শিশুকে উত্যক্ত করে বা বিরক্ত করে কাঁদানো আদর নয়, বোকামী।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করলে, এ বিষয়টি শিশুর জন্য খুবই ক্ষতিকর। কারণ, শিশু যখন বিরক্তি বোধ করে বা অসন্তুষ্ট হয়, তখন তার শরীরে ক্রোধের আতিশয্যে এক প্রকার বাড়তি শক্তির আবির্ভাব হয়। যখন এ বাড়তি শক্তি বার বার সৃষ্টি হতে থাকে আর কমতে থাকে, তখন এ বাড়া-কমার যথাস্থানে শক্তি ব্যবহৃত না হওয়ার কারণে দেহ দুর্বল ও শক্তিহীন হতে থাকে। তখন শিশুর মেজাজ ক্ষ্যানক্ষ্যানে হয়ে যায়। তাই শিশুকে অসন্তুষ্ট না করে সব সময়ে হাসি-খুশী রাখার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। এমনিভাবে শিশুকে বিভিন্ন প্রকার জায়িয খেলাধুলায় লিপ্ত রেখে আনন্দ দেয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। যাতে করে রাগ করার অবসর বা মন-মানসিকতার সৃষ্টি না হয়।

শিশুর রাগ প্রশমিত করার সর্বোত্তম সহজ পদ্ধতি হল– তাকে নবী ও ওলী-বুযুর্গের নম্রতার কাহিনী শুনাবে। এছাড়া ধৈর্য ও সহ্যের মাধ্যমে তার ক্রোধ প্রশমনে তাকে সহযোগিতা করা কর্তব্য। কখনও কখনও শিশুরা বাড়ির বড়দের থেকেও রাগ শিক্ষা করে থাকে। যখন গৃহে কোন বদমেজাজ মুরব্বী ক্রোধ ও বদমেজাজীর আতিশয্যে বীরবিক্রমে গৃহের হাড়ি-পাতিল ভাঙ্গতে থাকেন, আর শাড়ি, কাপড় ছিড়ঁতে থাকেন তখন শিশুও নিজেকে ঐ রঙ্গে সাজাতে মানসিকতা অর্জন করে এবং সেও সে রকম করার সুযোগ খুঁজতে থাকে। তাই শিশুর সম্মুখে মাতা-পিতার বা মুরব্বীদের ক্রোধ প্রকাশ করে, ঝগড়া-ঝাটি করে সাজানো ঘরকে জাহান্নাম বানানোর পাশাপাশি শিশুর মানসিকতাকে নষ্ট করা মারাত্মক অন্যায়। তেমনিভাবে লোকদের সামনে শিশুর সম্মুখে এরূপ প্রশংসা করা উচিত নয় যে, এর রাগ তো বংশগত– খান্দানী। এর পিতাও রাগ উঠলে

এমন করে। এ জাতীয় নির্বুদ্ধিসুলভ আলোচনায় শিশু মনে আত্মতৃপ্তি অনুভব করে আর ভাবে, তার ভাল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হচ্ছে। তাই, সে তার হৃদয় গভীরে নিজের দৃষ্টিতে ক্রোধকে ভাল গুণ ভেবে খুব সহজে তা লালন করতে থাকে।

ছোট শিশুরা ঐ সময়ও রাগান্বিত হয়ে ওঠে, যখন সে ইশারা-ইঙ্গিতে কিংবা অস্পষ্ট ভাষায় নিজের প্রয়োজনের কথা বুঝাতে ব্যর্থ হয় এবং সে কারণে রাগান্বিত হতে থাকে, ঘ্যান-ঘ্যান করতে থাকে। তখন শিশুর মনের কথা বুঝতে অক্ষম হওয়ার কারণে মায়ের জন্য শোভা পায় না যে, তিনিও শিশুর সাথে সাথে চিৎকার করতে থাকবেন কিংবা রাগের প্রচন্ডতায় শিশুকে গুড়ুম-গাড়ুম কিল কষতে থাকবেন। বরং আদর্শ মায়ের কর্তব্য এই যে, তখন শিশুর সম্মুখে একবারেই রাগ বা ক্রোধ প্রকাশ করবেন না। খুবই ধৈর্য ও সহ্যের দ্বারা শিশুর মনের চাহিদা ও মুখের কথাগুলো বুঝতে চেষ্টা করতে হবে এবং তার প্রয়োজন সমাধা করতে হবে। শিশু যখন দু'চারবার মায়ের বুদ্ধিমত্তা প্রত্যক্ষ করবে, তখন সে নিজেও মনের চাহিদা ও প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করার সহজ পথ অবলম্বন করবে।

রোগাগ্রস্ত শিশুরা অসুস্থতার দিনগুলোতে একটু বেশী ঘ্যান-ঘ্যান, খ্যান-খ্যান করতে থাকে এবং সামান্য কথায় রাগান্বিত হয়ে উঠে। বিভিন্ন প্রকার দাবী-দাওয়া ও আবদার করতে থাকে। পূর্ণ না হলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অথচ ক্ষেত্র বিশেষে দাবী পূরণ করা তার পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। ক্ষিপ্ত হওয়ার হেতু এই যে, অসুখের দিনগুলোতে কষ্ট বা যন্ত্রণার কারণে শিশু আদর-সোহাগ ও স্নেহ-মমতার একটু বেশী আশা করে। তাই শিশু রোগাগ্রস্ত হলে, তার যত্নের প্রতি একটু বেশী খেয়াল রাখতে হবে। অনেক অধৈর্য মা অল্প যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে রোগাগ্রস্ত শিশুকে থাপ্পর কষে দিতে কৃপণতা করে না। এমন মায়ের উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, শিশুর রোগটা তার ঘাড়ে চাপলে কেমন মজা হত। তাই সে সময় সেবা-যত্ন ও আদর সোহাগ দিয়ে তার রাগ ও খ্যান-খ্যানানিকে প্রশমিত করতে হবে।

সুপ্রিয় পাঠক/পাঠিকাবৃন্দ!

গ্রন্থটি পাঠ করার সময় মুদ্রণগত বা ভুল বশতঃ কোন প্রকার ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে অবগত করানোর জন্য অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ!

শিশুর সদগুণাবলী অর্জনে মায়ের ভূমিকা

শিশু সম্পর্কে মায়ের সব কথা জানা থাকা দরকার। যেমন–শিশুর বন্ধু ক'জন এবং কে কে? কেমন খেলা সে পছন্দ করে? প্রতিবেশী ও আত্মীয়–স্বজনদের শিশুদের সাথে তার সম্পর্ক ও যোগাযোগ কেমন? মা তাকে প্রশ্ন করবেন যে, তোমার পছন্দনীয় কাজ ও খেলা কোন্‌টি? পছন্দনীয় বই কোন্‌টি। সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুটির নাম কি? অবসর সময় কি করতে ভাল লাগে? এ সকল প্রশ্নের উদ্দেশ্য হল–শিশুর আগ্রহ, আকর্ষণ ও ঝোঁক কোন্ দিকে–তা যাচাই করা। মা শিশুকে প্রশ্নের মাধ্যমে অনেক কিছু অবগত হয়ে তার সম্পর্কে সহজেই সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেন এবং তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে আরো উজ্জ্বল করার জন্য মূখ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন। যেহেতু অনেক শিশু ভয়-ডরের কারণে মায়ের নিকট ভেদের কথা গোপন করে ফেলে, সেহেতু মায়ের প্রয়োজন–প্রশ্নগুলো হাসি-খুশী ও অন্তরঙ্গ মুহূর্তে জিজ্ঞাসা করা।

শিশুদেরকে পরামর্শ দেয়াও আদর্শ মায়ের কর্তব্য। শিশুর শারীরিক-মানসিক তথা সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে পরামর্শ দিতে হবে। যদি সে লেখা-পড়ায় দুর্বল হয়, তাহলে দুর্বলতার কারণ উদঘাটন ও দুর্বলতাকে দূরীভূত করার পরামর্শ দেয়া উচিত। উপমা স্বরূপ, সে হিফযে কুরআন অথবা কুরআন নাজিরায় দূর্বল। তাহলে তার মূল কারণ উদঘাটন করে তাকে সাহায্য করতে হবে। হতে পারে–সে নূরানী কায়দা সঠিকভাবে পড়তে পারে না বলেই কুরআন হিফয করতে অসুবিধা হচ্ছে। তাই সে অভাব পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। এমনি ভাবে বিভিন্ন বিষয়ে তাকে পরামর্শ দেওয়া, তাকে সহযোগিতা করা উচিত।

এমনিভাবে শিশুদের ছোট ছোট আবদার ও দাবীসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। মাতা-পিতার যদি আর্থিক সচ্ছলতা না থাকে, তাহলে তাকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিবেন। কিন্তু সচ্ছলতা থাকলে জায়িয আবদারগুলোকে একেবারে উপেক্ষা করবেন না। অন্যথায় শিশু নিজেই দাবী পূরণ করতে ভুল পথ অবলম্বন করবে। এতে বংশীয় মর্যাদা বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই পরিমিত ও যুক্তি সঙ্গত আবদার পূরণ করে অবশিষ্টগুলো সম্পর্কে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

পারিবারিক সুখ শান্তির জন্য প্রয়োজন–ধর্মীয় অনুশাসন ও ধর্মীয় পরিবেশ। মা নিজেও গুরুত্ব সহকারে নিয়মিত নামায, রোযা, তাসবীহ ও তিলাওয়াতে অভ্যস্ত হবেন এবং নিজ সন্তানদেরকে এ কাজে অভ্যস্ত করবেন। এতেই পারিবারিক–সামাজিক পরিবেশ বিশুদ্ধ হওয়া সহ মানসিক সুখ-শান্তি নিহিত রয়েছে। ধর্মীয় অনুশাসন বিলুপ্ত বলেই আজ ঘরে ঘরে শিশুরা বড় হয়ে মাস্তান ও সন্ত্রাসী হচ্ছে।

মায়ের নিয়ত দুরস্ত করা কর্তব্য

বর্তমানে আজ প্রায় সর্বত্র অশান্তি বিরাজ করছে। সবখানে হাহাকার। এর বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির কাজ বেশী বেশী হওয়া, পূর্ণরূপে ইসলাম তথা শরীয়ত না মানা, শরীয়তকে তুচ্ছজ্ঞান ও উপেক্ষা করা, অবজ্ঞা করা, গোটা সমাজে ইসলাম জিন্দা হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা না করা, ইসলামী বিধানকে সমগ্র বিশ্বে এবং কিয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যত আগন্তুক প্রজন্মের মাঝে জীবিত রাখার নিমিত্ত নিজের জান, মাল, সময় ও যোগ্যতাকে ব্যবহার না করা। এতদ্ব্যতীত একটি বড় কারণ এই যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে গাইরুল্লাহ যেমন সন্তান, মাতা-পিতা, স্বামী, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, এমনকি সরকারের উপর ভরসা রাখা।

অনেক মা দুঃখিনী হয় এ কারণে যে, সে আল্লাহর উপর আশা-ভরসা না করে তার সন্তানদের উপর সে আশা করে যে, তার ছেলে বড় হবে, তখন প্রচুর টাকা-পয়সা উপার্জন করবে। তাকে ভাড়ার বাসা থেকে সরিয়ে নিয়ে নিজের টাকায় কেনা দালান বাড়ীতে নিয়ে যাবে।তার সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাসের সকল সামগ্রীর ব্যবস্থা করবে। নিজের টাকায় ক্রয়কৃত গাড়ীতে করে তাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে ইত্যাদি। এটাতো মায়ের স্বপ্ন ও আশা–যা সে স্বীয় সন্তানদের ঘিরে দেখতে থাকে। ফলে হয়ও এরূপ যে, তার সন্তান অনেক টাকার অধিকারী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে বিদেশে পাড়ি জমাতে বাধ্য হয়। বিদেশে যেয়ে ফ্রি-সেক্স আর রঙ্গীন স্বপ্নে ডুবে যেয়ে সুখ সাগর আর প্রমোদ নদীতে এমন তলিয়ে যায়–যা মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, নিজ জন্মভূমিসহ সব কিছুকে ভুলিয়ে দেয়। প্রথম প্রথম সে মায়ের জন্য কিছু অর্থকড়ি প্রেরণ করলেও কিছুদিন পর দূরত্বের কারণে এবং তথাকার বে-দ্বীন স্বপ্নপুরীর রঙ্গীন পরী ও সুন্দরী প্রজাপতিদের বিষাক্ত ফাঁদে আটকা পড়ে দুঃখিনী মায়ের কথা একেবারেই ভুলে বসে। অথবা অনেক সন্তান বিদেশ থেকে বিশাল সম্পদ নিয়ে ফিরে এসে উচ্চ ফ্যামিলীতে বিয়ে করে। আর সেই ঘরের লালিত-পালিত ঐশ্বর্যের দুলালীর মন রক্ষা করতে গিয়ে মা-বাবাকে পরিত্যাগ করে। এ রকম অবস্থা আজ অহরহ ঘটছে।

তাই রঙ্গীন স্বপ্ন পরিহার করে মানুষের উপর ভরসা না করে আল্লাহর উপর ভরসা করে স্বাভাবিক ভাবে যা মিলে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা কর্তব্য। বলা বাহুল্য কতক মা এমনও আছে–যারা সন্তান লালন-পালন করে শুধু এ আশায় যে, যখন আমার সোনামণি বড় হবে, আর আমি বৃদ্ধা হয়ে যাব, তখন সে আমার আশ্রয়স্থল হবে। মাঝে মাঝে সন্তানের কাছে প্রকাশও করে

যে, "তুই-ই তো আমাদের শেষ বয়সের সম্বল ও আশ্রয়স্থল।" এ ধরনের আশা করা আল্লাহর উপর আস্থা না রাখার শামিল। মানুষ তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আল্লার নিকটই মুখাপেক্ষী এবং তিনি-ই তার আশা-ভরসা ও আশ্রয়স্থল। যৌবনকালেও, বৃদ্ধ বয়সেও। সন্তান মাতা-পিতার নিকট আল্লাহর প্রদত্ত আমানত। যদি বৃদ্ধ বয়সে পৌছার পূর্বেই আল্লাহ তার আমানত উঠিয়ে নেন, তখন কি করার কিছু থাকবে? অথবা ছেলের বিবাহের পর বউ যদি ডাইনী প্রকৃতির হয় এবং ছেলে তার চক্রান্তের ভ্রান্তজালে আবদ্ধ হয়ে মায়ের থেকে পৃথক বসবাস আরম্ভ করে, তখন করার কি থাকবে? তাই আশা-ভরসা একমাত্র আল্লাহর উপরই করা বাঞ্ছনীয়। এভাবে আল্লাহর উপর ভরসা রাখলে তিনি-ই বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের অন্তর মাতা-পিতার প্রতি শ্রদ্ধায় ভরিয়ে দিবেন। তখন সন্তান আজীবন মাতা-পিতার সেবা-শুশ্রূষা করবে প্রাণভরে। কাজেই সন্তানের লালন-পালনের নিয়্যত এটা হবে না যে, সন্তান বড় হয়ে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ করবে। বরং সন্তান লালন-পালনের দ্বারা আল্লাহ প্রদত্ত আমানতের হক আদায় করার উদ্দেশ্যে করতে হবে।

অধিকন্তু, সন্তান লালন-পালন এমন নিয়্যত ও দু'আর সাথে করবেন, যেমনটি করেছিলেন হযরত মারয়াম (আঃ)-এর মা জননী। তিনি তার গর্ভ অবস্থায় নিয়্যত করেছেন, আবার দু'আও করেছেন যে, "আল্লাহ যেন গর্ভের সন্তানকে স্বীয় ঘরের (বাইতুল মুকাদ্দাসের) খাদেম হিসেবে কবুল করে নেন।" তাই প্রতিটি মায়ের কর্তব্য এই যে, সন্তান গর্ভে ধারণ ও লালন-পালনের নিয়্যতকে খালিস করে আখিরাতের পুঁজি সঞ্চয় করবেন। কখনও তারা গাইরুল্লাহর প্রতি কোন প্রকার আশা বাঁধবেন না। বিশেষ করে সন্তানের উপর ভরসা করবেন না। এছাড়া স্বীয় স্বামী, পিতা, ভ্রাতা, শাশুড়ী, ভাবী, বোনসহ কারো থেকে কিছু পাওয়ার আশা করবেন না এবং এ কথার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখবেন যে, কোন মানব-মানবী কাউকে আল্লাহর আদেশ ব্যতীত কিছু দান করতে পারে না। তিনি-ই সকলের প্রতিপালক। তারই-উপর সর্ব ব্যাপারে আশা-ভরসা করতে হবে। যার কাছে যতটুকু মাল-দৌলত আছে, তা আল্লাহরই দেওয়া। কারো ব্যক্তিগত শক্তিতে নয়। এমনকি কারো প্রতি দয়া করা, মায়া করা, স্নেহ করা, শ্রদ্ধা করা, ভক্তি করা মানুষের অধিকারে নেই। সব আল্লাহই সৃষ্টি করেন। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আস্থা, প্রেম-ভালবাসা—তাও আল্লাহ তা'আলারই দান। কথাটি যত্ন সহকারে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। এর পর যদি ভাগ্যক্রমে কারো থেকে কিছু পাওয়া যায়, তাকে আল্লাহর দান মনে করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবেন।

আদর্শ মায়ের আরো কর্তব্য হচ্ছে—তিনি তাঁর সন্তানদেরকে শিশুকাল থেকেই বিভিন্ন পন্থায়, বিভিন্ন পদ্ধতিতে বুঝাতে থাকবেন যে, সোনামনিরা! এই নশ্বর পৃথিবীতে আমরা চিরদিন বসবাসের জন্য আসিনি এবং চিরদিন থাকবো না। যদি একটি জিনিষ বা একটি কাপড় প্রভৃতি নিয়ে দু'জনের কাড়াকাড়ি ও ঝগড়া হয়, তখন তাদেরকে বুঝাতে হবে যে, এ সামান্য জিনিষ তো মাত্র কয়েক দিনের জন্য, এরপর এগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, ফেলে দেওয়া হবে। তাই এমন ধ্বংসশীল বস্তু নিয়ে ঝগড়া করতে নেই।

আদর্শ মায়ের আরো কর্তব্য হচ্ছে—কোন কিছুর প্রয়োজন হলে, তা মহান দাতা-দয়ালু আল্লাহ তা'আলার নিকটই চাইতে হবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে দিবেন, অন্যথায় দিবেন না। আল্লাহর কাছে চাওয়ার পর এ পৃথিবীতে প্রার্থিত কামনা-বাসনা যদি পূর্ণ না হয়, তাহলে এ কথা বলে মনকে সান্ত্বনা দিবেন যে, "নিশ্চয় এতেই আমার জন্য মঙ্গল নিহিত রয়েছে। আল্লাহ পাক পরকালে এর পরিবর্তে আরো সুন্দর জিনিষ দান করবেন।" সন্তানদেরকে সেভাবে আল্লাহর নিকট যাঞ্চাকারী বানাবেন।

এভাবে নিজে দ্বীনী রূপে গড়ে উঠে সন্তানদেরকেও আদর্শবান হিসেবে গড়ে তোলা আদর্শ মায়ের কর্তব্য।

আদর্শ জাতি গঠনে নারীর অবদান

সমাজ গঠনে নারীর অবদান অনস্বীকার্য। নেককার ও সচেতন নারীর উপযুক্ত তরবিয়্যতে পৃথিবীতে মহান মহান ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব ঘটেছে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রত্যেকটি আদর্শ মায়ের এ মর্মে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। যাতে সন্তানদেরকে যথাযথ পরওয়ারিশের মাধ্যমে জগতকে মহান ব্যক্তিত্ব উপহার দিতে পারেন এবং স্বামীকে যাবতীয় ভাল-মন্দ বুঝিয়ে সুপথের উচ্চ শিখরে আরোহন করাতে পারেন। নেক মায়ের কর্তব্য হচ্ছে—স্বামী ও সন্তানদেরকে ঈমান, ইয়াকীন, আমল ও খোদাভীরুতার মহান দৌলত আহরণে সহযোগিতা করবেন। তাদেরকে ধৈর্য, দৃঢ়তা, বীরত্ব ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী করতে প্রচেষ্টা চালাবেন। সে জন্য মাকে অবশ্যই দ্বীনদারীতে মজবুত হতে হবে। যদি মা নিজেই সচ্চরিত্রের অধিকারী না হন, তাহলে নতুন প্রজন্ম সৎপথ পাবে কিভাবে?

শিশুর সংশোধনের ক্ষেত্রে মাকে হিকমত অবলম্বন করতে হবে। কোন গালাগালির মাধ্যমে নয়, বরং সঠিক বুঝ দেয়ার মাধ্যমেই মা সন্তানদের ভুল শোধরাবেন। শিশুর কোন ভুল-ভ্রান্তি বা ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে মা যদি গালী

শুরু করে বলেন–"জঙ্গলী", "কুত্তা", "ইতর", "অলক্ষী", "আবার যদি করিস, তাহলে জনমের জন্য শিক্ষা দিয়ে দেব", কিংবা "তোরে জমের ঘরে পাঠিয়ে ছাড়বো" ইত্যাদি, তাহলে মনে রাখবেন–এতে কিন্তু আপনি গোলাপের মত পবিত্র বে-গুনাহ কচি অন্তরে নম্রতা, ভদ্রতা, মায়া-মমতার পরিবর্তে অশ্লীলতা ও জিদ্দিপনার বীজ বপন করলেন। এ বীজ একদিন কুফল নিয়ে অঙ্কুরিত হবে। সে এ সমস্ত ভাষা নিজেই অন্যের বেলায় প্রয়োগ করা শুরু করবে। তাই শিশুদের সাথে কঠোরতা পরিহার করুন। তাদেরকে নম্রতা, ভদ্রতা ও আদর্শ শিক্ষা দিন এবং ক্রমাগত বুঝিয়ে নবী (সাঃ)-এর চরিত্রে চরিত্রবান করে তুলুন। তখন তাদের আদর্শ সূলভ আচরণ দেখে আপনি বিমোহিত হবেন।

আদর্শ মাকে ভবিষ্যত জাতির কর্ণধার সন্তান লালন-পালনে মনোযোগী হতে হবে। শিশু সন্তান লালন-পালনে টিনজাত গুড়ো দুধে নির্ভরশীল না হয়ে নিজ শরীরে আল্লাহ প্রদত্ত কুদরতী দুধ পান করাতে সচেষ্ট হতে হবে। কারণ, এরই মাধ্যমে মা তার মূল্যবান জওহার, সুস্বভাব, বংশীয় ইজ্জত, ভদ্রতা সবকিছু শিশুর মুখ দ্বারা তার অন্তরে, মন-মানসিকতায় ও মগজে পৌঁছে দিতে পারেন।

বেশ কয়েকজন মহিলার বাস্তব অভিজ্ঞতা এই যে, যে সমস্ত মহিলারা গর্ভাবস্থায় এবং দুধ পান করানোর সময় নামায, তিলাওয়াত, যিকির ও তাসবীহ-তাহলীল রীতিমত আদায় করায় তৎপর হয়েছে, তাদের সন্তানরা বড় হয়ে নেককার ও সচ্চরিত্রের অধিকারী হয়েছে। তারা নিজেরাও সৎপথ প্রাপ্ত হয়েছে এবং তাদের উসীলায় আল্লাহ তা'আলা অন্যদেরও সৎপথ নসীব করেছেন। এ জন্য শাইখুল হাদীস হযরত যাকারিয়া (রহঃ) স্বীয়গ্রন্থ 'হিকায়াতে সাহাবা'য় লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ আমি নিজ পিতা থেকে বার বার শুনেছি এবং গৃহের বৃদ্ধা মহিলাদের থেকেও শুনেছি যে, যখন আমার পিতাকে দুধ ছাড়ানো হল, তখন তাঁর এক চতুর্থাংশ পারা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল এবং সাত বৎসর বয়সে তাঁর পূর্ণ কুরআন শরীফ মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। (হিকায়াতে সাহাবা, ১৮০)

সুতরাং, যদি আপনি কুরআনের হাফিজ না হন, তাহলে কমপক্ষে শিশুকে স্তন্য দানের প্রাক্কালে গুরুত্ব সহকারে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবেন, ওয়াক্তমত ভালভাবে একাগ্র চিত্তে খুশু-খুজুর সাথে নামায পড়বেন, কুরআন তিলাওয়াত ও তাসবীহ সমূহ অধিক পরিমাণে পাঠ করবেন এবং বেশী বেশী দীর্ঘ দু'আ করবেন। এমনিভাবে দুধ পান করানোর সময় কুরআনের আয়াত, জিকির, দরূদ শরীফ, কালিমা ইত্যাদি পাঠ করে শিশুর উপর ফুঁক দিবেন এবং দু'আ করতে থাকবেন, যেন আল্লাহ তা'আলা তাকে বড় হয়ে পৃথিবীর বুকে দ্বীন প্রচারকারী রূপে কবুল করেন।

যে মায়েরা নিজ শিশুকে স্তন্যদান করেন না, তাদের সন্তান অধিকাংশ সময় তাদের নাফরমান হয়। যেমন, এক আপটুডেট আধুনিকা মা তার নাফরমান ছেলেকে ধমকীস্থলে বললেন, আমি তোকে আমার দুধের ঋণ ক্ষমা করব না। তখন ছেলে উত্তরে বলল, মাম্মী! আমাকে যদি ডানো (DANO) অথবা নিডোর (NIDO) কৌটা ক্ষমা করে দেয়, তাহলে নো-পরওয়া। অগত্যা যদি এ ধমকী হল্যান্ডের বা অষ্ট্রেলিয়ার কোন বৃদ্ধা বা বনিতা গাভী দিত, তাহলে চিন্তার বিষয় ছিল নির্ঘাত। মাম্মী! আপনি আমাকে দুধ পান করালেনই বা কবে? ক্ষমার প্রশ্ন আসে কোত্থেকে? মাম্মীর তখন লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যায়। ধিক্কার এমন আধুনিকা মায়েদের প্রতি।

মনে রাখতে হবে– দুধের একটা তাছীর অবশ্যই আছে। পাত্র ভেদে দুধের ভিটামিনে যেমন পরিবর্তন আসতে পারে, তেমনি মা আর গরুর দুধের আধ্যাত্মিক গুণেও আকাশ-পাতাল ব্যবধান। এ জন্যই বদকার কোন মহিলার দুধ শিশুকে পান করানো অনুচিত। কেননা, তার খারাপ তাছীর শিশুর ভিতর প্রবেশ করতে পারে।

একজন কচি শিশুকে মহান ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে একজন আদর্শ মায়ের যথার্থ ভূমিকা অপরিহার্য। তিনি স্বীয় দ্বীনদারীর রক্ত দ্বারা তৈরী দুধ দিয়ে শিশুকে পরিতৃপ্ত করবেন, স্নেহ-মমতা, আদর-সোহাগ দিয়ে গড়ে তুলবেন। ফলশ্রুতিতে শিশুর হৃদয় গভীরে মায়ের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রতিফলিত হওয়ার পাশাপাশি মহান স্রষ্টার প্রতিও সে অনুরাগী হবে।

এমনিভাবে প্রাণপ্রিয় স্বামীর সাথে প্রেম-ভালবাসা, নম্রতা, ভদ্রতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, হাস্যোজ্জ্বল কপোল, ধৈর্য ও দৃঢ়তা, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, সুন্দর চারিত্রিক মাধুর্য, চাঞ্চল্য ও ফুর্তিভাব, কৌতুকসুলভ আচরণ, মায়ামাখা-মধুমাখা কথোপকথন, হাসি-খুশী ও চিত্ত বিনোদনের সাথে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করুন। বিভিন্ন বিষয়ে স্বামীর হিম্মত, শক্তি-সাহস বৃদ্ধি করুন। মানসিক অস্থিরতা, বিপদাপদ ও কঠিন সময়ে তার সম্মুখে সান্ত্বনার আধার রূপে নিজেকে উপস্থাপন করুন। মুসীবত, দুঃখ-কষ্ট ও পেরেশানীর বেলায় ধৈর্য ও দৃঢ়তার আঁচল বিছিয়ে দিন। গৃহকে শান্তির নীড় বানানোর পথকে সুগম করতে, সন্তানদের লালন করতে, স্বীয় মাল-দৌলত, ইজ্জত-সম্মান ও মান-মর্যাদা সমুন্নত রাখতে সাধ্যাতীত চেষ্টা করুন। স্বীয় স্বামী ও সন্তানদেরকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় গঠনমূলক, সেবামূলক নানাবিধ কাজ-কর্মে নিয়োজিত করার ভূমিকা রাখুন। ক্ষণস্থায়ী এ নশ্বর পৃথিবীর ভোগ-বিলাস, সুখ-সাচ্ছন্দ্যের বস্তু সমূহের মুহাব্বত ও লোভ-লালসা তাদের অন্তর থেকে দূরীভূত করার চেষ্টা

করুন। এমন গুণের অধিকারী নারীরাই সমাজের জন্য, দেশের জন্য মহান কর্ণধার, রাহবর ও জাতির পথ প্রদর্শক মহান ব্যক্তিবর্গের সহধর্মিনী বা মা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন।

আজ যদি আমরা বিশ্ববাসীর উপর মহানবী (সাঃ) কর্তৃক হিদায়াতের মহা অনুগ্রহ ও কৃপার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, নবুওয়তের মহান দায়িত্ব পালনের প্রারম্ভিক কালে পুরুষদের উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টিতে মহিলাদের তৎপরতার প্রতি লক্ষ্য করি, তাহলে অবশ্যই তাতে হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ)-এর অবদান দেখতে পাব। তেমনিভাবে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও মুহাজির সাহাবীগণের মদদ-নুসরত, সাহায্য-সহযোগিতায় আনসার সাহাবীগণের সাথে আনসারী মহিলা সাহাবিয়াগণ সমভাবে শরীক ছিলেন। মুহাজির সাহাবীগণের মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের কঠিন কর্তব্য সাধনে অকৃত্রিম সহযোগিতা দ্বারা মুহাজির মহিলা সাহাবীগণ বিরাট অবদান রেখেছেন।

উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রাঃ)-এর সমাজ সংস্করণ ও রাষ্ট্রীয়ভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা, ন্যায়-নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রাণপ্রিয়া স্ত্রী ফাতিমা বিনতে আব্দুল মালিক (রহঃ)-এর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। মুসলিম ইতিহাসের কিংবদন্তী ন্যায়বিচারক বাদশাহ হারুনুর রশীদের রাজত্ব পরিচালনায় তাঁর স্ত্রী জুবাইদা রশীদ পরিপূর্ণ অংশীদার ছিলেন। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) ফিকাহ শাস্ত্রে ইমাম ও মুজতাহিদরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কাজে তাঁর মায়ের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অবদান অপরিসীম। কাজী শুরাইহ্ (রাঃ)-এর ইসলামী খিলাফতের প্রধান বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে তাঁর স্ত্রীর অনুপ্রেরণা পূর্ণ কার্যকর ছিল।

একথা সত্য যে, যেমনিভাবে প্রত্যেক মহান ব্যক্তি গঠনে মহান নারীর অবদান রয়েছে, তেমনি ভাবে প্রত্যেক অলস ও বদমেজাজ পুরুষের পেছনে কোন না কোন অলস, বদমেজাজ ও বদদ্বীন নারীর কুপ্রভাব রয়েছে।

প্রাচীন যুগে মহিলারা মূর্খ ও অশিক্ষিত হওয়ার কারণে সমাজের জন্য বোঝা স্বরূপ ছিল, কিন্তু বর্তমান আধুনা যুগে কলেজ-ইউনিভার্সিটির ধর্মহীন শিক্ষা সম্মানিত নারী জাতিকে গৃহ থেকে টেনে এনে রাজপথে, মাঠে-ময়দানে, মার্কেটে এনে দাঁড় করিয়ে ছেড়েছে। সন্তান-সন্ততি এবং পারিবারিক জীবন থেকে সরিয়ে বিজ্ঞাপনের মডেল কন্যারূপে বা পুরুষের অফিসের কলিক কিংবা পার্সোনাল সেক্রেটারী রূপে, ক্রেতা সাধারণের সুদৃষ্টি আকর্ষিত করার নিমিত্ত সেলস্ গার্ল রূপে সকল ভদ্র-অভদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নানা জাতের মানুষের সম্মুখে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রদর্শন করাতে বাধ্য করছে। সে দিন বেশী দূরে নয়, যে দিন এই কলেজ পড়ুয়া ধর্মহীন শিক্ষায় শিক্ষিতারা চাকুরীর সোনার হরিণ ধরতে খুল্লুম খোলা নিজের সম্ভ্রম ফেরী করতে বাধ্য হবে। তাই সময় থাকতে নারীদের সম্বিত ফিরিয়ে আনতে হবে।

সন্তান ও মায়ের পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা

আমাদের সমাজে কোন কোন স্বামী স্বীয় স্ত্রী কর্তৃক এমন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হন, যা তার জীবনকে দুর্বিসহ ও অতিষ্ঠ করে তোলে। যেমন, অনেক স্ত্রী এমন রয়েছে, যারা "উপরে ফিট ফাট ভিতরে সদর ঘাট"-এর মত। অর্থাৎ সন্তান জন্ম নেয়ার পূর্বে খুব সাজ-গোজ, পাঙ্ক-পুঙ্ক করে স্বামীর মন ভুলিয়ে রাখে। আর সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার পর এমন নোংড়া, বিশ্রী, অপরিচ্ছন্ন হয়ে যায় যে, স্বামীর জন্য গৃহে দু'মিনিট অবস্থান করাই অসহনীয় হয়ে উঠে। অধিকন্তু, সন্তানদেরও এমন অপরিস্কার, আগোছগাছ করে রাখে যে, কোলে তুলে আদর-সোহাগ করা তো দূরের কথা, কাছে বসাতেও বিব্রতকর, ইতস্ততঃ বোধ হয়। প্রতিটি স্ত্রীর এহেন পরিস্থিতি থেকে গুরুত্ব সহকারে বিরত থাকা কর্তব্য। এমন পরিস্থিতি কখনও সৃষ্টি হতে দেওয়া উচিত নয় যে, আপনার প্রাণপ্রিয় স্বামী আপনার বা সন্তানের প্রতি ঘৃণাবোধ করতে থাকে। এটা নিজের পায়ে নিজে কুড়াল দ্বারা আঘাত করার শামিল। এতে কলিজার টুকরা মিষ্টি মুখের সন্তানরাও পিতার স্নেহ-মায়া ও আদরের বন্ধন হতে বঞ্চিত হয়। আপনার আজকের এ শিশু আগামী দিনের দেশ ও জাতির কর্ণধার, ভবিষ্যত প্রজন্মের আশ্রয়ের উসীলা, পাপী-তাপীদের হিদায়েতের প্রদীপ। এদের পবিত্র জীবনকে নিজ হাতে ধ্বংস করবেন না।

কন্যা সন্তানের প্রতিপালনে তাচ্ছিল্য ভাব প্রদর্শন করবেন না। হতে পারে ঐ কন্যার ভাগ্যলিপিতে উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রাঃ)-এর নাম লিখিত রয়েছে। পুত্র সন্তানের প্রতিপালনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করবেন না। হতে পারে ঐ পুত্রের ললাটে সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর ঝলক প্রকাশ পাবে। আজ ইসলামের এই দুর্দিনে এদের মত মহা পুরুষের একান্ত প্রয়োজন। ইসলামী ইতিহাসে এদের এত প্রয়োজনীয়তা হয়ত আর কোন যুগে পরিলক্ষিত হয়নি। মুসলিম জাতি আজ অসহায়ের মত নেতা বিহীন কালাতিপাত করছে। পুষ্পকানন গুলো মালী বিহীন শুষ্ক তরুলতার মত শুকিয়ে যাচ্ছে। বিধায় ইসলামের শত্রুরা কোন প্রকার ভয়-ভীতি, আতঙ্ক, শংকা, চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই যাকে চাচ্ছে, যাদের চাচ্ছে পৃথিবী থেকে বিদায় দিয়ে দিচ্ছে অথবা যে দেশের উপর চাচ্ছে মোড়লগীরী করছে।

কতইনা ভাল হত, যদি আপনার এ পুত্র সন্তানটি সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী (রাঃ)-এর মত হয়, যাকে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের চক্রান্ত থেকে মহা নবী (সাঃ)-এর দেহাবয়বকে রক্ষা করার মাধ্যম ও উসীলা বানিয়েছিলেন।

কতইনা ভাল হত, যদি আপনার এ শিশুটি শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহ্লভী (রহঃ)-এর মত হয়– যার মাধ্যমে পাক ভারত, উপমহাদেশে লাখো কাফেরদের ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল এবং যিনি লাখো মুমিনের অন্তরে ঈমানের রুহু প্রথিত করেছিলেন।

কতইনা মঙ্গলজনক হত, যদি আপনার কন্যা সন্তানটি ফাতিমা বিনতে আঃ মালিকের মত হত, যিনি মুসলিম বিশ্বের কিংবদন্তী সিংহপুরুষ দ্বিতীয় উমর হযরত ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ)কে জীবনভর উৎসাহ, উদ্দীপনা দিয়ে সহযোগিতা করে গেছেন। হতে পারে আপনার কন্যার উপর ঐ বুযুর্গ ভাগ্যবতী নারীর ছায়া পতিত হবে, যার দ্বারা মহান আল্লাহ দ্বীন ইসলামের সেবা গ্রহণ করবেন।

সুতরাং, ঐ কোমলমতি অবুঝ শিশুদের ধ্বংস হতে দেবেন না। তাদের সদা-সর্বদা এমন পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন, যাতে করে বাড়ীর সকল সদস্যরা ওদের কোলে নিতে, আদর করতে এবং অন্তরের দু'আ দিতে বাধ্য হয়। কন্যা সন্তানকে দু'আ দেওয়ার বিভিন্ন তরীকা নিম্নে লিখিত হল, নানুমনি দেখলে যেন নাতনীকে এই দু'আ দিতে বাধ্য হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি (আমার) ঐ নাতনীকে এবং এর সন্তানদেরকে বিতাড়িত শয়তান হতে আপনার আশ্রয়ে (সোপর্দ করে) দিচ্ছি।

নানা ভাই নাতনীকে হাসীমুখ দেখলে যেন এই দু'আ দিতে বাধ্য হয় ঃ

اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সদা হাসীখুশী রাখুক। (দুঃখের কোন দৃশ্য না দেখাক)

দাদুমনি দেখলে যেন পুতনীকে এই দু'আ দিতে বাধ্য হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا صَالِحَةً

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! এই পুতনীকে সৎ বানাও।

দাদাভাই দেখলে যেন এই দু'আ দিতে বাধ্য হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْهَا بِقُبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْبِتْهَا نَبَاتًا حَسَنًا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! সর্বোত্তমভাবে একে কবুল (প্রতিপালন) করুন এবং

সর্বপ্রকার সুস্থতার সাথে একে বড় করুন।

পিতা দেখলে যেন এই দু'আ দিতে বাধ্য হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ لَنَا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার এ কন্যাকে আমাদের চোখের শীতল বানাও।

মা জননী দেখলে যেন এই দু'আ দিতে বাধ্য হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ نَوِّرْ قَلْبَهَا وَاجْعَلْهَا مُقِيْمَةَ الصَّلٰوةِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি এর অন্তরকে নূরান্বিত কর এবং একে নামাযের পাবন্দ বানাও।

মা কন্যাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখলে যেন এই দু'আ দেয় ঃ

لَااَبْكَاكِ اللّٰهُ اَسْعَدَكِ اللّٰهُ فِى الدَّارَيْنِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমাকে (কখনও) না কাঁদাক, বরং উভয় জগতে অজস্র কল্যাণের অধিকারী করুক। আমীন!!

চাচা দেখলে যেন এই দু'আ দিতে বাধ্য হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا خَادِمَةً لِّدِيْنِكَ وَ دَاعِيَةً اِلَيْكَ وَاِلٰى رَسُوْلِكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! এ (ভাতিজী)কে তোমার দ্বীনের সেবিকা বানাও এবং তোমার ও তোমার রাসূল (সাঃ)-এর (দ্বীনের) প্রতি আহবাহিকা বানাও।

ফুফু আম্মা দেখলে যেন এই দু'আ দিতে বাধ্য হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهَا فِى الدِّيْنِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি দ্বীনের জ্ঞান দান কর।

ক্রমনিভাবে শিশু জ্বরাক্রান্ত অথবা রোগ গ্রস্ত হলে মা এই দু'আ দিবে ঃ

لَابَاْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

অর্থ ঃ কোন আশংকার ব্যাপার নেই। আল্লাহ ইচ্ছা করলে ত্বড়িৎ জ্বর ভাল হয়ে যাবে। (আর এ জ্বর গুনাহ থেকে পবিত্রতার মাধ্যম)।

اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيْكَ

অর্থ ঃ আল্লাহ তোমাকে সুস্থতা দান করুক প্রত্যেক এমন রোগ থেকে, যা তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে।

যে শিশু পরিবার ও বংশের লোকদের থেকে এত দু'আ প্রাপ্ত হয়, তাকে শয়তান, জিন, যাদু, বদ নজর, কিভাবে স্পর্শ করতে পারে? আল্লাহ

তা'আলা এমন শিশুকে সর্ব প্রকার বালা-মুসীবত থেকে হেফাযত করবেন এবং দ্বীনের খাদেম বানাবেন, ইনশাআল্লাহ।

স্মার্তব্য যে, পুত্র সন্তানকে দু'আ দিতে হলে উল্লেখিত দু'আ সমূহে যেখানে ھا আছে সে সেখানে ہ বললেই হবে যেমন- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا এর পরিবর্তে اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ বলবে।

সারকথা, শিশু যখন পরিচ্ছন্ন থাকবে তখন বাড়ীর সকলেই তাকে কোলে নিবে, বুকে জড়িয়ে ধরবে, আদর করে চুমু খাবে এবং মনভরে দু'আ করবে। পক্ষান্তরে শিশু অপরিস্কার থাকলে লোকেরা বলবে, কেমন হতভাগা, ছন্নছাড়া শিশু, যার ভাগ্যে এমন পঁচা, বেপরওয়া অলস মা জুটেছে। হে আল্লাহ! এমন মায়েদের হিদায়াত করুন। (আমীন)

সন্তানদের পরিচ্ছন্নতার কতিপয় দিক নির্দেশনা

(১) শিশুদের প্রতিদিন কমপক্ষে একবার গোছল করাতে হবে। গরমের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে, দু'বারও গোছল করানো যেতে পারে।

(২) পরিধানের বস্তু ময়লাযুক্ত হয়ে গেলে তড়িৎ পরিবর্তন করতে হবে।

(৩) কোন প্রকার বদ-অভ্যাসে অভ্যস্ত হলে, শিশুকে তা থেকে বিরত রাখতে হবে।

(৪) শিশুর নাপাক বিছানা দ্রুত ধৌত করতে হবে। স্মরণ রাখুন, গৃহাভ্যন্তরে নাপাক বস্ত্রাদি কখনও রাখবেন না। নাপাক স্থানে শয়তান আ-গমন করতে সুযোগ পায়। যার কারণে সে গৃহকে বালা-মুসীবত পরিবেষ্টন করে ফেলে।

সুতরাং, নাপাকী থেকে বেঁচে থাকতে হবে এবং শিশু যে বিছানায় বা চাদরে প্রসাব করেছে, তা শুধু রোদ্রে শুকানো যথেষ্ট হবে না, বরং খুব যত্ন সহকারে ধুয়ে পবিত্র করে ব্যবহার করতে হবে।

পবিত্র হাদীস শরীফে এসেছে যে, ঘরের মধ্যে রাত্রি বেলা কোন থাল (ইত্যাদি)-এর মধ্যে প্রসাব একত্রিত করে না রাখা চাই। কেননা, রহমতের ফেরেশতা ঐ গৃহে প্রবেশ করে না, যে গৃহে প্রসাব একত্রিত করে রাখা হয়।

সুতরাং আদর্শ মায়েদের কর্তব্য এই যে, তাঁরা যতদূর সম্ভব এ ব্যাপারে চেষ্টা করবেন যে, শিশুদের মল-মূত্রে ভিজে যাওয়া দুর্গন্ধযুক্ত কাঁথা, পাটি ইত্যাদি কক্ষের মধ্যে বেশীক্ষণ পড়ে থাকতে দিবেন না। বরং যত

তাড়াতাড়ি সম্ভব ওগুলোকে ধুয়ে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখবেন।

কোন কোন মা এ ব্যাপারে অবহেলা ও অলসতা করে থাকেন। তাঁরাও আজ থেকে নিজেকে পরিচ্ছন্নতায় অভ্যস্ত বানিয়ে নিন, যাতে করে সন্তানদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতায় শুরু থেকেই গুরুত্ব দিতে পারেন। শিশুদেরকে প্রস্রাব ইত্যাদির থেকে অবসর হওয়ার পর খুব যত্ন সহকারে ধৌত করার ব্যবস্থা করবেন। নিজেও স্বীয় শরীর এবং পরিধেয় বস্ত্রের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। বিশেষ করে মল-মূত্র ত্যাগ করার পর শিশুদের ধৌত করার সময় প্রস্রাবের ফোঁটা থেকে বেঁচে থাকার প্রতি গুরুত্ব দিবেন। ধোয়ানোর পর নিজ হস্তদ্বয়কে সাবান দ্বারা খুব ভাল করে ধুয়ে নিবেন। সম্ভব হলে সর্বাবস্থায় উজু সহ থাকার চেষ্টা করবেন।

শিশুদের প্রতিপালন ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে বিশিষ্ট বুযুর্গ হযরত ইবরাহীম ইবনে সালেহ কয়েকটি পংক্তি লিখেছেন যার সারমর্ম হচ্ছে -

"নিজ সন্তানদের শৈশবেই সুন্দর আদব, আদর্শ ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিন। যাতে করে বড় হয়ে তাদের আদরভরা কথা বার্তা শ্রবণ করে, আদর্শ ভরা আচরণ দেখে চক্ষুযুগল শীতল হয়। শৈশবেই ভদ্রতা-নম্রতা শিক্ষা দিন এবং নিয়মতান্ত্রিক ভাবে শিশুর প্রতিপালন করুন। কারণ, পাথর কেটে লিখলে যেমন মুছে যায় না, তেমনিভাবে শৈশবের অভ্যাস দূর করা যায় না। শেষ বয়স পর্যন্ত চলে।"

শিশুদের হৃদয় গভীরে ইবাদতের বীজ বপন করুন

আদর্শ মায়ের কর্তব্য এই যে, শৈশব কাল হতে আল্লাহর সাথে শিশুদের সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে থাকুন। যেমন, শিশু যদি কোন জিনিষ খেতে চায় বা নিতে চায়, তখন সর্ব প্রথম তাকে শিক্ষা দিন যে, আগে আল্লাহর নিকট চাও, অতঃপর আম্মুর নিকট চাও। কারণ, সব কিছুর দাতা আল্লাহ তা'আলাই। আম্মুকেও অমুক জিনিষ আল্লাহ তা'আলাই দিয়েছেন। যদি প্রথমে আল্লাহর কাছে চাও, পরে আম্মুর কাছে চাও, তাহলে তুমি ছাওয়াব তো পাবে এবং আল্লাহ তা'আলাও সন্তুষ্ট হবেন। এমনিভাবে যদি কোন দামী বা বড় জিনিষ চায় যে, "আম্মু আমাকে ঐ দামী জিনিষটা কিনে দাও, তখন এটা বলবেন না যে, আব্বু এলে তার কাছে চেয়ো। বরং এরূপ বলবেন যে, বৎস! আল্লাহর নিকট চাও। যদি নামায পড়ার বয়স হয়ে থাকে, তাহলে বলবেন যে, দু'রাক'আত নফল নামায পড়ে আল্লাহর নিকট চাও। অতঃপর আব্বুকে বল যে, আমার অমুক জিনিষ দরকার। যাতে তোমার আব্বু প্রয়োজন পূর্ণ করার ছাওয়াব প্রাপ্ত হন।

আরো বলবেন, বৎস! স্মরণ রেখো, যখন আল্লাহ তা'আলা দেওয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন তোমার আব্বুর অন্তরে দেওয়ার ইচ্ছা সৃষ্টি করে দিবেন। আর যদি আল্লাহই দেওয়ার ইচ্ছা না করেন, তাহলে ঐ জিনিষ কেউই দিতে পারবে না। তাই "দেনেওয়ালা আল্লাহই এ কথা মানতে হবে। যে যতটুকু পেয়েছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই পেয়েছে। তোমাদের আমাদের যা কিছু দরকার, তা আল্লাহ তা'আলাই দিবেন। তাই আল্লাহর নিকটই প্রার্থনা করে চাও।

এমনিভাবে মা মাঝে মাঝে আল্লাহর সাথে শিশুর সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে থাকবেন, তাকে ঈমান ও ইয়াক্বীনের কথা শিক্ষা দিতে থাকবেন। তখন আগামী জীবনে যতগুলো স্তর বা ধাপ আসবে, সবগুলোতে সে আল্লাহর নিকট হতে সমস্ত সমস্যা সমাধান করিয়ে নিবে। মানুষের সম্মুখে তার হস্ত প্রসারিত করার প্রয়োজনও হবে না এবং গাইরুল্লাহর প্রতি তার অন্তর অনুকণা পরিমানও ঝুঁকবে না।

এমন মা, যে শিশুকাল থেকেই শিশুদের প্রতিপালন ঈমান ও ইয়াক্বীনের সাথে করবেন, তার শিশুরা বড় হয়ে সমাজে বৃহৎ বৃহৎ কাজ করতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের দ্বারা দ্বীনের বড় বড় কাজ নিবেন।

এমনই এক মাতা-পিতার একটি ঘটনা কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে, যারা নিজ সন্তানদের শৈশব থেকেই ঈমান, ইয়াক্বীন ও আমলের দ্বারা সমস্যা সমাধান করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে প্রতিপালন করে যাচ্ছিলেন। প্রতিদিন যখন ঐ শিশু মাদ্রাসা থেকে বাড়ী ফিরে এসে খাদ্য চাইত; তখন মা তাকে বলতেন, বৎস! দু'রাক'আত নফল নামায পড়ে আল্লাহর নিকট খাদ্য চাও। নিশ্চয় তিনি উত্তম রিযিকদাতা, তিনি খাদ্যদাতা, তিনি উদরপূর্ণকারী। মায়ের কথা শ্রবণ করে শিশুর কর্ণকুহরে, হৃদয় গভীরে ঐ ঈমানদীপ্ত অমীয় বাণী ধ্বনিত হতে হতে এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, "মায়ের কাছে চেয়ে কোন লাভ নেই, আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করাই আসল কাজ। তাই সে শিশু প্রতিদিন দু'রাক'আত নামায পড়ে খাদ্য চাইত। মা যখন সন্তানকে নামাযরত অবস্থায় দেখতেন, তখন তড়িৎ গতিতে দস্তরখানের উপর খানা রেখে দিতেন। এমনিভাবে যখন শিশু নামায আদায় করে দু'আ পাঠ করে জায়নামায থেকে উঠত, তখন খাদ্য উপস্থিত দেখতে পেত। আর সে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করে খাদ্য খেয়ে নিত। প্রতিদিনের কর্ম পদ্ধতি এমনই চলছিল এবং মাতা-পিতা এভাবে সন্তানদের সুষ্ঠু প্রতিপালন

ও পরিচর্যা করে যাচ্ছিলেন। এদিকে শিশুর ঈমান ও আমলের উপর বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছিল।

কিন্তু একদিন এক আশ্চর্য ও ঈমানী চেতনা উজ্জীবনকারী চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে গেল। তা হল এই যে, ঐ শিশুর মাকে একবার কোন এক প্রয়োজনে বাড়ীর বাইরে যেতে হল। শিশু যখন মাদ্রাসা থেকে বাড়ী ফিরে এল, তখন মাকে বাড়ীতে না পেয়ে কোন প্রকার চিন্তিত হল না। বরং পূর্বের ন্যায় দু'রাক'আত নামায আদায় করে আল্লাহর নিকট খাদ্য চাইতে লাগল। ওদিকে মায়ের মন বিচলিত ও উদগ্রীব হয়ে উঠল এবং তিনি মনে মনে উৎকণ্ঠিত হয়ে ভাবতে লাগলেন যে, আজ তো আমার ছেলের আমলের উপর বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে। তাই তিনি বাড়ীর দিকে দ্রুত রওনা হয়ে গেলেন। বাড়ীতে পৌঁছে দেখতে পেলেন যে, শিশু অঘোরে ঘুমাচ্ছে। জাগ্রত হয়ে সে নিজেই আনন্দিত হয়ে মাকে বলছে, আম্মাজান! আজ যে সুস্বাদু খাদ্য আল্লাহ তা'আলা আহার করিয়েছেন, আমি আজকের পূর্বে কখনও এমন খাদ্য আহার করিনি। এ কথা শ্রবণ করে মা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং খুব খুশী হলেন। যখন সন্ধ্যা বেলা পিতা বাড়ী ফিরলেন, তখন মা তাকে সেই আনন্দ সংবাদ সম্পর্কে অবহিত করে বললেন যে, মহান আল্লাহর পরম অনুগ্রহে আমাদের সন্তান সহীহ ইয়াক্বীন শিখে ফেলেছে এবং নামাযের মাধ্যমে তার সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

এখন শিশুদের উপদেশ মূলক একটি হাদীস উল্লেখ করছি। ইমাম তিরমিযী (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একদিন আমি নবী করীম (সাঃ)-এর পশ্চাতে আরোহিত ছিলাম। আমাকে উদ্দেশ্য করে প্রিয় নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করলেন, হে বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিক্ষা দিচ্ছি। তুমি আল্লাহর হক হিফাজত কর। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে হিফাজত করবেন। তুমি হুকুকুল্লাহর প্রতি লক্ষ্য রেখ, তাহলে আল্লাহ তা'আলাকে সম্মুখে পাবে। আর তখন আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। আর এই কথা জেনে রাখ যে, যদি সমস্ত মাখলুকও তোমাকে সামান্য উপকৃত করতে চায়, তাহলে তোমাকে ততটুকুই উপকৃত করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য লিপিবদ্ধ করেছেন। আর যদি সকলে একত্রিত হয়ে তোমার সামান্য ক্ষতি সাধন করতে উদ্যত হয়, তাহলে তোমার ততটুকু ক্ষতি সাধন করতে পারবে– যতটুকু আল্লাহ তা'আলা তোমার ভাগ্যের লিখনে লিখে দিয়েছেন। কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং সহীফা শুষ্ক হয়ে গেছে।

(তিরমিযী, ২ : ৭৮)

একত্ববাদ সম্পর্কিত একটি কবিতার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হল। প্রত্যেক আদর্শ মায়ের কর্তব্য হল অনুবাদটি শিশুদের মুখস্থ করিয়ে দেওয়া ঃ

১। বৎস! তোমার জীবন যদি অবহেলা ও উদাসীনতায় অতিবাহিত হয়, তাহলে তাওবা কর এবং আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত থাক। যদি তুমি নাফরমানী থেকে বিরত থাক, তাহলে তিনি তোমার জন্য এমন স্থান থেকে জীবিকার সুব্যবস্থা করবেন– যেখানের ধারণা ও কল্পনাও তোমার হবে না।

২। তুমি জীবিকার জন্য কেন চিন্তিত হচ্ছ? অথচ মহান আল্লাহ তা'আলা সকলের রিযিকদাতা। তিনিই আকাশে উড়ন্ত পক্ষীকুলকে রিযিক দান করেন এবং সমুদ্র গভীরে মৎসকুলকেও রিযিক দান করেন।

৩। যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, জীবিকা শক্তির বলে অর্জন করা যায়, সে ভ্রান্তিতে ডুবে আছে। কারণ, তাহলে তো চিল-শকুনের দাপটে টুনটুনি আর চড়ুই পাখি কিছুই খেতে পেত না।

৪। বৎস! তুমি এ সুন্দর বসুন্ধরায় আনন্দ চিত্তে ঘুরে বেড়াচ্ছ। অথচ রাত্রের পর আগামী কাল প্রভাত পর্যন্ত তুমি বাঁচবে কিনা তোমার জানা আছে কি?

৫। কত সুস্থ-সবল ব্যক্তিরা কোন প্রকার রোগ-শোক ছাড়াই পরকালে পাড়ি জমিয়েছে এবং কত অসুস্থ, মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তিরা দীর্ঘকাল বয়স পেয়েছে। তাতে বুঝা যায় যে, হায়াত, মওত, সুস্থতা, অসুস্থতা আল্লাহর আদেশে আগমন করে এবং প্রস্থান করে।

৬। অসংখ্য যুবককে তুমি প্রভাতকালে ও গোধুলী বেলায় হাশ্বাস-বাশ্বাস, আনন্দে উচ্ছসিত অবস্থায় দেখতে পাবে, অথচ আজ রাত্রেই তাকে কাফন পরিধান করানো হবে, আর সে এ সংবাদ সম্পর্কে একেবারেই অনবগত।

৭। বৎস! এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে যদি কেউ এক হাজার বৎসর অথবা দু'হাজার বৎসরও হায়াত প্রাপ্ত হয়, ইয়াক্বীন রাখ! তাকেও একদিন কবরে যেতে হবে।

সন্তানদের অবশ্যই কুরআন শিক্ষা দিন

শিশুদের যত্ন নেওয়া, তাদের তত্ত্বাবধান করা এবং প্রতিপালন করার গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) একাধিকবার আদেশ করেছেন, অসংখ্যবার নির্দেশ দিয়েছেন, ওসীয়ত করেছেন। উল্লেখযোগ্য ওসীয়ত ও আদেশ

সমূহ হতে কতিপয় নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

(১) عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنَ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيتِهِ وَالاَمِيْرُ رَاعٍ وَالرَّ جُلُ رَاعٍ عَلَيْ اَهْلِ بَيتِهِ – وَالْمَرأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَيْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَ وَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رِعَيَّتِهِ – متفق عليه

অর্থঃ হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "তোমরা প্রত্যেকেই পাহারাদার ও রক্ষক। তোমাদের প্রত্যেককেই তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। শাসক (জনগণের) রক্ষক। পুরুষ তার পরিবার-পরিজনের রক্ষক। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের ও সন্তানদের দায়িত্বশীল, রক্ষক। সুতরাং তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, রক্ষক। আর তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্থ ও জিম্মাদারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

(২) عَلِّمُوْا اَوْلاَدَكُمْ وَاَهْلِيْكُمُ الخَيْرَ وَ اَدِبُوْهُمْ رواه عبد الرزاق

অর্থ ঃ তোমাদের সন্তান ও পরিবার-পরিজনদের মঙ্গল ও কল্যাণের শিক্ষা দাও এবং তাদের আদব ও শিষ্টাচার তালীম দাও।

(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক)

(৩) اَدِّبُوْا اَوْلاَدَكُمْ وَ اَحْسِنُوْا اَدَبَهُمْ – رواه ابن ما جه

অর্থ ঃ নিজ সন্তানদের আদব, শিষ্টাচার শিক্ষা দাও এবং উত্তমভাবে প্রতিপালন কর। (ইবনু মাজা)

(৪) مُرُوْا اَوْلاَدَكُمْ بِامْتِثَالِ الْاَوَامِرِ وَاجْتِنَابِ الْنوَا هِيْ فَذَالِكَ وِقَايَةً لَهُمْ مِن النار– رواه ابن جرير

অর্থ ঃ নিজ সন্তানদের শরীয়তের আদেশ পালন এবং নিষিদ্ধ কর্মসমূহ হতে বিরত থাকার আদেশ দাও। কেননা, এগুলো তাদের জন্য জাহান্নাম থেকে বাঁচার মাধ্যম। (ইবনু জারীর)

(৫) اَدِّبُوْا اَوْلاَدَكُمْ عَلٰى ثَلاَثِ خِصَالٍ : حُبِّ نَبِيِّكُمْ، وَحُبِّ اٰلِ بَيْتِهِ، وَتِلاوَةِ الْقُرْاٰنِ، فَإِنَّ حَمَلَةَ الْقُرْاٰنِ فِيْ ظِلِّ عَرْشِ اللّٰهِ، يَوْمَ لاظِلَّ إِلاظِلُّهُ.

(رواه الطبرانى)

অর্থ ঃ নিজ সন্তানদের তিনটি কথা শিক্ষা দাও ঃ (ক) প্রিয় নবীজীর (সাঃ) প্রতি ভালবাসা, (খ) তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি ভালবাসা, (গ) কুরআন পাকের তিলাওয়াত। কেননা, কুরআনে পাকের বহনকারী (তিলাওয়াতকারী) ঐ দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় অবস্থান করবে, যেদিন তাঁর আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়াই থাকবে না। (তাবরানী)

সুতরাং, মুসলিম আদর্শ মায়েদের কর্তব্য এই যে, নিজ সন্তানদের অবশ্যই কুরআন পাক শিক্ষা দিবেন। আর এমন উত্তমরূপে শিক্ষা দিবেন যে, কেমন যেন কুরআন পাক অবতীর্ণ হচ্ছে। অর্থাৎ তাজবীদ এবং মাখরাজ ও সহীহ উচ্চারণের প্রতি খুব যত্নবান হয়ে। মা যতটুকু তার জন্য মেহনত ও কষ্ট করবেন, ততটুকু মা ছাওয়াব প্রাপ্ত হবেন। আর সন্তান যতদিন জীবিত থাকবে এবং শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করবে এবং যতদিন অন্য মুসলমান শিশুদের কুরআন শিক্ষা দিবে, ততদিন শিশুর ঐ মা সকলের তিলাওয়াতের ছাওয়াব প্রাপ্ত হবেন।

তাই, প্রতিটি আদর্শ মায়ের করণীয় এই যে, শৈশবেই নিজ সন্তানকে নূরানী কায়েদা, আমপারা সহীহ শুদ্ধভাবে পাঠ করিয়ে মুখস্থ করিয়ে দেওয়া এবং বিভিন্ন আলেম-উলামা বা প্রসিদ্ধ ক্বারী সাহেবান দ্বারা শিশুর পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। অধিকন্তু, পরীক্ষার ফলাফল আকর্ষণীয় হলে হালকা, সামান্য হলেও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা। আর ফলাফল আশানুপাত ভাল না হলে হালকা ভর্ৎসনার ব্যবস্থা করা। এছাড়া পরীক্ষার ফলাফল ভাল হোক বা না হোক, দৈনন্দিনের পড়া দৈনন্দিন লিখানোর ব্যবস্থা করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সন্তানদেরকে কুরআন শরীফ সহীহ শুদ্ধরূপে পাঠ করার, তার অর্থ বুঝার এবং তার উপর আমল করার ও সমগ্র পৃথিবীতে কুরআনী তালীম প্রচার-প্রসার করার সামর্থ দান করুন। (আমীন)

সন্তান প্রতিপালনের সোনালী পদ্ধতি

সন্তান প্রতিপালন নারী জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। গুরুত্বপূর্ণ যে কোন বিষয় নিয়মতান্ত্রিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। সন্তান প্রতিপালন কালে মায়েদের নিয়মনীতি ও আদর্শ শিক্ষা করা ও তা মেনে চলা একান্ত প্রয়োজন। আদর্শ মায়েদের জন্য কিছু সোনালী পদ্ধতি নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

(১) সন্তানদের কখনও জ্বিন, ভুত, প্রেত ইত্যাদির ভয় দেখাবেন না। এটা খুবই বদঅভ্যাস। এতে শিশুদের অন্তরে ভীতি আতঙ্ক ও ত্রাস সৃষ্টি

হয়। আর ভয়-ডর, আতঙ্ক সমস্ত অনিষ্টের মূল। শিশুকে বীরত্ব ও সাহসিকতা শিক্ষা দিতে হবে।

(২) শিশুকে দুধ পান করানোর এবং খাবার খাওয়ানোর সময় (টাইম) নির্দিষ্ট করে নিন। এতে শিশুর সুস্থতা স্থায়ী ও দৃঢ় থাকে। আর শিশুও শৈশব কাল থেকে সময়ের যথার্থ মূল্যায়ন করতে শিখে যাবে।

(৩) শিশুদের সদা-সর্বদা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন। গরমকালে প্রতিদিন গোছল করাবেন। শীতকালে কুমকুম গরম পানির দ্বারা শরীর ধোয়াবেন। এতে শিশুর সুস্থতা বহাল ও স্থায়ী থাকবে। তাকে সদা-সর্বদা পরিচ্ছন্ন থাকার তা'লীম দিন। কেননা, সুস্থতা পরিচ্ছন্নতার উপর নির্ভরশীল।

(৪) সব সময় শিশুর সাজ-সজ্জা করবেন না। পুত্র হলে মাথার কেশ বৃদ্ধি হতে দিবেন না। রাত্রে শিশুদের নয়ন যুগলে আলতো করে সুরমা লাগাবেন। এতে দৃষ্টির সমস্যা দূর হয়ে যাবে, ইনশা আল্লাহ।

(৫) শিশুর হাত দ্বারা গরীব-দুঃখীকে অন্ন, বস্ত্র, টাকা-পয়সা দান করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। যাতে তাদের মধ্যে দানশীলতার অভ্যাস সৃষ্টি হয়।

(৬) শিশুদের সাথে চিৎকার করে কথা বলা থেকে বিরত থাকুন। নম্রভাবে বুঝাতে চেষ্টা করুন। চিৎকার করে কথা বলা বে-আদবী এবং বদ-অভ্যাস। এমন মানুষকে লোকেরা ষাঢ় বলে।

(৭) যে সব শিশুদের স্বভাব চরিত্র বদ, খারাপ, নিন্দনীয়, লেখা-পড়ায় চোর, আওয়ারা ও টোকাই স্বভাবের, অধিক অপব্যয়কারী তাদের সংশ্রবে উঠা-বসা করতে কখনও দিবেন না। খেলা-ধুলাও করতে দিবেন না।

(৮) মিথ্যা, ক্রোধ, জ্বালাতন, লোভ, গালা-গালী, চুরী, চোগলখোরী, পরনিন্দা, প্রতারণা, চালবাজী, ফেরেববাজী, লুচ্চাপনা, বেহায়াপনা, সংকীর্ণমনা, হিংসা-বিদ্বেষসহ সর্ব প্রকার বদ-অভ্যাসের প্রতি শিশুর অন্তরে ঘৃণা ও ধিক্কার সৃষ্টি করুন। এর মধ্য হতে যদি কোন একটি বদস্বভাব শিশুর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, তাহলে তৎক্ষণাত তা প্রতিহত করুন, শাসিয়ে সাবধান করে দিন। যদি এতে ভ্রুক্ষেপ না করে, তাহলে উপযোগী কিছু হালকা শাস্তির ব্যবস্থা করুন। অযথা অযাচিত আদর-আহ্লাদ শিশুর জন্য ক্ষতিকর। সব সময় লাই দিলে পরে আফসোস করতে হবে। তখন আফসোস করা কোন উপকারে আসবে না।

(৯) যখন শিশু সামান্য বুদ্ধি ও বিবেকের অধিকারী হয়ে যাবে, তখন তাকে নিজ হাতে আহার করতে অভ্যস্ত করুন। পানাহার করার পূর্বে ও পরে হাত ধৌত করা সুন্নতী নিয়ম শিক্ষা দিন। শিশুদের কম খেতে অভ্যস্ত

করুন, যাতে রোগ-শোক ও লোভ-লালসা থেকে দূরে থাকতে পারে।

(১০) শিশুদের হাত-পা মুখ ইত্যাদির পরিচ্ছন্নতার প্রতি গুরুত্ব সহকারে খেয়াল রাখুন। অপরিষ্কার ও নোংড়া হয়ে গেলে তৎক্ষণাত ধুয়ে পরিস্কার করে দিন।

(১১) শিশুদেরকে একাকী বাজারে বা মার্কেটে যেতে দিবেন না। সাথে কোন সঙ্গী হওয়া আবশ্যক। খেলা-ধুলার সময় মাত্রাতিরিক্ত লম্ফ-ঝম্ফ করতে দিবেন না। উঁচু স্থানে খেলতে দিবেন না। শরীয়ত বিরোধী ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে দিবেন না। ভাল এবং সৎ ছেলে-মেয়েদের সাথে খেলা-ধুলা করতে দিবেন।

(১২) মাঝে মধ্যে পার্ক বা শিশু উদ্যানে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারেন। নিয়মিত যেতে অভ্যস্ত করবেন না। শিশুর প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর সঠিক ও মাধুর্যপূর্ণ ভাষায় দিতে ভুলবেন না। অনর্থক অপ্রয়োজনীয় কথা বা প্রশ্ন থেকে বিরত রাখুন।

(১৩) শিশুদের এমন অভ্যাসে অভ্যস্ত করুন, যেন নিজ বাড়ীর লোকদের ছাড়া অন্য কারো থেকে কিছু না চায় এবং বিনা অনুমতিতে কারো থেকে কিছু না নেয়।

(১৪) শিশু যদি কোন জিনিষ ভেঙ্গেচুড়ে ফেলে অথবা কাউকে প্রহার করে, তাহলে উষ্ণভাবে শাসিয়ে দিন, যাতে আগামীতে এমন অশুভ আচরণ করার দুঃসাহস না পায়। এমতবস্থায় ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা অথবা প্রশ্রয় দেওয়া তার জন্য সমীচীন নয় সে স্বাধীনতা হয়ে উঠবে। তখন সামলানো বা আয়ত্বে আনা মুশকিল হয়ে পড়বে।

(১৫) টি, ভি এবং ভিসি,পি সহ সর্বপ্রকার ঈমান বিধ্বংসী প্রোগাম দেখা থেকে সন্তানদের বিরত রাখুন; নিজেও বিরত থাকুন। রাত্রে তাড়াতাড়ি নিদ্রা যাপনের ব্যবস্থা করুন এবং খুব সকালে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিন।

(১৬) শিশুর বয়স সাত বৎসর হলে, নামায পড়তে অভ্যস্ত করুন। আর দশ বৎসর বয়সে যদি নামায না পড়ে, তাহলে প্রহার করে হলেও নামায পড়তে বাধ্য করুন।

(১৭) মকতবে যাওয়ার বয়স ও বুদ্ধি-জ্ঞান হলে সর্বপ্রথম কুরআন পাকের শিক্ষা দিন। যতদূর সম্ভব দ্বীনদার শিক্ষক নিয়োগ করুন। নিয়মিত মকতবে প্রেরণ করুন। এতে কোন প্রকার ছাড় বা অবহেলা করবেন না।

(১৮) শিশুর উপর মাত্রাতিরিক্ত লেখা পড়ার বোঝা চাপিয়ে দিবেন না।

প্রথম প্রথম লেখা-পড়ার জন্য এক ঘন্টা নির্দিষ্ট করে নিন। অতঃপর দু'ঘন্টা, অতঃপর তিন ঘন্টা। এমনিভাবে শিশুর মেধা ও শক্তি-সামর্থ অনুযায়ী কাজ নিন। দিনভর মাথার মগজের উপর চাপ সৃষ্টি করবেন না। তাতে প্রথমতঃ শিশু ক্লান্ত হয়ে অতিষ্ট হয়ে উঠবে, দ্বিতীয় ঃ সীমাতিরিক্ত মেহনতের কারণে মন-দিল ও মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে।

(১৯) রাত্রে ঘুম পাড়ানোর সময় নবী–রাসুলগণের, সাহাবায়ে কিরামের, পীর, গাউস-কুতুব ও আল্লাহ ওয়ালাদের কেচ্ছা কাহিনী শ্রবণ করাবেন। এতে শিশুর অন্তরে ঈমানী চেতনা উজ্জীবিত হবে। শিশু যত বেশী ধর্ম-কর্ম পালন করবে, তত বেশী সৎ ও নেক হিসেবে জীবন যাপন করতে পারবে।

(২০) প্রেম-ভালবাসা, অশ্লীলতা, উলঙ্গপনা, বেহায়াপনা সম্বলিত কোন বই-পত্র, পত্রিকা, ম্যাগাজিন, ভিউকার্ড, এলবাম, ক্যালেন্ডার ইত্যাদি শিশুকে দেখতে দিবেন না, পড়তে দিবেন না, ক্রয় করতে দিবেন না। যারা অশ্লীলতার গল্প-গুজব করে তাদের সাথে মিশতে দিবেন না।

(২১) শিশুকে কখনও সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রাভিনয়, নাটক দেখার সুযোগ দিবেন না এবং বাজনা ও কুফর-শিরক সম্বলিত জারীগান, ছায়াছবির গান শুনতে দিবেন না, গাইতে দিবেন না। বরং হামদ-না'ত ও ইসলামী গজল শিক্ষা দিবেন।

(২২) মাদ্রাসা বা স্কুল থেকে প্রত্যাবর্তন করলে পরে কিছু সময়ের জন্য খেলাধুলা বা ব্যায়াম করার অনুমতি দিতে পারেন। তবে খেলা-ধুলা এমন পর্যায়ের হতে হবে, যাতে গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনাও নেই, আঘাত লাগার সম্ভাবনাও নেই।

(২৩) নিজ শিশুকে অবশ্যই কোন না কোন কারিগরী বা প্রকৌশলী বিদ্যা শিক্ষা দিন। যাতে করে প্রয়োজনের সময় বা বিপদের সময় নিজের সন্তানদের জীবিকা নির্বাহের সুব্যবস্থা করতে পারে।

(২৪) শিশুদের নিজের কাজ নিজে করতে অভ্যস্ত করুন। যাতে পঙ্গু বা অলস না হয়ে যায়। বরং তাদের আদেশ করুন, যেন তারা নিজের বিছানা নিজেই করে এবং সকাল বেলা আবার নিজেই গুছিয়ে রাখে।

(২৫) কন্যা সন্তানদের উপদেশ দিন, তারা যেন রাত্রে নিদ্রা যাপন কালে আর প্রভাত বেলায় নিদ্রা হতে জাগ্রত হওয়ার প্রাক্কালে নিজ কান বা গলার অলংকারাদি ভেঙ্গে না যায়, তার প্রতি যত্নবান হয়।

(২৬) কন্যা সন্তানদের গুরুত্ব সহকারে নির্দেশ দিন, যেন তারা রান্না-বান্না ঘর গোছানো, ঘর সাজানোর কাজ-কর্মের প্রতি পূর্ণ মনোযোগী হয় এবং মায়ের সহযোগিতায় আত্মনিয়োগ করে। এ ছাড়া মজার মজার খাদ্য-দ্রব্য রান্না-বান্না নিজে শিক্ষা করতে সচেষ্ট হয়।

(২৭) শিশু যখন প্রশংসনীয় কোন কাজ করে বা কথা বলে, তখন তাকে উৎসাহ, প্রেরণা ও সাবাসী দিন, তাকে আদর করুন। বরং পুরস্কারও দিন। যাতে তার উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায় এবং পূণর্বার ঐরূপ প্রশংসনীয় কাজ করার আগ্রহ জাগ্রত হয়। আর যদি কোন নিন্দনীয় বা ধিক্কারের কাজ করে, তাহলে প্রথমে তাকে একাকী নির্জনে নিয়ে বুঝান এবং বলুন যে, এ কাজ তো খুবই খারপ ও ঘৃণার কাজ। লোকে শুনলে কি বলবে? খবরদার! আগামীতে এমন কাজ আর কখনও করবে না। সৎ ও ভাল ছেলেরা এমন কাজ করে না। এতদসত্ত্বেও যদি সে বিরত না হয়, তাহলে উপযোগী কোন হালকা শাস্তি দিয়ে দিন।

(২৯) শিশুকে খেলা-ধুলা, খাওয়া-দাওয়া, লেখা-পড়াসহ কোন কাজ গোপনে, নির্জনে, একাকী লুকিয়ে-লুকিয়ে করতে দিবেন না। যদি গোপনে কোন কাজ করে, তাহলে মনে করতে হবে যে, কাজটি নিন্দনীয় বলেই হয়ত প্রাকাশ্যে করতে সাহস পাচ্ছে না। কাজটি যদি সত্যিই ভাল হয়, তাহলে সকলের সম্মুখে করতে অভ্যস্ত করুন।

(৩০) শিশুকে কিছু কষ্ট ও ব্যায়ামের কাজ অর্পন করা উচিত, যাতে তার শরীর-স্বাস্থ্য সবল থাকে এবং অলস না হয়। কন্যা সন্তানদেরও শরীয়ত সম্মত শরীর চর্চার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

(৩১) শিশুকে নম্রতা-ভদ্রতা ও সভ্যতা শিক্ষা দিন। ভাষা, চাল-চলন, আচার-আচরণ, ব্যবহার, লেন-দেন ও ইশারা-ইঙ্গিতে যেন বড়ত্ব, অহংকার, অহমিকা প্রকাশ না পায়, সে দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখুন।

(৩২) শিশুর কোন কিছুর প্রয়োজন হলে যেন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, সে শিক্ষা দিন। কোন মাখলুকের নিকট যেন মাথা নত না করে, সে শিক্ষা অবশ্যই দিবেন প্রতিটি শিশুকে।

সন্তানদের ফরয নামাযের গুরুত্ব শিক্ষা দিন

কোন মুসলমানের একথা অজানা নয় যে, নামায ইসলামের একটি মৌলিক স্তম্ভ এবং সমস্ত ফরযের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। অসংখ্য

আয়াত ও হাদীসে এর প্রমাণ বিদ্যমান। যেমন, মহান আল্লাহ তা'আলা মহা গ্রন্থ আল কুরআনের সুরা হুদ–এ ইরশাদ করেন ঃ "দিনের উভয় প্রান্তে অর্থাৎ সকাল ও সন্ধ্যায় এবং রাত্রেরও একাংশে নামাযকে কায়েম কর। নিঃসন্দেহে নেক কাজ সমূহ পাপ-পঙ্কিলতা সমূহকে দূর করে দেয়। যারা উপদেশ মেনে চলে, তাদের জন্য এটা উপদেশ স্বরূপ।

এমনিভাবে অন্য এক আয়াত রয়েছে, "তোমরা নামায ও ছবরের দ্বারা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর।" (সূরা বাক্বারা) সূরা আল- আনকাবুতের ৪৫ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অবশ্যই নামায মানুষকে অশ্লীল ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে।"

নামাযের ফযীলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী (সাঃ)-এর একটি হাদীস বুখারী ও মুসলিম শরীফে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা ভেবে দেখ, তোমাদের কারো ঘরের দরজায় যদি একটি নদী প্রবাহিত হতে থাকে এবং সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করতে থাকে, তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে কি? সাহাবাগণ বললেন, না, তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে না। তিনি বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের এটাই দৃষ্টান্ত। এ নামাযগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা গুনাহ মুছে ফেলে দেন।

সেই হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে মুসলিম শরীফে প্রিয় নবীজী (সাঃ)-এর অন্য একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও এক জুমু'আ থেকে আর এক জুমু'আ পর্যন্ত পঠিত নামায-এর মধ্যকার সব গুনাহের জন্য কাফ্ফারা, যে পর্যন্ত কবীরাহ গুনাহ না করা হয়।

কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে যেহেতু নামাযের এত ফযীলত ও গুরুত্ব, তাই প্রতিটি আদর্শ মায়ের কর্তব্য এই যে, সন্তান পুত্র হোক বা কন্যা হোক তার বয়স যখন সাত বৎসর পূর্ণ হবে, তখন তার প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে যে, সে নিয়মিত সময় মত ফরয নামাযগুলো আদায় করছে কি-না? কন্যাদের জন্য গৃহাভ্যন্তরে নামায পড়ার আদেশ এবং পুত্র সন্তান ও বয়স্ক পুরুষদের জামা'আতের সাথে নামায পড়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। তাই শিশুদের নামাযের বাস্তব অনুশীলন করানো আবশ্যক। নামাযে পঠিত হয় এমন সূরাহ ও তাসবীহ সমূহ খুব গুরুত্ব সহকারে মুখস্থ, কণ্ঠস্থ করিয়ে দিতে হবে এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে তা ব্যবহৃত হচ্ছে কি-না, তার

খোঁজ-খবর নিতে হবে। এ ব্যাপারে সন্তানকে কোন প্রকার ছাড় বা রেয়ায়েত করা যাবে না। যে পুত্র সন্তান জামা'আতের সাথে নামায আদায় করে না, তাকে যে কোন মূল্যে জামা'আতের সাথে নামায পড়তে অভ্যস্ত করতে হবে।

এর জন্য সব চেয়ে উত্তম ও পরীক্ষিত উপদেশ ও দিক নির্দেশনা এই যে, হযরত শাইখুল হাদীস যাকারিয়া (রহঃ) কর্তৃক লিখিত ফাযায়িলে নামায গ্রন্থখানী প্রতিদিন ঘরে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তালীমের ব্যবস্থা করা এবং লিখতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে মুখস্থ করানোর ব্যবস্থা করা। যে শিশু হাদীসসমূহ বেশী মুখস্থ করতে পারবে, তার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা।

মিথ্যা থেকে পরিপূর্ণ বিরত রাখুন

একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, শিশুদেরকে যে কোন মূল্যে, যে কোন পদ্ধতিতে হোক সত্যবাদীরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং মিথ্যা বলা থেকে বিরত রাখতে হবে।

মিথ্যা শুধু গুনাহের কবীরাই নয়, বরং অসংখ্য গুনাহের জন্মদাতা এবং অগণিত গুনাহে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যম। সুতরাং শিশুর অন্তরে গুনাহ সম্পর্কে ঘৃণাবোধ প্রথিত করতে হবে। যাতে করে সে সদা-সর্বদা সত্য কথা বলতে অভ্যস্ত হয় এবং পরিপূর্ণ রূপে মিথ্যা বলা থেকে পরহেয করে। এমন হলে এ কথা দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, শিশু নিজেই অসংখ্য গুনাহ থেকে বিরত থাকতে সক্ষম হবে। তাইতো প্রিয় নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন,

"মিথ্যা থেকে বিরত থাক। কেননা, মিথ্যা পাপাচার পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। আর পাপাচার জাহান্নাম পর্যন্ত পৌছে দেয়।"

এরই কারণে মহানবী (সাঃ) মিথ্যাচারিতাকে ঈমানের বিপরীত ঘোষণা দিয়েছেন। মুআত্তা ইমাম মালেক নামক হাদীস গ্রন্থে এ সম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ হযরত রাসুলে কারীম (সাঃ)-এর নিকট আরজ করা হল যে, মুমিন কি কাপুরুষ (দুর্বল মনা) হতে পারে? তিনি (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ, মুমিন কাপুরুষ হতে পারে। আরজ করা হল যে, মুমিন কি কৃপন হতে পারে? তিনি (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ, মুমিন কৃপন হতে পারে। অতঃপর আরজ করা হল যে, মুমিন কি মিথ্যুক হতে পারে? নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করলেন, (প্রকৃত) মুমিন মিথ্যুক হতে পারে না।

সুতরাং শিশুদেরকে পূর্ণাঙ্গরূপে মুসলমান বানানোর জন্য আবশ্যক এই

যে, মিথ্যার ব্যাপারে তাদের উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা। কোন বাহানাতেই তাদের মিথ্যার অভ্যাসকে প্রশ্রয় না দেওয়া। যদি ভুল বশতঃ কোন অপরাধ করে বা মিথ্যা বলে, অতঃপর সত্য বলে, তাহলে স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে ক্ষমা করা যেতে পারে বা হালকা শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ইচ্ছাকৃত কোন অপরাধ বা মিথ্যা বললে প্রশ্রয় দেওয়ার বা ক্ষমা করার কোন যুক্তি নেই। প্রশ্রয় দিয়ে শিশুর উপর জুলুম করবেন না। মিথ্যার ব্যাপারে কঠোরতা করাই শিশুর উপকার।

শিশুদেরকে জনসেবা শিক্ষা দিন

মানবসেবা, জনসেবা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বরং এটা শরীয়তের অসংখ্য হুকুম-আহকাম, বিধি-বিধানের ভিত্তি ও মূল কাজ। আমাদের সমাজে সাধারণতঃ এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। সন্তানদেরকে শৈশবকাল থেকে উপেক্ষিত এ কাজটির প্রতি আগ্রহপ্রবন করা মাতা-পিতার কর্তব্য। যাতে করে তারা জনসেবামূলক কাজকে তুচ্ছ কাজ মনে না করে। এ কাজকে নিজের দৈনন্দিন জীবনের একটি অংশ হিসেবে গ্রহণ করে এবং অবসর সময়ে ঐ নেক কাজে খরচ করতে পারে। জনসেবা ও মানবসেবার ব্যাখ্যা তো ব্যাপক অর্থবোধক। কিন্তু একটি উপযোগী সীমা নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক, যা নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

★ শিশু নিজ মাতা-পিতার সেবা-শুশ্রুষাকে নিজের জন্য ছাওয়াব বৃদ্ধির মাধ্যম মনে করবে। অবসর বা সুযোগ পেলে তাদের খিদমত করবে। গৃহের কাজ-কর্ম এবং বাজার করা নিজের জন্য লজ্জাজনক মনে করবে না। বরং মাতা-পিতার আদেশ অনুযায়ী সব কাজ ছাওয়াব মনে করে আনন্দ চিত্তে খুশী খুশী করবে।

★ নিজ ভ্রাতা-ভগ্নীদের সাথে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলবে। পারস্পারিক মিল-মুহাব্বত ও সুসম্পর্কের মাধ্যমে জীবন যাপন করবে। তাদের সাথে লড়াই-ঝগড়া করবে না। প্রত্যেকেই একে অপরকে আরাম ও শান্তি পৌঁছাতে চেষ্টা করবে এবং যতদূর সম্ভব আত্মস্বার্থ ত্যাগ ও অপরকে প্রাধান্য দেওয়ার পরম আদর্শ প্রদর্শন করবে।

★ নিজের বংশীয় বড়দের যেমন– দাদা-দাদী, নানা-নানী, চাচা, ফুফু, খালা, মামুদের শ্রদ্ধা-ভক্তী ও সম্মান প্রদর্শন করবে এবং তাদের ছোট খাট কাজ-কর্ম নিজে করার চেষ্টা করবে।

★ দরসগাহে (ক্লাস রুমে) উস্তাদদের খেদমত করবে এবং তাদের ইজ্জত সম্মান করবে। সর্বোতভাবে উস্তাদদের বৈধ হুকুমসমূহ পালন করতে

সচেষ্ট হবে।

★ দরসগাহে নিজ সাথী ছাত্র বন্ধুদেরও খিদমত করবে, অর্থাৎ তাদের সাথে লড়াই, ঝগড়া করবে না। বরং সহনশীলতা প্রদর্শন করে আখেরাতের ছাওয়াব হাসিল করবে।

★ নিজ গৃহ, মাদ্রাসা এবং দরসগাহকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাকে মানহানী ও লজ্জাজনক মনে করবে না। বরং সৌভাগ্যের বিষয় মনে করে নিজ হস্তে আগ্রহের সাথে ঝাড় ইত্যাদি দ্বারা পরিচ্ছন্ন রাখবে।

★ ছোট-ছোট তুচ্ছ-তুচ্ছ কাজ-কর্মকে ছাওয়াব মনে করবে। যেমন, ছোট শিশুদের স্নেহ, অন্ধদের সাহায্য, চলাচলের পথ হতে কাঁটা, পাথর ইত্যাদি কষ্টদায়ক বস্তুসমূহ সরিয়ে ফেলা-এ জাতীয় কাজ সমূহকে ছাওয়াব ও আখেরাতের পূঁজী মনে করে করবে।

উল্লেখিত জনসেবামূলক কাজসমূহ যেমনি ভাবে ছাওয়াব অর্জন ও পরকালে সফলতা অর্জনের মাধ্যম, তেমনি ভাবে পার্থিব জগতে শিশু ও যুবকদের ধর্মীয় ও চারিত্রিক উন্নতি অর্জনে মূখ্য ভূমিকা রাখতে সহায়ক। অধিকন্তু , জনসেবামূলক কার্জক্রমে স্বক্রিয় হওয়ার কারণে ইসলামী সমাজে এ জাতীয় শিশুদের যশ, সুনাম ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে। কেননা, যার মধ্যে জনসেবার উৎসাহ, উদ্দীপনা থাকে, সে সকল স্থানেই সমাদৃত হয়। সকলেই তাকে স্নেহ করে, ভালবাসে।

সুতরাং, প্রতিটি আদর্শ মায়ের কর্তব্য এই যে, তিনি নিজ প্রাণপ্রিয় স্বামী, সন্তান, শাশুড়ী, ননদ এবং জেঠানীর এমন সেবা-যত্ন করবেন, যেন শিশুরা তার দেখাদেখি অন্যের সেবা-যত্ন করতে অভ্যস্ত হয়। স্বামী যখন উযু করে গোছল খানা থেকে বের হবে তখন বড় ছেলেকে বলবেন যে, আব্বুর জন্য তোয়ালে তৈরী রেখ, আব্বুর প্রয়োজন হবে। নামাযের জন্য যাচ্ছেন, তো টুপি ও জুতা প্রস্তুত রেখ। কামরা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ফযীলত ও উপকারিতা এত বেশী বলবেন যে, শিশু যেন নিজেও মায়ের সাথে পাত্র, কাপড়, কামরা, চেয়ার-টেবিল ইত্যাদি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে উৎসাহী হয়। ইনশাআল্লাহ! যদি এমন হয়, তাহালে গৃহে স্বর্গসুখের আগমন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

শিশুদেরকে কথা বলার আদব শিক্ষা দিন

এ কথা বাস্তব সত্য যে, মাতা-পিতা নিজ সন্তানদের সাথে যে সুরে, যে ভঙ্গিতে, যে মেজাজে, যে পদ্ধতিতে কথোপকথন করবেন, সন্তানও সেই ভঙ্গি সেই মেজাজই রপ্ত করে নিবে। অন্যদের সাথে কথা বলবে সেই পদ্ধতিতে, যে পদ্ধতি সে মাতা-পিতার থেকে দীক্ষা পেয়েছে। যদি আমরা

মনে মনে কামনা করি যে, আমরা সন্তানদের সাথে যেমন দুর্ব্যবহার করি না কেন, আমাদের সাথে সন্তানকে আদব ও শ্রদ্ধার সাথে কথা বলতেই হবে। তাহলে এটা নিছক ভুল কামনা বৈ নয়।

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ

"মহিলাগণ শিশুদের মা নয়। বরং শিশুরাই মহিলাদের মা। অর্থাৎ শিশু মাকে যা করতে দেখবে, সেই স্বভাব তার হৃদয় গভীরে দৃঢ়ভাবে রেখাপাত করবে। আপনার প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ ঐ শিশুর জন্য পথ প্রদর্শক।"

তাই, যখনই আমরা আমাদের শিশু সন্তানদের সাথে কথোপকথন করব, তখন তার সাথে সর্বদা 'আপনি' সম্মান সূচক শব্দ ব্যবহার করব। এমনি ভাবে সে যখন আপনার সাথে অথবা অন্য কারো সাথে কথোপকথন করবে, সম্বোধন করবে, এখন সেও "আপনি" শব্দটি-ই ব্যবহার করবে। অন্যথায় সে হয়ত "তুমি" বলবে, নয়ত "তুই" বলবে, যা নিশ্চিত ভাবে আপনার নিকটেও শ্রুতিমধুর লাগবে না। উপমাস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোন শিশু নিজ মা জননীকে সম্বোধন করে বলল 'মা! তুমি আমার জুতা পালিশ করনি কেন?"

অথবা এমন বলল, "হায় আম্মা! কখন থেকে বলছি, তুই এখনও ভাত দিলি না। আব্বু আসলে তোরে মার খাওয়াবো।" উক্ত বাক্যদ্বয়ের প্রতি আপনি গভীর ভাবে চিন্তা করুন। উপলব্ধি করতে পারবেন যে, বাক্যদ্বয়ে সম্বোধন করার ঢং কত বে-আদবী ও জঘন্যতায় পরিপূর্ণ এবং শ্রবণকারীর নিকট কত বিদঘুটে ও শালীনতা বর্জিত পরিগণিত হবে। পক্ষান্তরে শিশু যদি বলে, "আম্মু! আপনি আমার মাথার টুপিটি কি ধুয়েছেন?

অথবা এমন বলে, "আম্মু! জলদি আসুন, আব্বুর ফোন এসেছে"। নিঃসন্দেহে এমন বাকপদ্ধতি ও সম্বোধনের ঢং আপনার নিকট এবং প্রত্যেক শ্রবণকারীর নিকট অত্যন্ত শ্রুতিমধুর, আকর্ষণীয় ও মায়ামাখা অনুমিত হবে। শ্রবণকারী মনে মনে বলবে, "এ শিশুটির মাতা-পিতা তাকে কত আদব ও ভদ্রতা শিক্ষা দিয়েছে। শিশুটিও কত নম্র-ভদ্র।"

সুতরাং আমাদের আবেদন এই যে, নিজ সন্তানদের আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার জন্য এবং তাদেরকে শালীনতা বোধ, বচনবোধের দীক্ষা দিয়ে সুমিষ্টভাষী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার নিমিত্ত সর্বদা তাদের সাথে আদব ও ভদ্রতাসহ কথা বলুন। আর তাদের সম্মুখে যখনই অন্য কারো সাথে আলাপ-আলোচনা, কথা-বার্তা বলবেন, (চাই যার সাথেই হোক, যেমন, অধীনস্থ দাস-দাসী, কর্মচারী, কাজের বুয়া, মাসী, চাকরানী, ভিক্ষুক,

প্রতিবেশী ইত্যাদি) তখন "তুই" বা "তুমি" শব্দ ব্যবহার করবেন না, বরং "আপনি" শব্দ ব্যবহার করুন।

এমনিভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ এই যে, নিজ সন্তানদেরকে বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি, আদব-তমীয, ইজ্জত-সম্মান প্রদর্শন শিক্ষা দিন। কেননা, যে শিশু বড়দের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শন করে তাকে বড়রা স্নেহ করে এবং আন্তরিক দু'আ দ্বারা তাকে সিক্ত করে, জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেকের কথা দীক্ষা দিন। বে-আদব শিশুরা এমন বরকত থেকে বঞ্চিত থাকে।

শিশুদের প্রতিপালনে মূল্যবান দিক নির্দেশনা

মুসলমানের সন্তান হিসেবে প্রতিটি আদর্শ মায়ের করণীয় এই যে, নিজ আদরের দুলাল-দুলালীদের প্রাথমিক শিক্ষা আল্লাহর নামে শুরু করুন। প্রাণ প্রিয় শিশুদের কচি কচি মুখে যেন সর্ব প্রথম আল্লাহ এবং তাঁর প্রিয় রাসূলের (সাঃ) নাম ফোটে, সে ব্যবস্থা করুন। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার একাত্ববাদ শিক্ষা দিন। আর অন্তরে আল্লাহর অপরিসীম ক্ষমতা ও কুদরতের ইয়াক্বীন ও বিশ্বাস প্রথিত করুন। কোন কিছু চাইতে হলে আল্লাহর কাছে চাইতে হয়, সে শিক্ষা দিন। তাকে কোন জিনিস প্রদান করলে বা খাদ্য-দ্রব্য আহার করতে দিলে, বলুন যে, মহা মহিমাময় আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন। সর্ব সময়, সর্ব ব্যাপারে তাদের অন্তরে ঈমানী শক্তি সৃষ্টি করুন। তাদেরকে এমন ঈমানদীপ্ত ভাষা বা কথা শিক্ষা দিন, যদ্দারা তারা আল্লাহ এবং তার প্রিয় হাবীব (সাঃ)কে সহজেই চিনতে পারে। যখন তারা বিবেকবান, বুদ্ধিমান হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে পবিত্র কুরআনের ছোট ছোট সুরা যেমন সুরায়ে এখলাছ, সূরায়ে কাউছার অর্থসহ শিক্ষা দিন। বড় বড় সুরাহসমূহ আগে যেয়ে নিজেরাই শিখে নিবে। অসৎ সংশ্রব ও দুষ্টদের পরিবেশ থেকে তাদেরকে দূরে রাখুন। তাদের প্রত্যেক জেদ পূর্ণ করবেন না। তাদের সাথে এমন ফ্রী আচরণ করবেন না, যাতে তারা ভয়হীন হয়ে পড়ে। আপনার একটি ইঙ্গিত যেন তার সংশোধনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। কথায় কথায় প্রহার করবেন না। মারপিট এবং একই কথা বারংবার বললে শিশুরা বে-হায়া ও লজ্জাহীন হয়ে পড়ে। তাদের সাথে অনর্থক ও নিষ্প্রয়োজনের কথাবার্তা বলবেন না। ভুল-ক্রটি করে বসলে খুব নম্রতার সাথে বুঝিয়ে দিন। ক্রোধের আতিশায্যে এমন আপত্তিকর কথা বা আচরণ করবেন না, যাতে পরে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে হয়।

সন্তানের অপবাদ, অভিযোগ ও দোষ-ক্রটি অপরের সম্মুখে বর্ণনা করবেন না। কথায় কথায় তার আবদার ও অভিলাষ পূর্ণ করবেন না। তার বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ করলে প্রথমে যাচাই-বাছাই করুন। অতঃপর তার ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। কারো পতিত জিনিষ উঠিয়ে আনলে তৎক্ষণাত সে বস্তু সে স্থানে রেখে আসতে বাধ্য করুন। অতঃপর এ কারণে হালকা শাসন করুন। বে-আদব, অসভ্য ও বেপরোয়া বানাবেন না। বড়দের আদব ও সম্মান শিক্ষা দিন। সবার সাথে কথা-বার্তার শালীনতা, পদ্ধতি, নিয়ম ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিন। মিথ্যা, চোগলখুরী, গীবত, চুরি ইত্যাদি বদঅভ্যাস হতে বিরত রাখুন। বাহিরের কথা ঘরে এবং ঘরের কথা বাহিরে বলার অভ্যস্ত হলে তা কঠোর হস্তে দমন করুন। শাস্তি দেওয়ার প্রাক্কালে শাস্তির ধরণ ও পরিমানের প্রতি খেয়াল রাখুন। শাস্তি দেওয়ার সীমা লংঘন করবেন না। শাস্তি দিয়ে, হাসি-কৌতুক করবেন না। বরং গম্ভীর থাকুন। মাত্রাতিরিক্ত অন্তরঙ্গতার সাথে কথা বলবেন না। কথায় কথায় মুহাব্বত ও সোহাগ প্রকাশ করবেন না। তাদের সাথে সীমাতিরিক্ত আদর করবেন না। অন্যায় ও অনুচিত পক্ষপাতিত্ব করবেন না। সকল সন্তানের সাথে সমান আচরণ করুন। সকলকে সমান অধিকার দিন। শিশুদের হাতে টাকা-পয়সা তুলে দিবেন না। তাদের মনের প্রত্যেক চাহিদা পূর্ণ করবেন না। এটা বড় ভুল। কন্যাদের পর্দার ব্যাপারে সজাগ থাকুন। বালেগা হওয়ার পূর্ব থেকেই সমবয়স্ক ছেলেদের সাথে চলা-ফেরা, কথা-বার্তা সংলাপ হ'তে বিরত রাখুন। এমনকি একাকী বসে আলাপ আলোচনা করার সুযোগ পর্যন্ত দিবেন না। হাসা-হাসি, রঙ্গ-তামাশা ও উচ্চ স্বরে ক্বথা বলতে নিষেধ করুন। বিনা প্রয়োজনে এ-বাড়ী সে-বাড়ী বেড়াতে পাঠাবেন না। নিজে সাথে করে প্রতিদিন এ দিক সে দিক নিয়ে যাবেন না। কেননা, এতে তাদের অন্তরে খামাখা, নিষ্প্রয়োজনে ঘোরাফেরা করার সখ সৃষ্টি হবে। তাছাড়া আজ সে হয়ত আপনার সাথে গেল, কাল কিন্তু অন্যের হাত ধরে মার্কেটিং করতে যাবে। প্রত্যেক কাজে তার পরিণতীর কথা ভাবুন। প্রত্যেক মন্দ কাজে বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করুন। প্রয়োজনাতিরিক্ত স্বাধীনতা দিবেন না। পরিধেয় বস্ত্র এবং অলংকার নিজ ইচ্ছানুযায়ী পরিধান করান। নামায পড়তে এবং কুরআন তিলাওয়াতে অভ্যস্ত করুন। ইসলামী বইপত্র পড়তে দিন। কন্যাদের আদব-লেহায ও শালীনতা শিক্ষা দিন। অতিরিক্ত বাক্যালাপ অজ্ঞতা ও বাচালিপনার পরিচায়ক। সল্পভাষীনী ও শরমিলী মেয়েদের সকলেই ভাল বলে। শরমিলীপনাই ভদ্রতার নিদর্শন। কন্যা সন্তানকে অলস এবং কুড়ে বানাবেন না। তাদেরকে কাজ কর্মে লিপ্ত

রাখুন। সেলাই প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করুন। নিজের বস্ত্র নিজেকেই সেলাই করতে দিন। মজার খাদ্য তৈরীর প্রাক্কালে তার সহযোগিতা নিন। রান্না-বান্না, ঘর সাজানো, ঘর গোছানোসহ গৃহের ছোট-খাট কাজ করতে অভ্যস্ত করুন। যে দায়িত্ব আজ আপনার উপর ন্যাস্ত রয়েছে, হুবহু ঐ দায়িত্ব কাল তার উপর পতিত হবে। সুতরাং ঐ দায়িত্ব সমূহের উপলব্ধি তার মাঝে জাগ্রত করতে থাকুন। দায়িত্ববতী, গুণবতী, জ্ঞানবতী ও রুচিশীল মায়েদের জন্য উল্লেখিত কথাসমূহ মনে-প্রাণে গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। বরং হীরার চেয়েও দামী। আজ আদরের দুলালীদের দ্বারা মেহনতের কাজ করানো আপনার সহ্য হয় না। কিন্তু কাল পরের ঘরে যখন পাহাড়সম মেহনতের বোঝা বহন করবে, তখন সে দৃশ্য দেখে কিভাবে সহ্য করবেন? তাই সময় থাকতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিন। কন্যা সন্তানদের দক্ষ কর্মীরূপে প্রতিষ্ঠিত করুন।

শিশুদের জন্য সোনালী নিয়ম

বুদ্ধিমতি, জ্ঞানবতী মায়েরা যেমনিভাবে সকাল সকাল জাগ্রত হন, তেমনিভাবে নিজ সন্তানদের নামাযের জন্য জাগ্রত করেন। অতঃপর নিজেরা নামাযের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং যে সন্তানেরা নামাযের উপযুক্ত তাদেরকেও নামায পড়ান। আর যারা নামাযের উপযুক্ত নয়, তাদেরকে তাছবীহ শিক্ষা দেন। অতঃপর সকল সন্তানকে কালেমা পাঠ করানোর পর নিম্নের কথাগুলো মুখস্থ করান ঃ

(১) আমরা স্বীয় মাতা-পিতা, উস্তাদ ও বুযুর্গদের ইজ্জত করব এবং তাঁদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করব।

(২) আমরা আমাদের ছোট ভাই-বোনদের সাথে মিলে-মিশে থাকব এবং তাদের প্রতি দয়া করব। আর তাদের সাথে আন্তরিকতার সাথে বসবাস করব।

(৩) আমরা নিজ ভাই-বোনদের সাথে কখনও লড়াই-ঝগড়া করব না।

(৪) আমরা নিজ আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতদের সাথে মুহাব্বত, ভালবাসা, ইজ্জত ও সম্মানের সাথে আলাপ-আলোচনা করব। সংশ্লিষ্টদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখব।

(৫) আমরা নিজ মুখ দ্বারা কখনও কোন অশ্লীল কথা বা শব্দ উচ্চারণ করব না এবং অযথা কোন কথা বলব না।

(৬) আমরা সকল মুসলমানকে নিজের ভাই মনে করব এবং সেভাবেই তাদের সাথে আচরণ করব।

(৭) আমরা অন্ধ, লেংড়া, লুলা, খোঁড়া, পঙ্গু, অসহায়, দরিদ্র, নিঃস্ব, অনাথ ও বাস্তুহারাদের সাহায্য-সহযোগিতা করব। 'দুস্থ মানবতার সেবায় আত্মোৎসর্গিত করব।

(৮) আমরা কখনও অহংকার প্রদর্শন করব না এবং কারো নিকট দৃষ্টি কুটু মনে হয় এমন আচরণ করব না।

(৯) আমরা সর্বদা সত্য কথা বলব। কখনও মিথ্যা কথা বলব না। কাউকে ওয়াদা দিয়ে তা ভঙ্গ করব না। কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করব।

(১০) আমরা কারো অগোচরে, অনুপস্থিতে নিন্দা করব না, গীবত, শেকায়েত ও চোগলখুরী করব না। অন্যায়ভাবে কাউকে কষ্ট দিব না। অকথ্য ভাষা ব্যবহার করব না। কথা দ্বারা, কর্ম দ্বারা, কাউকে জ্বালাতন করব না।

(১১) আমরা কখনও চুরি করব না। ছিনতাই, রাহাজানী, ডাকাতি শিখব না। সকল অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকব।

(১২) অনুমতি ছাড়া কারো কোন জিনিষ ধরব না, ছুব না, খাব না। প্রত্যেক অসৎ ও মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকব।

(১৩) আমরা সিগারেট, বিড়ি, গুল, তামাক ও নেছওয়ার খাওয়ার অভ্যাস করব না। হিরোইন, ফেনসিডিল, চার্স, ভাঙ্গ, গাঁজা ও তাড়ী কখনও স্পর্শ করব না।

(১৪) সদা-সর্বদা আল্লাহ এবং তাঁর প্রিয় হাবীব (সাঃ)-এর হুকুম-আহকাম মেনে চলব। সামাজিক বা বিধর্মীদের কোন প্রথা মানব না।

(১৫) আমরা নিজেরা নেক কাজ করব, অপরকেও দাওয়াত দিব। নিজেরা অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকব, অপরকেও বিরত রাখব।

অতঃপর রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার প্রাক্কালে মা সন্তানদের জিজ্ঞাসা করবেন যে, শিশুরা সকলেই উল্লেখিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দিনাতিপাত করেছে কি-না? যারা করেছে, তাঁদেরকে দু'আ দিয়ে উৎসাহিত করতে হবে। যারা করেনি, তাদেরকে আদর করে বুঝিয়ে দিতে হবে। এটাই মায়ের গুণাগুণ।

শিশুর চরিত্র গঠনে মায়ের প্রভাব

বাস্তব সত্য এই যে, শিশুর চরিত্রে, শিশুর হৃদয়ে সবচে' বেশী যার আছর ও প্রভাব অঙ্কিত হয়, তিনি হলেন মা। সুতরাং, আদর্শ ও গুণবতী মায়ের কর্তব্য এই যে, তিনি নিজের মধ্যে উত্তম চরিত্র সৃষ্টি করতে সচেষ্ট

হবেন। নিজ সন্তানদের কোন কাজ বা কথাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবেন না। বরং তার ঘরে-বাহিরের কার্যক্রম ও গতিবিধির প্রতি কড়া ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন এবং তার আচার-আচরণ ও চাল-চলনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। কারণ, শিশুর এটা মজ্জাগত ও সহজাত স্বভাব যে, যখন সে লক্ষ্য করবে যে, তার মুরব্বী, গার্জিয়ান বা দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে না বা তার খোঁজ-খবর রাখে না। তখন শিশু অপরাধ জগতে প্রবেশ করতে এবং উশৃংখলার প্রতি ঝুঁকে পড়তে কুণ্ঠবোধ করবে না। সবচে' দুঃখজনক কথা এই যে, মাতা-পিতা অথবা উভয়ের যে কোন একজনকে যখন শিশু দেখবে চৌর্যবৃত্তিতে উৎসাহিত করতে অথবা এতে সাহায্য-সহযোগিতা করতে কিংবা অংশগ্রহণ করতে, তখন নিঃসন্দেহে শিশুর মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে এবং চুরি, ছিনতাই, হাইজাক ইত্যাদি জঘন্যতম কাজে দক্ষ ও হাতপাকা হয়ে যাবে। এমনকি মাতা-পিতাকে অনুসরণ করতে করতে সেও একদিন এরশাদ শিকদার ও লাল্টুদের মত অপরাধ জগতের মুকুট বিহীন সম্রাটরূপে আত্মপ্রকাশ করবে।

একবার এক ইসলামী আদালত এক চোরের উপর চৌর্যবৃত্তির শাস্তি (হাতকাটা) প্রয়োগ করার আদেশ প্রদান করে। অতঃপর যখন শাস্তি প্রদানের সময় একেবারে ঘনিয়ে এল, তখন ঐ চোর উপস্থিত শ্রোতা ও দর্শকদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলতে লাগল, "আমার হাত কাটার পূর্বে আমার মায়ের জিহ্বা কাটুন। কারণ, আমি আমার জীবনে প্রথম বার আমাদের প্রতিবেশীর ঘর থেকে একটি ডিম চুরি করেছিলাম। তখন আমার মা আমাকে শাসনও করেনি এবং প্রতিবেশীর নিকট ডিম ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমাকে আদেশও দেয়নি। বরং আনন্দ প্রকাশ করে বলেছিল, "সাবাস! আমার ছেলেত এখন পুরুষ মানুষ হয়ে গেছে!" যদি তখন আমার মা সাবাসী না দিত, তাহলে হয়ত চুরি করার মত জঘন্যতম কাজে আমি লিপ্ত হতাম না।

উল্লেখিত ঘটনা দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, সন্তানদের উপর মায়ের খুব প্রভাব পড়ে। সুতরাং, মা যদি নেককার, পরহেযগার হন, তাহলে সন্তানও নেককার হতে বাধ্য। আর যদি মা বদস্বভাব ও কুচরিত্রের অধিকারীনী হন, তাহলে সে স্বভাবও সন্তানদের মধ্যে বিস্তার লাভ করবে, স্থানান্তরিত হবে। কারণ, যে তৃণ-লতা-ঘাস উৎপন্ন হয় পুষ্পকানন হতে, সেরূপ কি হয় ঐ তৃণ-লতা, যা উৎপন্ন হয় বন বাঁদাড়ে। যে শিশু দুগ্ধ করেছে পান দুর্বল মাতার বক্ষ থেকে, চরমোৎকর্ষ, পরাকাষ্ঠা ও যোগ্যতার কি-ই বা আকাঙ্খা করা যায় দুর্বল ঐ শিশু হতে। সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীনগণ যে গুণের অধিকারী ছিলেন, তা, তাঁরা তাঁদের জননীগণ হতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত

হয়েছেন। আমরা স্বল্প সংখ্যক সাহাবী সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

(১) হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রাঃ) বুযুর্গী ও পরহেযগারী অর্জনে স্বীয় স্নেহময়ী মা হযরত সুফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের নিকট ঋণী। যিনি উত্তম ও সুন্দর চরিত্রকে হযরত যুবায়ের (রাঃ)-এর স্বভাবে পরিণত করেছিলেন। তাই মায়ের মত পুত্রও বুযুর্গ হিসেবে পরিচিত হন।

(২) হযরত আব্দুল্লাহ, হযরত মুনযের এবং হযরত উরওয়াহ (রাঃ) সকলেই ইসলামী ইতিহাসের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) -এর ভাগ্যবতী কন্যা হযরত আসমা (রাঃ)-এর রোপন করা বৃক্ষের সুমিষ্ট ফল। যারা প্রত্যেকেই যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী এবং ইসলামী জ্ঞানগভীরতায় দুর্লভ মনিমুক্তা ছিলেন।

(৩) ইসলামী ইতিহাসের চতুর্থ খালীফা, মহান সিপাহসালার, মহাবীর, ন্যায় বিচারক, জ্ঞানের সাগর হযরত আলী (রাঃ) প্রজ্ঞা, জ্ঞানগভীরতা এবং উত্তম চরিত্র স্বীয় মা জননী হযরত ফাতিমা বিনতে আসাদ (রাঃ) হতে শিক্ষা পেয়েছেন।

(৪) বিশিষ্ট সাহাবী রণবীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ) যিনি আরব বিশ্বের দানশীলদের সরদার এবং যুবকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নেক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, তাঁর মত মহান ব্যক্তিত্বের প্রতিপালন করেছিলেন স্নেহময়ী, মায়াময়ী মা হযরত আছমা বিনতে উমাইস (রাঃ)। হযরত আছমা বিনতে উমাইস (রাঃ) -এর উত্তম চরিত্র, মাধুর্যপূর্ণ ব্যবহার, যোগ্যতার চরম পরাকাষ্ঠাই তাঁকে ইতিহাসের পাতায় মহানবী (সাঃ)-এর আদর্শের সৈনিক রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

সুতরাং, আদর্শ মা হিসেবে যদি আপনি আন্তরিক ভাবে কামনা ও দু'আ করেন যে, আপনার কোলে পালিত শিশুটি যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত নূরুদ্দীন জঙ্গী (রহঃ), পীরানে পীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রহঃ), আল্লাহ তা'আলার মকবুল ত্বরীক্বা, সমগ্র বিশ্বে প্রচলিত, পছন্দনীয় মাধ্যম তবলীগ জামাতের প্রবর্তক হযরত আল্লামা ইলিয়াছ (রহঃ), বিশিষ্ট বুযুর্গ ও তফসীর বিশারদ হযরতুল আল্লামা ইলিয়াছ কান্ধলভী (রহঃ) এবং মুজাদ্দিদে মিল্লাত হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রাঃ)-এর গুণে গুণান্বিত হোক, তাহলে সর্ব প্রথম নিজেকে অতঃপর স্বীয় স্বামীকে উত্তম ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হিসেবে তৈরী করতে হবে।

সন্তানের সাথে মাতা-পিতার আচরণ

শিশু বিশেষজ্ঞ এবং শিশু উন্নয়ন ও প্রতিপালন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গদের এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছে যে, মাতা-পিতা এবং শিশুদের প্রতিপালনকারীগণ যদি শিশুদের সাথে সব সময় কর্কশ মেজাজ, রুক্ষ ব্যবহার, কঠোর আচরণ করতে থাকেন এবং মারপিট, শাসন-কুর্দন দ্বারা আদব-লেহাজ, ভদ্রতা, শিষ্টাচার দীক্ষা দিতে থাকেন, অধিকন্তু সর্বদা তাকে অপমান ও অপদস্ততার লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়, তাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও হাসি-তামাশার পাত্র বানানো হয়, তাকে অবজ্ঞা করা হয়, তাকে হেয় প্রতিপন্ন, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ল করা হয়, তা হলে এর কুপ্রতিক্রিয়া ও কুপ্রভাব তার স্বভাব চরিত্রে প্রতিফলিত ও বিকশিত হবে নিশ্চয়। তার কাজ-কর্মে , কথা-বার্তায় ভয়-ভীতি ও ত্রাসের ঝলক প্রকাশিত হবে। এতে পরিস্থিতির বিপর্যয় ঘটে আত্মহত্যা অথবা মাতা-পিতার সঙ্গে লড়াই-ঝগড়া এমনকি জুলুম-নির্যাতনে অতীষ্ঠ হয়ে সে বাড়ী থেকে পলায়ন করে চিরদিনের জন্য নিরুদ্দেশও হয়ে যেতে পারে।

শ্বাশত ইসলাম সর্বকালে, সর্বযুগে পালনীয়, বরণীয়, গ্রহণীয়, যুগান্তকারী শিক্ষার মাধ্যমে মাতা-পিতা, শিশু বিশেষজ্ঞ, শিশু প্রতিপালনকারী, দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ, নেতা-নেত্রী, সমাজসেবক, মনোবিজ্ঞানী এবং সমাজ সংস্কারের কর্মকর্তাগণকে এই আদেশ দেয় যে, তারা যেন শিশুদের সঙ্গে উন্নত চরিত্র, নম্র স্বভাব, ভদ্র ব্যবহার, স্নেহ-মায়া-মমতা, আদর-সোহাগ প্রদর্শন করে। যাতে করে সন্তানদের শারীরিক প্রবৃদ্ধি সুষ্ঠভাবে হতে পারে এবং তাদের মধ্যে সাহসিকতা, বীরত্ব, স্বনির্ভরতার উপলব্ধি সৃষ্টি হতে পারে।

নিঃসন্দেহে ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা সঠিক ও রুচিশীল পদ্ধতিতে সন্তানদের লালন-পালন করার শিক্ষা দেয়। সুতরাং, আমাদের সন্তানদের লালন-পালনও ঐ সোনালী পদ্ধতিতেই করা বাঞ্ছনীয়। সন্তান প্রতিপালনে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল মাতা-পিতার। যদি মাতা-পিতা আন্তরিকভাবে কামনা করেন ও দু'আ করেন, তাহলে তাদের সন্তানও বড় হয়ে মুহাম্মদ ইবনে কাসেম এবং ত্বারিক্ব ইবনে যিয়াদের (রাঃ) মত ধর্মীয় এবং পার্থিব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও কৃতিত্ব দেখাতে পারবে। এটা তো বাস্তব সত্য যে, সন্তানদের প্রাথমিক বিদ্যালয় হল মায়ের কোল। এ জন্য মায়ের উপর অনেক দায়িত্ব। কিন্তু কখনও এমন হয় যে, শিশুদের অনর্থক জিদ্দিপনার কারণে অথবা কথা না মানার কারণে কিংবা সারাক্ষণ বিরক্ত

করার কারণে প্রচন্ড ক্রোধের উদ্রেক হয়। তখন মায়ের মুখ দ্বারা এমন ভুল, ক্ষতিকারক ও ধ্বংসাত্মক বাক্য নিসৃত হয়, যা শিশুর ভবিষ্যত জীবনের উপর কুপ্রভাব সৃষ্টি করে। যেমন ঃ

- "তুই জন্ম নেয়ার সময় মরে গেলেই ভাল হত।"
- "কতই না ভাল হত, যদি তুই আমার সন্তান না হতি।"
- "তোর ছেলে-মেয়েরাও যেন তোরে এমন জ্বালায়।"
- "তোরে কলেরায় ধরে না কেন?"
- আজরাঈল তোরে নেয় না কেন? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এ বদ-দু'আ সম্বলিত বাক্যগুলো ছাড়াও মায়ের ভুল সিদ্ধান্ত হল, ক্রোধ, মাত্রাতিরিক্ত শাস্তি দেওয়া। যেমন জামা-কাপড় খুলে বিবস্ত্র অবস্থায় ও ঘরের বাইরে দাঁড় করিয়ে দেওয়া, সারাদিন কিছু খেতে না দেওয়া, বুভুক্ষু অবস্থায় বাথরুমে বেঁধে রাখা, ষ্টোররুমে বন্দী করে রাখা ইত্যাদি। তাছাড়া প্রহার করে করে আধমরা করে ফেলা, চেহারা মুখাবয়বে অথবা শরীরের কোন স্থানে স্বজোরে এমন থাপ্পর মারা– যদ্দ্বারা দাগ প্রকাশ পেয়ে যায়, পাতলা ছুড়ি, চাকু বা কোন স্কেল দ্বারা এমনভাবে প্রহার করা, যার কারণে রক্ত জমে যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। মানবতা বিরোধী এহেন কার্যকলাপ হতে অবশ্যই মাকে বিরত থাকতে হবে। যদি শিশুর জিদ্দিপনা বা এক গুয়েমির কারণে মাথায় মাত্রাতিরিক্ত ক্রোধ চেপে বসে, তাহলে নীরবতা পালন করুন। কেননা, নীরবতা ও চুপ থাকা ক্রোধাগ্নি প্রশমণের জন্য উত্তম চিকিৎসা। বিশ্ব মানবতার মহান চিকিৎসক, মহান মনোবিজ্ঞানী প্রিয় নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করেন,

اذا غضب احدكم فليسكت – مسند احمد

অর্থ ঃ যখন তোমাদের কেউ রাগান্বিত হয়, সে যেন চুপ থাকে।

(মুসনাদে আহমদ)

বুখারী শরীফের কিতাবুল আদব অধ্যায়ে মহানবী (সাঃ)-এর ইরশাদ বর্ণিত হয়েছে, তিনি ইরশাদ করেন–

انّ اللّٰه يحبّ الرفق فى الامر كله

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা সর্ব ব্যাপারে নম্রতা পছন্দ করেন।

ইমাম আহমদ এবং ইমাম বাইহাক্বী প্রিয় নবীজী (সাঃ)-এর বাণী বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন গৃহবাসীর মঙ্গল কামনা করেন, তখন তাদের মধ্যে নম্রতা সৃষ্টি করে দেন। যদি নম্রতা ও

বিনয়ভাব কোন মাখলুকের (সৃষ্টি বস্তুর) আকৃতিতে হত, তাহলে এমন সুশ্রী ও খুবসুরত হত যে, কোন মানুষ এমন খুবসুরত মাখলুক কখনও দেখেনি। আর কঠোরতা যদি কোন মাখলুক (সৃষ্ট বস্তু)-এর আকৃতিতে হত, তাহলে এমন কুশ্রী হত যে, কেউ এর চেয়ে কুশ্রী-বিশ্রী মাখলুক কখনও দেখেনি।"

শরীয়তের ফরমান অনুযায়ী শিশুদের সাথে সর্বদা কোমল ও নম্রভাব ব্যবহার করুন। এতে নিয়্যত একমাত্র মহা দয়াময় আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের হতে হবে। অন্য কোন নিয়্যত করবেন না। আর যখন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন, তখন নিশ্চিতভাবে শিশুর সঠিক প্রতিপালনের সুব্যবস্থা হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা শিশুর অন্তরে মাতার প্রকৃত মুহাব্বত ঢেলে দেন। আর সন্তানের অন্তরে মায়ের কথা মান্য করার আগ্রহ সৃষ্টি করে দেন।

শিশুদের অন্তরে যেহেতু প্রত্যেক কথা খুব দ্রুত আছর করে, তাই শিশুদের সম্মুখে কখনও কারো সাথে অশালীন আচরণ বা কথাবার্তা বলবেন না। লড়াই-ঝগড়া করবেন না, মিথ্যা বলবেন না। দুর্ভাগ্য বশতঃ অধিকাংশ সময় এমন হয় যে, কোন শিশুর মা নিজ সন্তানের সম্মুখে প্রতিবেশী মহিলার সাথে ঝগড়া করার সময় অশ্লীল ও অসভ্য ভাষায় কথা বলতে থাকে, অথবা নিজ সন্তানের সম্মুখে শাশুড়ী বা ননদ কিংবা দেবরদের সাথে সর্বদা ঝগড়া করতে থাকে। এটা বড়ই বদঅভ্যাস। এটা ত্যাগ করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, এতে কচি শিশুর কচি মনে দ্রুত কুপ্রভাব অঙ্কিত হয়।

শিশুদের ধমক দিবেন না

অনুগ্রহপূর্বক একজন মুসলিম নারী ও আদর্শ মা হিসেবে মহানবী (সাঃ)-এর কচি কচি বে-গুনাহ মাসুম উম্মতদের সামান্য সামান্য ভুলের কারণে ধমকাবেন না। বিশেষ করে এমন ধকমী, যদ্দ্বারা শিশু নিজ মাকে অত্যাচারিণী , স্বৈরাচারিণী ভাবতে থাকে। যেমন ঃ

★ "এখন যদি আবার করিস, তাহলে তোর বাপকে বলবোই।"
★ "আবার বললে কিন্তু ঘর থেকে বের করে দেব।"
★ "আবার জেদ করলে হনুমানকে দিয়ে দেব।"
★ "আবার কাঁদলে "ভাও"কে ডাকবো।"
★ অথবা "ভুতের কাছে নিয়ে যাবো" বলা।

তাওবা, তাওবা ------কখনও এমন করবেন না। আল্লাহ্ না করুক, যদি আপনার মধ্যে এ রোগটি বিদ্যমান থাকে, তাহলে দু'রাক'আত নফল নামায আদায় করে তাওবা করুন এবং আল্লাহর নিকট এই দু'আ করুন যে, হে আল্লাহ! আমাকে এ বদঅভ্যাস থেকে নাজাত দিন। স্মরণ রাখবেন, এভাবে ধমকী দিলে শিশুর সংশোধন তো কখনও হবে না, বরং তার তিনটি বড় ধরনের ক্ষতি অবশ্যই হবে– যা ঐ শিশুর বর্তমান এবং ভবিষ্যত জীবনে কুপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। যেমন ঃ

(১) আপনি যদি শিশুকে তার পিতার ভয় বা ধমকী দেখান, তাহলে আপনি শিশুর অন্তরে আপনার মর্যাদা তো একেবারে খতম করে দিলেনই। অধিকন্তু, তার অন্তরে স্বীয় পিতার সম্পর্কে অত্যাচারী ও বে-রহম হওয়ার কল্পনা স্থান গেঁড়ে বসবে।

আল্লাহ্ আপনার স্বামীকে দীর্ঘজীবন দান করুন। যদি আপনার স্বামী আল্লাহর নিকট চলে যায় অথবা সফরে-ভ্রমনে বের হয়, তাহলে আপনার শিশু আপনার কবজা থেকে দূরে সরে যাবে। কেননা, আগের থেকেই তো আপনার প্রতি কোন প্রকার ভক্তি, শ্রদ্ধা তার অন্তরে নেই বললেই চলে। সুতরাং বাপের ভয় আর ধমকী দিয়ে নিজের মূল্য ও সম্মানটুকু হারাবেন না। শিশুকে যে বদঅভ্যাস থেকে সাবধান করতে চান, বাপের ভয় না দেখিয়ে সে বদঅভ্যাসের ক্ষতিকারক দিকগুলো তুলে ধরুন এবং শিশুর মাথায় হাত রেখে তাকে ক্ষতিকারক দিকগুলো বুঝাতে চেষ্টা করুন। সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে দু'আ করুন, যেন আল্লাহ্ তা'আলা শিশুর অন্তরে বদঅভ্যাসের অনিষ্টতার জ্ঞান বসিয়ে দেন এবং তা বুঝার তাউফীক দেন।

(২) "ঘর থেকে বের করে দেব" এই কথার ধমকী শিশুর নিষ্পাপ হৃদয়কে মারাত্মক ভাবে ব্যথিত এবং মানসিকতাকে প্রচন্ডভাবে ভারাক্রান্ত করে তোলে। তার চিন্তাশক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে বিষাক্ত হয়ে যায় জীবন যাপন। শিশু বিশেষজ্ঞ দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, মায়ের এহেন ব্যবহারে অধিকাংশ শিশু মাতা-পিতার প্রতি অনাস্থার শিকার হয় এবং মনে মনে এই চিন্তা করে থাকে, "আমি এখন কোথায় যাব? কে আমাকে নিজ ঘরে আশ্রয় দেবে? এখন আমি কোথায় খাব? ঘুমাব কোথায়? এ ভাবে নানাবিধ অশুভ আতঙ্কে ভীত হয়ে দুর্ভাবনায় ভাবতে থাকে যে, অমুক চাচা-চাচী, মামা-মামী অথবা খালা-খালু যদি আমাকে আশ্রয় দিত, যদি আমাকে চাকর হিসেবেও রাখত, কতই না ভাল হত। -- এভাবে তার অন্তরে নিজ বাড়ী ও মা সম্পর্কে ঘৃণা ও বিতৃষ্ণাভাব জন্ম নেয়। আর সে স্নেহময়ী মাকে

মানুষরূপী ডাইনী ভাবতে থাকে। এ ছাড়া সে বড় হয়ে নিজ ছাত্র, শাগরেদ, সন্তান, চাকর-বাকর, বুয়া-মাসী এবং অধীনস্থ কর্মচারীর সাথেও এমনই অসদাচরণ করতে থাকবে।

(৩) এমনিভাবে "কাল কুকুর", "ভাউ", "ভুত", এবং "বড় ডাইনী", "বাঘ", "ভাল্লুক" ও "ঝীম কাল অন্ধকারে" নিয়ে যাওয়ার ধমকী দেওয়ার দ্বারা আপনি আপনার অজান্তে নিষ্পাপ শিশুর প্রতি কিন্তু বড় জুলুম করে ফেললেন। কেননা, এতে ঐ জিনিষ সমূহের ভয় শিশুর অন্তরে আঁকড়ে বসবে। ফলশ্রুতিতে শিশু মারাত্মক ভীতু, ডরপোক ও কাপুরুষ হয়ে যাবে। বড় হয়েও তার বিভিন্ন প্রকার কুমন্ত্রণা, প্রবঞ্চনা ও কুধারণার শিকার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ জাতীয় শিশুরা বদ খেয়ালের চক্করে পড়ে "উল্টা চিল", "মস্তক বিহীন ঘোড়া", "কাল বিড়াল" "দাতওয়ালী ডাইনী বুড়ী", "আগুনের পেতনী", "কাল কাক'কে কল্পনা করে ভয়ে কাঁপতে থাকে। এমন ধমকী দেনেওয়ালী নির্বোধ মায়েদের কারণে মুসলিম জাতি একজন বাহাদূর, ভয়হীন, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, আপোষহীন নেতা, জাতির কর্ণধার এবং দুঃসাহসিক সেনাপতি হতে বঞ্চিত হয়ে যেতে পারে।

আমরা সকলেই জানি, ইসলামের স্বর্ণযুগ এমন ছিল, যখন অমুসলিমরা মুসলমানদের ছায়াকেও ভয় পেত। আর বর্তমানে দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলমানরা (সকলে নয়) আল্লাহ ছাড়া সকলকেই ভয় পায়। এর দায়-দায়িত্ব ঐ সমস্ত মায়েদের উপরই বর্তায়, যারা শৈশব থেকেই শিশুদেরকে আল্লাহর নাফমানীর কারণে আগত আযাবের ভয় তো দেখায় না, বরং গাইরুল্লাহ (মাখলুখ)-এর ভয় দেখায়।

সুতরাং, আদর্শ মায়ের প্রতি আমাদের প্রতি আমাদের আবেদন—এই যে, যদি আপনি নিজ সন্তান হতে কোন দোষ বা বদঅভ্যাস দূরীভূত করতে চান, তাহলে সন্তানকে তার বয়স অনুযায়ী আদর-সোহাগ করে এমন করে বুঝিয়ে দিন যে, বদঅভ্যাসের প্রতি ঘৃণা তার অন্তরে এমন ভাবে বসে যায়, যেন তা আপনার সম্মুখে তো দূরের কথা, আপনার অবর্তমানেও করতে ঘৃণাবোধ করে। তাই মহিলা সাহাবীয়াদের ইতিহাস পাঠ করা যেতে পারে।

সুতরাং, মায়েরা শৈশবের প্রারম্ভ থেকে নিজ সন্তানদেরকে কোন মাখলুকের ভয় দেখাবেন না। না ভূত-পেত্নীর, না জীন-দানবের, না কাল কুকুর, না লেজকাটা টেরা বিড়ালের, না ঠোঁট কাটা কাল কাকের, না ঘোর অন্ধকারের। এমনকি নিজের থাপ্পরেরও না, বাপের কিল-ঘুষিরও না,

উস্তাদের বেতেরও না। (অবশ্য মাতা-পিতা ও উস্তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি তার অন্তরে বসাতে হবে)। ইনশাআল্লাহ! এমন মায়ের সন্তানরা যখন বড় হবে, তখন জগতের বড় বড় শক্তির চোখের উপর চোখ রেখে কথা বলতে ভয় করবে না। শত সহস্র শুভেচ্ছা! স্বর্ণযুগের ঐ মায়েদের প্রতি, যাদের সন্তানরা যুগ শ্রেষ্ঠ বীর বাহাদুর ও সাহসী মুজাহিদরূপে স্বীকৃত হয়েছে, যারা আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় হাবীব (সাঃ) এর নিকটও প্রশংসিত হয়েছে। বর্তমান যুগে শিশুদের থেকে তো দূরের কথা, বড়দের থেকে প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব প্রায়। সুতরাং, হাদীসের কিতাবে একটি ঘটনা উল্লেখ রয়েছে যে, একদা আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রাঃ) নিজ শাসনামলে মদীনার কোন এক গলি দ্বারা পথ অতিক্রম করছিলেন। সেখানে কিছু শিশু-কিশোরের দল খেলা-ধুলা করছিল। যখন শিশুরা আমীরুল মুমিনীনকে দেখল, তখন একজন শিশু ছাড়া সকলেই পালিয়ে আত্মগোপন করল। হযরত উমর (রাঃ) তার বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, এই খোকা! তুমি ভাগলে না কেন? তখন সে উত্তরে বলল যে, "আমীরুল মুমিনীন! আমি ভাগব কেন? আমি তো কোন অন্যায় করিনি যে, ভয় পাব। আর এখানে রাস্তা এত সংকীর্ণও নয় যে, আপনি পথ অতিক্রম করতে পারবেন না।" হযরত উমর (রাঃ) তার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। শিশু বলল, "আমি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর।" নাম শ্রবণ করে হযরত উমর (রাঃ) বললেন, এখন আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ, এ হল আসমা বিনতে আবু বকরের (রাঃ) ছেলে। [হযরত আয়িশার (রাঃ) বোনের ছেলে]

এমন অসংখ্য ঘটনা কিতাব সমূহে বিদ্যমান রয়েছে, যা আমাদের জন্য এ কথার সাক্ষ্য বহন করে যে, যদি মায়েরা সদিচ্ছা করেন, তাহলে মহান আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে তাদের সন্তানরা বীর বাহাদুররূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। পরিশেষে, পুনরায় অনুরোধ এই যে, আল্লাহর ওয়াস্তে নিজ সন্তানদেরকে কখনও পৃথিবীর কোন বস্তুর ভয় দেখাবেন না। বরং তাদেরকে সমাজে বীররূপে প্রতিষ্ঠিত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।

শিশুদের সাথে মিথ্যা ওয়াদা করা ক্ষতিকর

আমাদের সমাজে অনেক মা এমনও রয়েছেন, যারা জেনে শুনে শিশুদের সাথে মিথ্যা অঙ্গীকার করে প্রতারণা করে থাকেন। কেউ বলে থাকেন, "আমি তোমাকে বাজনাওয়ালা সাইকেল কিনে দেব।" কেউ বলে থাকেন, "আমি তোমাকে ভুঁ ভুঁ শব্দযুক্ত মটর সাইকেল কিনে দেব।" কেউ

"নতুন ডিজাইনের ঘরি" কিনে দেওয়ার ওয়াদা করে থাকেন। কেউ "সুন্দর পুতুল ও মিষ্টি" কিনে দেওয়ার ওয়াদা করে থাকেন। কিন্তু এর মধ্য হতে একটিও পূর্ণ করা হয় না। বরং শুধুমাত্র ধোকা, প্রতারণা ও মন ভোলানোর জন্যই ওয়াদা করা হয়। মায়ের উদ্দেশ্য এটা হয়ে থাকে যে, অল্প সময়ের জন্য হলেও যেন শিশুর মনটা আনন্দিত হয়ে যায়। কিন্তু এমন মিথ্যা ওয়াদাকারিণী মায়ের স্মরণ রাখা একান্ত কর্তব্য এই যে, এমনিভাবে পৃথিবীতে নিজ সন্তানদের মিথ্যা বলার এবং ওয়াদা ভঙ্গ করার শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। এ শিক্ষা তাদের চরিত্র এবং ভবিষ্যত জীবনকে ধ্বংস করে দিবে।

আদর্শ মায়েদের এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখাও কর্তব্য যে, শিশুরা যেন সময়ে-অসময়ে এটা ওটা খাওয়া এবং বাজারে বা পথে-ঘাটে অরক্ষিত খাদ্য-দ্রব্য আহার করার অভ্যস্ত না হয়। এতে শিশুদের স্বভাবের মধ্যে দুনিয়া ভরা অসংখ্য বদঅভ্যাস সৃষ্টি হয়। যখন শিশুদের নিকট কিছু ক্রয় করার কোন পয়সা-কড়ি না থাকে, তখন সে চুরি করার চিন্তা ভাবনা করে, মিথ্যা বলে এবং ধোকা দেওয়াসহ বিভিন্ন প্রকার অপরাধ ও পাপে জড়িয়ে পড়ে। বড় হয়েও পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী গৃহের আসবাব-পত্র অন্যত্র বিক্রি করে দেয়। তাই মায়েদের কর্তব্য এই যে, শৈশব কাল হতেই শিশুদেরকে বদঅভ্যাস থেকে বাঁচিয়ে রাখা। শিশুদের হাতে সময়ে-অসময়ে পয়সা দিবেন না। বিনা প্রয়োজনে হোটেল, বাজার ও পথে-ঘাটের খাদ্য দ্রব্য খেতে দিবেন না। বরং গৃহে তৈরীকৃত খাদ্য খেতে দিন। তাতে শিশুর স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে, পয়সারও সাশ্রয় হবে। অধিকন্তু, খাদ্য দ্রব্যও ভাল পাওয়া যাবে। শিশুর বদঅভ্যাসও দূর হবে।

সন্তানের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা

প্রত্যেক আদর্শ মায়ের জন্য কর্তব্য এই যে, নিজ সন্তানের খাদ্যের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া। কেননা, তাদের খাদ্যের মধ্যে পুষ্টিহীনতার কারণে শারীরিক, মানসিক প্রবৃদ্ধির উপর এক বিরাট কুপ্রভাব পড়ে। আমাদের দৃষ্টিতে এমন শিশুও গোচরিভূত হয়, যে সচ্ছল পরিবারের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও খুব দুর্বল, অলস ও কাহিল। যখন এর কারণ যাচাই করা হল, তখন জানা যায় যে, শিশুর মা যখন-তখন, সময়ে-অসময়ে তাকে সুস্বাদু অথচ অপুষ্টিকর খাদ্য আহার করতে দিতেন। যদ্দারা বহ্যিক দৃষ্টিতে তো এমন মনে হয়েছে যে, শিশুর পেট হয়ত পূর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু ঐ সমস্ত খাদ্যে পুষ্টি বিদ্যমান না থাকার কারণে শিশুর শারীরিক, মানসিক উন্নতি ও প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় উপকারী প্রমাণিত হয়নি। এই জন্য কোন মা

যদি আশা রাখেন যে, তার সন্তান সুস্থ-স্ববল, চালাক-চতুর ও বুদ্ধিমান হোক, তাহলে তার জন্য আবশ্যক এই যে, শিশুর নিত্যদিনের খাদ্যের প্রতি মনোযোগী হওয়া। এটা ঠিক নয় যে, সব সময় কিছু না কিছু গলধকরণ করতে দেওয়া। বরং শিশুর জন্য খাদ্যের একটি তালিকা প্রণয়ন করুন। সব সময় আহার করাতে থাকলে অধিকাংশ শিশু নিজ বয়সের তুলনায় বেশী মোটা ও ভারী হয়ে যায় এবং ফুলে যায়। অতঃপর এই মোটা বেচারা অন্যান্য শিশুদের মত-দৌড় ঝাপ, খেলা-ধুলাও করতে পারে না, ফুর্তি ও চঞ্চলতার সাথে কোন কাজও করতে পারে না, বরং বিবেক-বুদ্ধির দিক দিয়েও দুর্বল হয়ে থাকে। কোন কোন মা এমন উযর–আপত্তি পেশ করে থাকেন যে, আমাদের আর্থিক সচ্ছলতা এত ভাল নয় যে, সন্তানকে পেস্তা, বাদাম কিসমিস, মোনাক্কা, কলা, ডিম প্রভৃতি খেতে দিব। এমন মায়েদের নিকট আমার আকুল আবেদন এই যে, এটা আবশ্যক নয় যে, কিসমিস আর ডিম দিতেই হবে। বরং এর পরিবর্তে অল্প মূল্যের অথচ প্রোটিন ও পুষ্টিযুক্ত খাদ্য শিশুকে খেতে দেওয়া যেতে পারে। খাদ্য বিশেষজ্ঞগণ গবেষণা করে এ সিদ্ধান্তে পৌচেছেন যে, চিনা বাদাম এবং ছোলা বুট পেস্তা বাদামের সমতূল্য। বরং কারো কারো ক্ষেত্রে উত্তমতর প্রমাণিত হতে পারে। খাদ্য বিশেষজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী খাদ্য তালিকা প্রণয়ন করে সে অনুযায়ী শিশুদের খাদ্য দিতে থাকুন। দেখবেন শিশু কেমন রিষ্টপুষ্ট হচ্ছে।

শিশুদের নাস্তা কেমন দিতে হবে?

ঘুম থেকে উঠে শিশুর প্রথম খাদ্যটি অর্থাৎ নাস্তাটি একটু স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আজ-কাল এই আধুনাযুগে মায়েরা শিশুদের কোন বিশেষ রকম নাস্তা আহার করান না। বরং পুড়ি, চা এবং বিস্কুট ইত্যাদি দ্বারা নাস্তা করানোকে যথেষ্ট মনে করেন। অথচ এর দ্বারা শিশুর স্বাস্থ্যের উপর বড় কুপ্রভাব পড়ে এবং শিশু দুর্বল হয়ে পড়ে। অধিকন্তু, শিশুর গঠন প্রকৃতি এবং বর্ধন প্রক্রিয়া ব্যহত হয় এবং শিশুর শরীরে ক্যালসিয়ামের স্বল্পতা দেখা দেয়। এ জন্য প্রতিটি আদর্শ মায়ের লক্ষণীয় বিষয় এই যে, নিজ সন্তানকে সুস্থ-স্ববল এবং দ্বীনের মুবাল্লেগ বানানোর নিয়্যতে পুষ্টি ও প্রোটিনে ভরপুর নাস্তা করাতে ভুল করবেন না। যেমন দুধ, কলা, ডিম এবং বিভিন্ন প্রকার ফল দ্বারা নাস্তা করাবেন।

ফারসীতে একটি প্রবাদ বাক্য রয়েছে,

"এক লুক্বমা সাবাহী.

বেহতর আয মুরগ ওয়া মাহী।”

অর্থাৎ প্রভাতকালে এক লুক্বমা খাদ্য, মোরগ ও মাছ থেকেও উত্তম।

তাই আমাদের পুরাতন চিকিৎসাবিদ্যায় সকাল বেলার নাস্তার প্রতি খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেননা, নাস্তা দ্বারাই সমস্ত দিনের উদ্বোধন করা হয়। যদি সে সময়ে শক্তিবর্ধক, পুষ্টিকর খাদ্য আহার করা যায়, তাহলে দুপুরের ভোজনটা হালকা হলেও তেমন একটা পার্থক্য হয় না। বরং অনেক দেশে সকালের নাস্তার প্রতি খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়। সে সমস্ত দেশে দুপুরের খানা নামকা ওয়াস্তে থোড়া সামান্য আহার করে। অবশ্য রাতের খানাটা পেটপুরে খায়। তাই স্বীয় বাচ্চাদের এবং নিজেও সামর্থ অনুযায়ী ভাল এবং সুষম ও স্বাস্থ্যকর নাস্তা আহার করা অপরিহার্য।

আমাদের দেশে ভাল নাস্তা বলতে পুড়ি, সিঙ্গাড়া, পাকান পিঠা, তেলে ভাজা পিঠা, পারাটা ইত্যাদি তৈলাক্ত খাদ্যদ্রব্য বুঝায়। কিন্তু আহার করতে এ দ্রব্যগুলো যতটুকু মুখরোচক, স্বাস্থ্যের জন্য তার চেয়ে বেশী ক্ষতিকারক। তৈলাক্ত এ খাদ্যদ্রব্যগুলো হজম হতে বেশ দেরী লাগে। অতিরিক্ত নাস্তা এবং তেল ও ঘিয়ে তৈরীকৃত খাদ্য লিভারের ক্ষতি করে। পারাটা এবং তৈলাক্ত খাদ্য ঐ সমস্ত শিশুদের জন্য খুবই ক্ষতিকর, যাদেরকে মাদ্রাসায় অথবা স্কুলে অ-নে-ক ক্ষণ লেখা-পড়া করতে হয়। শারীরিক কসরত এবং মেহনতের মাধ্যমেও তৈলাক্ত খাদ্যদ্রব্য হজম হয়ে যায়। এজন্য এমন নাস্তাকে পরিত্যাগ করাই উত্তম। বরং প্রতিদিনের নাস্তার জন্য এমন তালিকা প্রণয়ন করা উচিত, যে নাস্তার মধ্যে স্বাধও থাকবে, পুষ্টিও থাকবে। তালিকা তৈরীর সময় আবহাওয়া এবং ঋতুর প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। যেমন শীতকালে মাখন, ঘী, ডিমপোজ শরীরের জন্য শক্তি বর্ধক। আর গুরম কালে এর বিপরীতে কম মাখন, হাফ বয়েল ডিম খেতেও মজাদার এবং স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী।

সকালে নাস্তার পূর্বে অর্ধেক কাগজী লেবুর রস নিংড়িয়ে পানিতে মিশিয়ে শিশুদেরকেও পান করান, নিজেও পান করুন। এতে গলা এবং চোখের উপকার সাধিত হয়। এমনিভাবে সকালের নাস্তায় গাজরের ব্যবহার দৃষ্টিশক্তি এবং রক্ত বৃদ্ধি করে। তাই শিশুদেরকে সকালের নাস্তায় এই সমস্ত জিনিষ খাওয়াতে ভুল করবেন না।

ক্রন্দনরত শিশুদের কিভাবে হাসাবেন

মাত্রাতিরিক্ত ক্রন্দন করা শিশুদের জন্য ক্ষতিকর। তবে কোন কোন সময় একেবারে ছোট শিশুদের ক্রন্দন করা শারীরিক সুস্থতার জন্য উপকারীও হয়। তার ছোট্ট দেহের ব্যায়াম এবং গঠন প্রকৃতি বর্ধনের জন্য

ক্রন্দনরত অবস্থায় হাত, পা নড়াচড়া করা একটি ভা কাজ। কিন্তু যদি তার কাঁদা কোন ব্যথা-বেদনা বা কষ্টের কারণে হয় অথবা কোন প্রয়োজন বা চাহিদার কারণে হয়, তাহলে মায়ের কর্তব্য এই যে, শিশুর কষ্ট দূর করার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজন সমাধা করার জন্য তড়িৎ চেষ্টা করা। এতে ইনশাআল্লাহ শিশুর পূর্ণ আস্থা মায়ের প্রতি সৃষ্টি হবে।

ক্রন্দনরত শিশুকে হাসানোর এক অভিজ্ঞতা এই যে, যখন শিশু কাঁদতে থাকে, তখন তাকে চুপ করানোর পরিবর্তে তার নিকট হাসানোর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, বহুবার এমনও হয়েছে যে, ক্লাসে কোন শিশু কাঁদছে। তাকে চুপ করাতে ঘন্টা, আধ ধন্টা সময় ব্যয় হচ্ছে, তথাপি সে নীরব হচ্ছে না। কয়েক প্রকার মজাদার খাদ্য দ্রব্যও পেশ করা হল, এমনিভাবে খেলনা সামগ্রীও সম্মুখে রাখা হল, কিন্তু এরপরও সে নিজ জেদের উপর অটল রইল। এমন শিশুর জন্য এ অভিজ্ঞতা অর্জন করা হয়েছে যে, ক্লাসের অন্যান্য শিশুদের বলা হয়েছে, তোমরা সকলেই এক সাথে হাসো। যখন ক্লাসের সকল ছাত্ররা একযোগে সমবেত স্বরে হাসতে লাগল এবং ক্রন্দনরত শিশু সকলকে একযোগে হাসতে দেখল, তখন সেও সকলের সাথে হাসতে লাগল। প্রথমে সে একা কাঁদছিল আর অন্যান্যরা লেখা-পড়ার কাজে ব্যস্ত ছিল। এখন যখন সকলেই এক সাথে হাসছে দেখল, তখন সে তার দুঃখ ভুলে গেল এবং হাসতে লাগল। এমনিভাবে মানুষ পরিবেশের কারণেও প্রভাবান্বিত হয়। দুঃখিত, ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যখন আনন্দ ঘন পরিবেশে যায়, তখন সে নিজের দুঃখের কথা ভুলে যায়। সুতরাং, প্রতিটি বুদ্ধিমতী আদর্শ মায়ের করণীয় এই যে, তার ক্রন্দনরত সন্তানকে চুপ এবং খামুশ করানোর জন্য গৃহে হাসানোর পরিবেশ সৃষ্টি করা। ক্রন্দনরত শিশুকে যদি কোন উপায়ে হাসাতে পারেন, তাহলে এটি আপনার বুদ্ধিমত্তা এবং যোগ্যতার পরাকাষ্ঠা বিবেচিত হবে।

ক্রন্দনরত শিশুকে আরো বেশী কাঁদানো, ধমকানো, শাসানো কোন মুসলমান মায়ের জন্য শোভা পায় না। বরং নিজের পক্ষ থেকে পূর্ণ চেষ্টা করুন এবং বাস্তব কার্যে এর অনুশীলন করুন। মা হিসেবে যদি আপনি সন্তানের দুঃখ-ব্যথা দূর করতে সক্ষম হন, তাহলে ইনশাআল্লাহ মুসলিম উম্মাহর অসংখ্য নারীর পার্থিব দুঃখ-ব্যথা দূর করার মাধ্যম হয়ে যাবেন।

উল্লেখ্য, যখন হযরত উমর (রাঃ) খবর প্রাপ্ত হলেন যে, মহানবী (সাঃ) স্ত্রীদের অতিরঞ্জিত কোন আচরণের কারণে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কোন এক কক্ষে অবস্থান করছেন, তখন তিনি মসজিদে গমন করলেন এবং বললেন–

لَاَقُوْلَنَّ شَيْئًا اَضْحَكَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থ ঃ আমি অবশ্যই এমন একটি কথা বলব, যা প্রিয় নবীজী (সাঃ)কে হাসাবে। (মিশকাত শরীফ)

বাস্তবে হলও তাই। যখন তিনি নবীজীর (সাঃ) নিকট গেলেন, তখন ভগ্ন হৃদয়ে দুঃখের স্বরে নবীজী (সাঃ)কে বললেন যে, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমরা কোরাইশী পুরুষরা নারীদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে থাকতাম। কিন্তু মদীনায় আগমন করে দেখতে পেলাম যে, আনছার মহিলাগণ পুরুষদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে। এদের দেখাদেখি কোরাইশ মহিলাদের মধ্যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। এরপর আমি এক আধটা কথা আরো বললাম, যদ্দ্বারা নবীজী (সাঃ)-এর নূরানী চেহারায় মুচকী হাসির রেখা প্রকাশ পেল। (হেকায়েতে সাহাবা)

উল্লেখিত ঘটনা দ্বারা আমরা অবগত হলাম যে, যখন মানুষ কাউকে দুঃখিত, ভারাক্রান্ত, চিন্তিত দেখতে পায়, তখন তার সাথে এমন কথা বলবে, যদ্দ্বারা তার ধ্যান ও মগ্নতা অন্য দিকে ঘুরে যায় এবং সে তার দুঃখকে ভুলে যেয়ে হাসতে থাকে। যেমন মহানবী (সাঃ) চিন্তিত হলেন, তখন হযরত উমর (রাঃ) মন ভোলানোর জন্য এমন কৌতুকপূর্ণ কথা বললেন, যদ্দ্বারা প্রিয় নবীজীর নূরানী মুখাবয়বে মুচকী হাসীর মিষ্টি রেখা প্রস্ফুটিত হল।

তাই, প্রতিটি মায়ের কর্তব্য এই যে, তিনি বিশেষভাবে নিজ সন্তানদের এমন পদ্ধতিতে প্রতিপালন করবেন, যেন শিশু নিজেও মুচকি হাসতে অভ্যস্ত হয় এবং অন্যদেরকেও হাসাতে বাধ্য করতে পারে। হাসিমাখা চেহারা আল্লাহর নিকট খুবই প্রিয় এবং এটা আল্লাহ তা'আলার বহুত বড় নিয়ামত। এতে মায়ের ভূমিকা খুবই কার্যকরী। যদি মা সর্বপ্রকার পেরেশানীর মধ্য থেকেও মুখে হাসি ফোটান, তখন সন্তানরাও হাসতে থাকবে, স্বামীও হাসতে থাকবে। তখন দুনিয়ার এ ঘর বেহেশতের নমূনা হয়ে যাবে, আর আনন্দের বন্যা বয়ে যাবে প্রতিটি হৃদয়ে।

শিশুদেরকে আনন্দিত রাখার ফযীলত

শিশুদেরকে আনন্দ দেওয়ার ফযীলত সম্বলিত একটি হাদীস কানযুল উম্মাল গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেন–

اِنَّ فِى الْجَنَّةِ دَاراً يُقَالُ لَهَا دَارُ الْفَرَحِ لَايَدْخُلُهَا اِلَّا مَنْ فَرَّحَ الْاَطْفَالَ

অর্থ ঃ জান্নাতে একটি গৃহ রয়েছে, যাকে দারুল ফারহ (আনন্দের ঘর) বলা হয়। তাতে ঐ সমস্ত লোকেরা প্রবেশ করবে, যারা নিজ সন্তানদের সন্তুষ্ট রাখবে।

উল্লেখিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজ সন্তানদের সন্তুষ্ট রাখার প্রতিদান স্বরূপ জান্নাতের শুভ সংবাদ দান করেছেন। এতে জানা গেল যে, সন্তানদের সন্তুষ্ট রাখা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির কারণ।

শিশুদের সন্তুষ্ট ও আনন্দিত রাখার কয়েকটি পন্থা রয়েছে। উপমা স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, শিশুরা যখন খেলা-ধুলা করবে, তখন তাদের সাথে খেলা-ধূলায় শরীক হওয়া, তাদের ছোট ছোট বৈধ আবদার ও দাবীসমূহ পূর্ণ করা, তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার ও হাসিমুখে কথা বলা, তাদেরকে এমন এমন কেচ্ছা-কাহিনী ও কৌতুক শুনানো–যাতে তারা হেসে লুটোপুটি খায়। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে, হাসি-কৌতুক যেন মিথ্যায় ভরা না হয় এবং এর দ্বারা কারো অপমান উদ্দেশ্য না হয়। গীবত-শেকায়েতও যেন তাতে না থাকে। যেমন একবার এক বৃদ্ধা মহিলা হুজুরে আকরাম (সাঃ)–এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল যে, আমার জন্য দু'আ করুন, যেন আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। উত্তরে নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করলেন, জান্নাতে কোন বৃদ্ধা মহিলা প্রবেশ করতে পারবে না। তখন ঐ বৃদ্ধা কান্না জুড়ে দিল। প্রিয় নবীজী (সাঃ) মুচকী হেসে ইরশাদ করলেন, জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে আল্লাহ তা'আলা সকল নারী-পুরুষকে পুনরায় জওয়ান বানিয়ে দিবেন। এ কথা শ্রবণ করে বৃদ্ধা খুশী হয়ে গেল।

উল্লেখিত কৌতুকে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, এতে না রয়েছে মিথ্যার সংমিশ্রন, না রয়েছে গীবত। যদি এ পন্থায় আপনিও হাসি-কৌতুক করেন, তাহলে তা শিশুদের জন্য খুবই উত্তম। কিন্তু একটি কথার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, স্থান-কাল পাত্র যেন ঠিক থাকে। যাতে করে আপনার সম্মান, ব্যক্তিত্ব ঠিক থাকে। অন্যথায় অতিরিক্ত হাসি-ঠাট্টা ক্ষতিকর।

সন্তানদের দাস-দাসী বানাবেন না

সন্তানকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখা, প্রতিপালন করা শ্রেয়। অনেক মা এমন রয়েছেন, যারা নিজ সন্তানদের দাস-দাসীতে পরিণত করেন। আবার অনেক মা এমনও রয়েছেন– যারা সন্তানের সম্মুখে নিজেদেরকে দাস-দাসীতে পরিণত করেন। বলার উদ্দেশ্য এই যে, অনেক মা সন্তানদের উপর শুধু জুলুম করেন এবং মেরে মেরে নিজের প্রত্যেক কথা মানতে বাধ্য করেন। আর কথা মানিয়ে তাদের মধ্যে দাসত্বের মন-মানসিকতা সৃষ্টি

করেন। এর বিপরীত অনেক মা এমনও রয়েছেন, যারা নিজ দুলাল-দুলালীদের প্রত্যেক আবদার, দাবী এবং জেদের সম্মুখে এমন অবনত মস্তক হয়ে যান যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে ঐ সন্তানরা মাতা-পিতার মনিবের ভূমিকা পালন করে। এমন জিদ্দিবাজ সন্তানেরা যখন জিদ শুরু করে, তখন গোটা ঘরকে মাথায় তুলে নেয় এবং নিজ জেদের সম্মুখে পরিবারের সকলের মস্তককে অবনত করে নিজের দাবী পূর্ণ করে নেয়। স্মরণ রাখুন, সন্তানের সাথে আচরণের উভয় পন্থা ভুল। এতে শিশুদের চারিত্রিক এবং মানসিক প্রতিপালনে সীমাহীন ক্ষতি সাধিত হয়। শিশুদের দাসও বানানো উচিৎ নয় এবং তাদেরকে মনিবও বানানো উচিৎ নয়।

অপরাধী সন্তানদের হাতে নাতে পাকড়াও করবেন না

নিজ সন্তানদের সঠিক ও সুষ্ঠু প্রতিপালন তখনই সম্ভব- যখন সন্তানরা অন্তর দিয়ে মাতা-পিতার ইজ্জত করবে, তাদের হৃদয় গভীরে মাতা-পিতার জন্য মর্যাদার স্থান হবে, তাদের সম্মুখে যেতে লজ্জা করবে এবং তাদের সম্মুখে অশালীন আচরণ করতে শরম উপলব্ধি করবে। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন মাতা-পিতাও ঐ কথার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন যে, যদি কখনও কোন অশালীন আচরণে লিপ্ত অবস্থায় তাদের দৃষ্টি সন্তানের উপর পড়ে যায়, তো ঐ সময় তাদের মোটেরও পাকড়াও করবেন না এবং ধমকাবেন না, শাসাবেন না, বরং নিজেকে সন্তানের সম্মুখে কখনও প্রকাশ করবেন না। এমনকি যদি সন্তান দেখেও ফেলে, তবুও একেবারে অজ্ঞতা প্রকাশ করে না দেখার ভান করবেন। কারণ, এ সন্তান আপনার জন্য জঘন্য অপরাধী নয় যে, তার সাথে পুলিশের মত আচরণ করতে হবে। পুলিশকে তার চাকরী মজবুত করার জন্য মাঝে মধ্যে আচরণ করতে হয়, মাঝে মধ্যে দু'চারজন চোর পাকড়াও করতে হয়। মাতা-পিতা তো আর পুলিশ নয় যে, চাকরী মজবুত করতে হবে।

নিম্নে কিছু উপমা উপস্থাপন করা হচ্ছে। এর উপর আমল করার দ্বারা ইনশা আল্লাহ সন্তান থেকে বদঅভ্যাস বা অপরাধ প্রবণতা দূরীভূত হবে এবং তাদের অন্তরে মাতা-পিতার মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

(১) যদি কখনও আপনি নিজ সন্তানকে সিগারেট পান করা অবস্থায় দেখে ফেলেন, তখন না দেখার ভান করুন এবং যাচাই-বাছাই আর তদন্ত থেকে বিরত থাকুন। সর্ব প্রথম আল্লাহ তা'আলার শাহী দরবারে দু'আ করুন যে, হে দয়াময় আল্লাহ! আমার ছেলের মধ্য হতে এই বদস্বভাব দূর

করে দিন। দু'আ করার পর কোন ভাল সুযোগ সুবিধা বুঝে ছেলের সাথে এমন ঢঙ্গে কথা বলবেন যে, বৎস! কিছু লোক কেমন বেওকুফ, বুদ্ধিহীন হয় যে, নিজ মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করার জন্য পয়সা অপচয় করে।

বৎস! তুমি কি বুঝতে পেরেছ আমার কথা? আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, যারা সিগারেট পান করে, তারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টা বিনষ্ট করে। সিগারেট পান করার একটি ক্ষতি এই যে, যখন কোন ব্যক্তি দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে, তখন ফেরেশতাদের কষ্ট হয় এবং ফেরেশতাগণ তার জন্য বদ দু'আ করেন। এছাড়া স্বয়ং আল্লাহ তা'আলারও দুর্গন্ধ পছন্দ হয় না। যখন কোন বান্দা দুর্গন্ধময় মুখে দু'আ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হন না। বরং দু'আ কবুল হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ায়।

প্রবল আশা করা যায় যে, দু'আ করার সাথে সাথে এভাবে বুঝাতে থাকলে ছেলের অন্তরে সিগারেট পান করার প্রতি ঘৃণা জন্মাবে এবং সিগারেট পান করা পরিত্যাগ করবে।

(২) হয়ত আপনি আপনার ছেলেকে ভিডিও গেম খেলা অবস্থায় দেখে ফেললেন। তখন সর্ব প্রথম আল্লাহ দরবারে দু'আ করুন। অতঃপর নিজ সন্তানকে আদরের চ্ছলে এভাবে বুঝাবেন যে, তোমার বুদ্ধিমান বন্ধুরা তো ভিডিও গেম খেলেনা। বৎস! কখনও তাতে গান হয়, বাজনা হয়, ছবিও থাকে, যা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না, অথচ এতে শয়তান সন্তুষ্ট হয়। এখন তুমিই বল, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে, না শয়তানকে? ছেলে যদি বলে আল্লাহকে, তাহলে তাকে সাবাসী দিন, কিছু উপহার দিন। এ পন্থায় বুঝালে ইনশাআল্লাহ সে নিজেও ঐ বদ-অভ্যাসকে পরিত্যাগ করবে এবং বন্ধু-বান্ধবদেরও লা'নত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে।

(৩) হয়ত আপনার শিশু মিথ্যা বলে, অশ্লীল ভাষায় গালাগালী দেয়। যদি কোন সময় আপনি তাকে গালাগালী বা মিথ্যা বলা অবস্থায় পেয়ে যান, তাহলে না শোনার ভান করুন। কেমন যেন আপনি কিছুই শ্রবণ করেন নি। প্রথমে মনে মনে দু'আ করুন। অতঃপর কোন ভাল সময় সুযোগ বুঝে মিথ্যা বলা এবং গালী দেওয়ার ক্ষতিকর দিকটি তার সম্মুখে তুলে ধরুন এবং বলুন যে, বৎস! মিথ্যা বলা, গালী দেওয়া খুব খারাপ কথা। এতে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন। আর আল্লাহ তা'আলার প্রিয় হাবীব (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "যখন কেউ কারো নিন্দা করে, গালী দেয় এবং ঐ ব্যক্তি শক্তি-সামর্থ থাকা সত্ত্বেও চুপ থাকে, তখন আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতাকে নির্দিষ্ট করে দেন, যে ফেরেশতা ঐ ব্যক্তির পক্ষ

থেকে নিন্দাকারীকে উত্তর দেয়।" অন্য হাদীসে নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যখন আমার উম্মত পারস্পারিক গালাগালী করবে, তখন তারা আল্লাহর দৃষ্টি হতে পতিত হয়ে যাবে, অর্থাৎ আল্লাহর নিকট ঐ বান্দার কোন মর্যাদা বা মূল্য থাকবে না। সুতরাং আমাদের উচিত এই যে, কখনও অশ্লীল কথা বা পঁচা বাক্য নিজ মুখ দ্বারা উচ্চারণ না করা। বরং কেউ যদি করে, তাহলে উত্তরে কিছু বলব না। যাতে করে আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিতে ঘৃণিত হওয়ার থেকে আমরা বাঁচতে পারি।

সন্তানকে বুঝানোর সাথে সাথে এটাও আবশ্যক যে, মাতা-পিতা নিজেরাও গালাগালী এবং অশ্লীল কথাবার্তা হতে পরহেয করবেন। কারণ, মাতা-পিতা যদি নিজেরাই এই রোগে আক্রান্ত হন, তাহলে তাদের দ্বারা অন্যের রোগমুক্তি হবে কেমন করে?

মাদ্রাসা বা স্কুল থেকে ফেরার পর মায়ের করণীয়

মাদ্রাসা বা স্কুল থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর মায়ের করণীয় এই যে, বাচ্চাদের হালকা পানাহারের ব্যবস্থা করা। মাদ্রাসা থেকে ফেরার পর পরই প্রথমে সালাম করিয়ে কিছু পানাহার করিয়ে দেওয়া। অতঃপর তাদের বলা যে কাপড় পাল্টিয়ে নাও..........খানা খেয়ে নাও.......... মাদ্রাসার পড়া মুখস্থ কর.......... হাতের লেখা পূর্ণ কর, ইত্যাদি ইত্যাদি। মা এ কাজগুলো এ জন্য করবেন যে, এ সন্তানটি মায়ের থেকে ছয় ঘন্টা শুধু দূরেই ছিল–তা নয়, বরং ছয় ঘন্টা মায়ের স্নেহমাখা-মায়ামাখা দৃষ্টি থেকেও দূরে ছিল। ছয় ঘন্টা মায়ের কর কমলের মমতাভরা মৃদু স্পর্শ শিশুর কপোলেও জোটেনি। শিশু মাদ্রাসা বা স্কুলে বসে বসে মায়ের স্নেহ-মায়ামাখা, মমতামাখা ছোঁয়ার আকাঙ্খা করেছে। এখন বাড়ী ফিরছে বুকভরা আশা নিয়ে। আশা এই যে, মা তাকে আদর করবে, সোহাগ করবে, কোলে নেবে, কপালে পিয়ার মুহাব্বত ভরা চুমো এঁকে দেবে। সে মাদ্রাসা বা স্কুলে কারো নিকট কোন প্রকার মান-অভিমান বা আবদার কিছুই করেনি। সে মায়ের সম্মুখেই এসব কিছু করার অধিকার রাখে। কিন্তু শিশু যদি মায়ের নিকট ফিরে আসার পরও পিয়ার মুহাব্বত না পায়, আদর-সোহাগভরা অভ্যর্থনা না পায়, প্রত্যুষে গৃহে থেকে পড়তে যাওয়া অবুঝ শিশু যখন ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, তখন যদি মা দু'ঘুট শরবত না পান করায়, তার নিষ্পাপ মস্তকে স্নেহমাখা হাত না বুলিয়ে দেয়, তার পিঠে ঝুলে থাকা বইভরা ব্যাগটা নামিয়ে না নেয়, রান্না

ঘর থেকে দৌড়ে এসে দরজাটা খুলে দেওয়ার সময়টাও যদি মায়ের না হয়, তাহলে এমন শিশুর মধ্যে ক্রোধ, জেদ, একরোখাপনা ও খিনখিনেপনা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। কান্নাকাটি ও বদমেজাজী প্রদর্শনে অভ্যস্ত হওয়া স্বাভাবিক। স্বাভাবিক তার মারা-মারি, ঝগড়া-ঝাটি আর হাঙ্গামাতে অভ্যস্ত হওয়া। এমন নিষ্ঠুর মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি ও মুহাব্বত শিশুর অন্তরে সংযুক্ত হবে কিভাবে? সুতরাং, এমন মারাত্মক ভুল করবেন না। বরং এ কথার প্রতি খুব গুরুত্ব দিন যে, শিশু যখন মাদ্রাসা বা স্কুলে যাবে, তখন যেন হাসি খুশী ও আনন্দচিত্তে যায় এবং যখন বাড়ী ফিরবে, তখনও যেন আনন্দচিত্তে প্রত্যাবর্তন করে। এমন যেন না হয় যে, মাদ্রাসায় প্রেরণের প্রাক্কালে এক দফায় চিল্লাচিল্লি, হাতাহাতি করতে হয়, আবার মাদ্রাসা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এক দফায় চিল্লাচিল্লি করতে হয়। বরং এ প্রচেষ্টাই করুন, যেন আপনার সন্তান পিয়ার ও মুহাব্বত, নম্রতা এবং সহমর্মিতার স্বরে আপনার কথা বুঝার, মানার এবং হৃদয়ঙ্গম করার অভ্যস্ত হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা আপনাদের এবং সকল মুসলমান মাকে এ গুরুদায়িত্ব সঠিক ও সুন্দর ভাবে আদায় করার তাউফীক দিন।

শিশুদের দ্বারা কথা মান্য করানোর পদ্ধতি

প্রত্যেক আদর্শ মায়ের কর্তব্য এই যে, তিনি প্রথমে নিজের আমলের খোঁজ-খবর নিবেন যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার হুকুম-আহকাম পূর্ণরূপে মেনে চলেন কি-না। যদি না মেনে চলেন, তাহলে আজই চেষ্টা করুন যে, আল্লাহ তা'আলার আদেশ মেনে তা পূর্ণ করবেন। এভাবে আপনার সন্তানও আপনার কথা মানবে। যখন আপনি মহান আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করবেন, তখন দেখবেন, আপনার সন্তানেরাও আপনার আনুগত্য করবে। নিজ সন্তানদেরকে কখনও কঠোরতা বা চাপের মুখে কথা মানতে বাধ্য করবেন না। শিশুরা অবুঝ ও নিষ্পাপ হয়। কঠোরতা বা চাপের মুখে তাদের দ্বারা কোন কথা বা কাজ করানো তাদের উপর জুলুম বৈ নয়। পক্ষান্তরে যদি তাদের দ্বারা কোন কাজ উদ্ধার করতে চান, তাহলে প্রথমে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে ঐ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করুন। অতঃপর ঐ কাজের ফযীলত ও উপকারিতা বলুন। দেখবেন, শিশু অনায়াসে সব কথা মানছে। আর যদি কথা না মানে, তাহলে ক্ষতিকর দিকটা তুলে ধরুন। যেমন– পরিধের ময়লা বস্ত্র পালটাতে রাজী হচ্ছে না। এখন আপনি বলুন যে, আব্বু! যে বাচ্চারা ময়লা কাপড় পরিধান করে, লোকেরা তাদের ভাল

বলেনা। বরং লোকেরা বলে যে, "ওদের মা-বাপই ভাল না, পঁচা। ভাল হলে বাচ্চাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করায় না কেন?"

এভাবে লোকেরা চিন্তা করে যে, "ওদের কাছে মনে হয় আর কোন কাপড়ই নেই।" বস্তুতঃ ময়লা কাপড় পরিধান করলে আল্লাহ্ তা"আলাও অসন্তুষ্ট হন। কারণ, তিনি যখন পরিষ্কার ও ভাল কাপড় পরিধান করার তাউফীক দিয়েছেন, তখন তা পরিধান করে না কেন?" এত কিছু বুঝানোর পর আদর করে কোন কাজের আদেশ দিন। ইনশাআল্লাহ! শিশু সে কাজ খুশীতে খুশীতে করতে প্রস্তুত হয়ে যাবে।

এছাড়া, শিশুর নিকটবর্তী হয়ে তার মনের খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করুন। যেমন, অনেক রাত্র পর্যন্ত শিশু ঘুমাচ্ছে না। বরং অযথা সময় নষ্ট করছে। তখন আপনি তাকে কঠোরতার সাথে চিৎকার করে, "জলদি ঘুমিয়ে যা বলছি", অন্যথায় "তোরে কালা পেত্নী," "ডেঙ্গী ভুত," "লেংড়া জিন," ইত্যাদি নিয়ে যাবে" বলার চেয়ে তার শিয়রে বসে মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে মুহাব্বতের সাথে মধুমাখা সুরে বলুন, "বৎস" যদি তুমি তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়, তাহলে খুব সকাল সকাল নব উদ্যোমে জাগ্রত হতে পারবে এবং চঞ্চল মনে মাদ্রাসায় যেতে পারবে। সেখানে ক্লাসে বসে তোমার ঘুম বা ঝিমুনিও আসবে না। ধ্যান দিয়ে পড়তেও ভাল লাগবে, ইত্যাদি,ইত্যাদি। অতঃপর শিশুকে প্রশ্ন করুন যে, বল তো তোমার কি কারণে ঘুম আসছে না? তখন দেখবেন, আপনার বাচ্চা অবশ্যই মুখ খুলে অন্তরের কথা, ভেদের খবর বলে দেবে যে, আম্মু আমার ক্ষিধে পেয়েছে অথবা মশা কামড়াচ্ছে বা গরম লাগছে,ইত্যাদি। এখন আপনি তার সমস্যা অনুধাবন করে সমাধানের পথ অবলম্বন করুন।

একথা এক্বীনের সাথে বলা যেতে পারে যে, এভাবে আচরণ করলে, শিশুর অন্তরে আপনার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও মুহাব্বত খুব বেশী সৃষ্টি হবে এবং আগামীতে আপনার কথা মান্য করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

সন্তান প্রতিপালনের জন্য এই মৌলিক নিয়মটি স্মরণ রাখুন। তা হল, সন্তানকে কোন কাজের বা কথার আদেশ দেওয়ার পূর্বে কাজ করার উপকারিতা এবং না করার অপকারিতা অবশ্যই বলুন। এই নিয়মে আমল করলে, ইনশাআল্লাহ! আপনার অভিযোগ দূর হয়ে যাবে যে, বাচ্চারা কথা শোনে না। আর বাচ্চাদের অভিযোগও দূর হয়ে যাবে যে, আমাদের আম্মু কথা শোনে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তার সমস্ত আহকাম মান্য করার এবং আমাদের সন্তানদের আল্লাহ তা'আলার হুকুম আহকাম সহ আমাদের আনুগত্য করারও তাউফীক দান করুন।

শিশুদের তিরস্কার করা ভুল

স্মরণ রাখবেন, মা হওয়ার দায়িত্ব খুব বড়। আপনি যখন মা হওয়ার দায়িত্ব কবুল করেছেন, তখন আপনাকে যথেষ্ট সহ্য ও ধৈর্য ধারণ করতেই হবে। এই জন্য যে, কোন কোন সময় প্রচন্ড ক্রোধের উদ্রেক হবে শিশুদের বিরক্তিকর আচরণের কারণে অথবা বিভিন্ন প্রকার দুষ্টুমির অপরাধে কিংবা তাদের স্মরণশক্তি দুর্বলতার কারণে, যেমন–রাতভর ছোট বাচ্চাটা ঘুমাতে দেয়নি আর বড়টা ভোরে মাদ্রাসায় বা স্কুলে যেতে চাইছে না। মেঝটা চায়ের কাপ ভেঙ্গে ফেলেছে। এদিকে স্বামীর জন্য তাড়াতাড়ি নাস্তা তৈরী করতে হবে। এর সাথে যদি কুটনী জেঠানী আর ফাসাদী ননদের জ্বালাতন থাকে, তাহলে বারটা বাজতে বেশী মিনিট লাগবে না। তবে সফলকাম এবং দয়াময়ী, স্নেহময়ী মা তিনি, যিনি সংসারের এই তিক্ত ও বিষাক্ত গ্রাসকে মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি আর রেজামন্দী অর্জনের জন্য হজম করে থাকেন এবং তাঁর নিকট ধৈর্য প্রার্থনা করেন আর সঠিকভাবে সন্তান প্রতিপালনের তাউফীক চান।

আদর্শ মাকে বুযুর্গদের এ কথাটি অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে– "মেহেন্দী যত বেশী পিষা হবে, তত বেশী লাল হবে।" তাই মা যত বেশী ধৈর্য ধারণ করবেন, সন্তান তত বেশী আদর্শবান হবে।

চোখে দেওয়ার সুরমা একবার পেষণকারীকে প্রশ্ন করেছিল যে, আমাকে এত বেশী পেষণ কর কেন? পেষণকারী উত্তরে বলেছিল, পেষণ করার পর যখন তুমি শেষ পর্যায় পৌছে যাবে, তখন তোমার স্থান হবে আশরাফুল মাখলুকাতের (মানব জাতির) আশরাফুল আ'জা (উত্তম অঙ্গ) অর্থাৎ মানব জাতির চোখে।

সুতরাং কিছু সহ্য করে কিছু অর্জন করতে হবে। কিছু দিনের কষ্ট বরদাশ্ত করুন। ইনশাআল্লাহ! দুনিয়াতেই এর সুফল দেখতে পাবেন। আর আখেরাতে তো অবশ্যই অফুরন্ত প্রতিদান প্রাপ্ত হবেন।

কোন কোন মা কুপরিবেশ ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিরক্ত হয়ে কোন এক সন্তানের অপরাধের কারণে হয়ত অন্যান্যদেরও শাসন করেন, অথবা ঐ একজনকেই সকল ভাই-বোনদের সম্মুখে অপদস্থ করে দম নেন।

উল্লেখিত উভয় পন্থাই ভুল। প্রত্যেক মায়ের উচিৎ, শিশুর কোন ভুল-ত্রুটির জন্য তাকে একাকী বুঝানো। কখনও তাকে অন্যদের সম্মুখে অপমান করবেন না। আর একজনের অপরাধের কারণে গোটা বাড়ী মাথায়

তুলে নিবেন না।

এমনিভাবে হিম্মত ও উৎসাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন শব্দ উচ্চারণ করবেন না বা এমন পন্থা অবলম্বন করবেন না, যদ্দারা শিশু মনঃক্ষুণ্ন, অপমানিত, দুঃখিত হয়। যেমন, এমন ঢঙ্গে কথা বলা যে, "অমুক ছেলে বা অমুক মেয়ে পড়া-লেখায় কত অগ্রগামী হয়ে গেল, আর তুই তো কিছুই করতে পারিস না। অন্যের দোষ-ত্রুটি বলতে, খেলা-ধুলা করতে, লড়াই-ঝগড়া করতে আর খাওয়া-দাওয়াতে তো আগে আগে থাকিস। কিন্তু পড়ার বেলায় ঠন ঠন। পরীক্ষায় নাম্বারও তো কম পেয়েছিস, ইত্যাদি ইত্যাদি।"

এমন তিরস্কার ও ভর্ৎসনকারী শিক্ষক, মাতা-পিতা, বড় ভ্রাতা-ভগ্নীদের সম্ভাব্য ধারণা এই যে, এ পন্থায় শাসন বা তিরস্কার কিংবা ভর্ৎসনা করলে মনে হয় শিশুর প্রাণে সুপ্রভাব ফেলবে। কিন্তু এটা তাদের খামখেয়ালীপনা বৈ নয়। এমন আচরণে শিশুর কচি ব্যক্তিত্বে বিরূপ প্রতিক্রিয়া জন্ম দেয়। শিশু উত্তেজিত হয় এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে। তাদের মাঝে অশুভ কর্মস্পৃহা ও অসামাজিক কর্মক্ষমতা বিভিন্ন পন্থায়, বিভিন্ন সূত্র ধরে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। তখন সে একাকিত্ব ও ভবঘুরে জিন্দেগী পছন্দ করতে থাকে। খিনখিনে মেজাজ এবং বদস্বভাব তার মাথার উপর সাওয়ার হয়ে যায়।

সুতরাং, মুসলমান সন্তানের মুসলমান জননীগণ----- আপনাদের সামান্য ধৈর্য, সহ্য দ্বারা--- সামান্য নম্রতা, ভদ্রতা, সহিষ্ণুতা দ্বারা----- সামান্য চিন্তা-চেতনা, গাম্ভীর্যতা দ্বারা ----- সামান্য দু'আ, প্রার্থনা দ্বারা ইনশাআল্লাহ তা'আলা উত্তমতর সুফল প্রকাশ পাবে। আর সামান্য অবহেলা; অমনোযোগ সন্তানের জিন্দেগী ও ভবিষ্যৎ চিরদিনের জন্য ভেস্তে যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা নিজ ফযল ও করম দ্বারা সকলকে সঠিক ভাবে সন্তান লালন-পালন করার তাউফীক দিন। আমীন!

শিশুদের সাথে মায়ের সম্পর্ক কেমন হবে

আদর্শ মায়ের কর্তব্য এই যে, তিনি নিজ সন্তানদের সাথে সুসম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর করার প্রচেষ্টা করবেন। আর ঐ গভীরতর সুসম্পর্ক দ্বারা সন্তানদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করবেন। প্রতিদিন কিছু সময় বের করে তাদের সাথে বসে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করবেন। ইসলামী ইতিহাস, সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত

জেহাদের কাহিনী, শিক্ষামূলক গল্প ইত্যাদি আলোচনার বিষয়বস্তু রাখবেন। মা যখন ঐ সৎ নিয়্যত নিয়ে সন্তানদের সাথে আলোচনা করবেন, তখন ইনশাআল্লাহ প্রতিদিন নতুন নতুন বিষয়ের উপর মত বিনিময়ের সুযোগ হবে। আর শিশুরা ঈমান, চরিত্র, পয়সা ও সময় বিনষ্টকারী টিভি প্রোগ্রামগুলো দেখার আর হিন্দি ছবির হিট গানগুলো শ্রবণ করার সুযোগও পাবে না। বরং মা-জননীর সাথে বাচ্চার মুহাব্বত পয়দা হবে এবং মউত তক মায়ের স্মৃতিমাখা দিনগুলো মনের পর্দায় জ্বলজ্বল করে জ্বলবে।

আমাদের পূর্বের বুযুর্গদের এটাই আকঙ্খা ছিল যে, প্রতিটি ঘর যেন মাদ্রাসা, প্রতিটি মা যেন খানকাহ্‌র শিক্ষিকা হয়ে যান। যদি মা ইচ্ছা করেন, তাহলে প্রতিটি ঘর মাদ্রাসা এবং খানকাহে রূপান্তরিত হতে পারে। সুতরাং, প্রতিটি মায়ের করণীয় এই যে, তিনি প্রতিদিন এশার নামাযের পর কিছু সময় নির্দিষ্ট করে সকল সন্তানদের নিয়ে বসবেন এবং সেখানে জ্ঞান শিক্ষার ধারা চালু করবেন। যেমন, সন্তানরা যদি ছোট-ছোট হয়, তাহলে-------

☆ মা স্কুলের মিসেস ভূমিকা পালন করবেন। তখন তিনি ব্লাক বোর্ড ব্যবহার করবেন। আবার কখনও সন্তানকে মিস বানিয়ে দিবেন। বলবেন যে, তুমি ব্লাক বোর্ডে লিখে আমাদের পড়াও এবং বুঝাও অথবা নূরানী কায়দা লিখাও।

☆ কখনও সন্তানদের ঈমানদীপ্ত সাহাবী অথবা সাহাবিয়াদের কেচ্ছা-কাহিনী শ্রবণ করান। এ সময় চরিত্র গঠনের সহায়ক গল্পও বলা যেতে পারে।

☆ কখনও প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা করুন, বয়সের প্রতি লক্ষ্য রেখে তদনুযায়ী কোন উপযুক্ত ইসলামী ধাঁধা জিজ্ঞাসা করুন।

☆ কখনও যোগ, বিয়োগ, ভাগ তথা অংক সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন করুন এবং তার উত্তর আদায় করে নিন।

☆ কখনও ইসলামী ছড়া, কবিতা শিক্ষা দিন, মুখস্থ করান। কখনও হাদীস এবং কুরআনের ছোট ছোট সুরা শিক্ষা দিন। দশটি হাদীস এবং দশটি সুরা অবশ্যই মুখস্থ করিয়ে নিজে শুনুন।

☆ কখনও পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন করবেন, যেমন- তোমাদের বংশের নাম কি? তোমার পিতার নাম কি? শহরের নাম কি? জিলার নাম কি? প্রধানমন্ত্রীর নাম কি? ইত্যাদি ইত্যাদি। অতঃপর উত্তর সঠিক হলে ছোট ছোট পুরস্কারের ব্যবস্থা করুন।

☆ কখনও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করুন, কে ভাল ভাবে

আল্লাহর নিরানব্বই নাম লিখতে পারে? কখনও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করুন যে, কে নবীজীর (সাঃ) নিরানব্বই নাম সুন্দর করে লিখতে পারে?

☆ কখনও উপমা,উদাহরণ দ্বারা আলোচ্য বিষয়কে আরো আলোকিত ও সুস্পষ্ট করে সন্তানদের সম্মুখে তুলে ধরুন।

☆ কখনও দাগ টেনে, রেখা টেনে হাতের লেখাকে সুন্দর করানোর ব্যবস্থা করুন। যেমন– প্রিয় নবীজী (সাঃ) প্রিয় সাহাবীদেরকে দাগ টেনে টেনে বুঝাতেন।

☆ কখনও হাসি-কৌতুকের সত্য ঘটনা শুনিয়ে সন্তানকে আনন্দ দিন।

☆ যে দিন সন্তানদের মাদ্রাসা বা স্কুলের ছুটি হবে, সে দিন খুব সকাল সকাল রান্না, বান্না, ঘর গুছানোসহ সকল প্রকার কাজ থেকে অবসর হয়ে সন্তানদের ঘুম থেকে উঠাবেন এবং সমস্ত দিন তাদের সাথে অতিবাহিত করবেন। গত সপ্তাহের লেখা-পড়া সম্পর্কে খোঁজ খবর নিবেন।

মুসলমান মায়েদের কর্তব্য এই যে, সন্তানদের প্রতিপালনের ক্ষেত্রে নিজ সুখ-শান্তি বিসর্জন দেওয়া শিক্ষা করা। সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক ছুটির দিনগুলো ছাড়াও প্রতিদিন সন্তানদের ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পূর্বেই জাগ্রত হয়ে সমস্ত কাজ থেকে অবসর হয়ে তাদের জাগ্রত করবেন। তাদের নাস্তা করাবেন। অতঃপর মাদ্রাসায়/স্কুলে প্রেরণ করবেন। এমন করবেন না যে, নিজে তো রান্না ঘরের কাজে খুব ব্যস্ত আর ওখান থেকে চিৎকার দিয়ে বাচ্চাদের জাগ্রত করার দায়িত্ব পালন করছেন এবং বলেছেন, "জলদি ওঠো, দেরী হয়ে যাচ্ছে, ভ্যানগাড়ী এখুনি পৌঁছে যাবে। এখনও উঠনি? সকাল সাতটা বেজে গেছে", ইত্যাদি।

স্মরণ রাখবেন, এভাবে মা এবং সন্তানের সম্পর্ক গভীর হবে না। উভয়ের মাঝে আন্তরিক মুহাব্বত বৃদ্ধি পাবে না। এমনিভাবে মাদ্রাসা/স্কুল থেকে ফেরার পর সমস্ত কাজ ছেড়ে দিয়ে মায়ের কর্তব্য সন্তানদের অভ্যর্থনা করা, সালামের উত্তর দেওয়া, তাদের জন্য হালকা-ফুলকা নাস্তা বা পানাহারের ব্যবস্থা করা, দরওয়াজা দ্বারা ঘরে প্রবেশ করার দু'আ মুখস্থ করানো, খানা খাওয়ানোর সময় আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের শুকরিয়া শিখানো, কখনও জান্নাতের নিয়ামতের আলোচনা করা, কখনও নিজ হাতে সন্তানদের লুক্‌মা খাওয়ানো, কখনও নম্রতা, ভদ্রতার কথা এবং প্রিয় নবীজী (সাঃ)-এর আদর্শ শিক্ষা দেওয়া, ইত্যাদি। বড় হয়ে এ শিশু মায়ের এ কথাগুলো জীবনভর স্মরণ রাখবে। তাই আদর্শবান সন্তান সমাজকে

উপহার দিতে হলে আদর্শ মাকে কিছু সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস বিসর্জন দিতেই হবে। ফলশ্রুতিতে সন্তানের সম্পর্ক মায়ের সাথে গভীর হবে।

শিশুদের মিথ্যা বলার অভ্যাস দূর করার পদ্ধতি

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, একবার প্রিয় নবীজীর (সাঃ) দরবারে এমন এক লোকের আগমন ঘটল, যে অসংখ্য বদস্বভাবে অভ্যস্ত ছিল। সে মিথ্যা বলত, চুরি করত, মদ পান করত, জুয়া খেলত এবং এরূপ বিভিন্ন বদ গুণে গুণান্বিত ছিল। সে মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে আবেদন করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কোন তদবীর শিক্ষা দিন, যাতে আমার বদঅভ্যাস দূরীভূত হয়ে যায়। নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করলেন, 'তুমি সত্য কথা বলবে।' ঐ লোকটি চিন্তা করল যে, নবীজী (সাঃ) তো না চুরি করতে নিষেধ করলেন, না জুয়া খেলতে বারণ করলেন। এতদুভয়ের মধ্য হতে কোন একটি কাজও যদি নিষেধ করতেন, তাহলে মুশকিল হয়ে যেত। কিন্তু একটি জিনিষ থেকে অর্থাৎ মিথ্যা বলতে নিষেধ করেছেন। এতে তো তেমন কষ্ট নেই। এমন সহজ আমল করা আমার জন্য বহুত আছান। সুতরাং, ঐ ব্যক্তি খুশী হয়ে গেল এবং খুব দৃঢ়তার সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে গেল যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কখনও নিজ মুখ দ্বারা মিথ্যা কথা উচ্চারণ করব না, বরং সর্বদা সত্য কথা বলব। অঙ্গীকার করার তো করে গেল, কিন্তু যখন উল্লেখিত বদ কাজ করার সুযোগ এল, তখন বড় সমস্যায় নিপতিত হল। চুরি করার এরাদা হল, কিন্তু সাথে সাথে একথাও চিন্তা করতে থাকল যে, যদি আমি চুরি করি, তাহলে সত্য বলার ওয়াদা দেওয়ার কারণে আমাকে নিজ পাপের কথা স্বীকার করতে হবে এবং তার শাস্তি ভোগ করতে হবে। মদ পান করার সময় স্মরণ হল যে, আমি কোন মুখে নবীজীর (সাঃ) দরবারে মদ পান করার কথা স্বীকার করব? মোটকথা, ঐ ভয়ে চুরি এবং মদ পান করা থেকে দূরে থাকল। অতঃপর ধীরে ধীরে সত্য বলার বরকতে সমস্ত বদস্বভাব দূর হয়ে গেল। আর ঐ ব্যক্তি হয়ে গেল নেককার পরহেজগার।

উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, মিথ্যা বলা সমস্ত অনিষ্ট ও খারাপের মূল। যদি কাউকে সত্য বলতে উৎসাহিত করা যায় এবং মিথ্যা থেকে বিরত রাখা যায়, তাহলে অসংখ্য বদস্বভাব নিজে নিজেই দূর হয়ে যাবে। অভিজ্ঞতা দ্বারা একথা প্রমাণিত, যে অভ্যাস শিশুকালে জন্ম

নেয়, তা বৃদ্ধকালেও বিদ্যমান থাকে। পরে তা সীমাহীন প্রচেষ্টা করা সত্ত্বেও ছুটতে চায় না। তাই মায়ের জন্য কর্তব্য এই যে, প্রাণপ্রিয় শিশুদের অন্তরে মিথ্যা বলার অভ্যাস জন্ম নিতে দিবেন না। প্রারম্ভ থেকেই এমন সতর্কতার সাথে লালন-পালন করুন, যেন শিশু শৈশব থেকেই সত্য বলতে অভ্যস্ত হয়।

শিশুদের প্রহার করা ঠিক কি-না

অনেক মাতা-পিতা সন্তানদের নিজ কথা ও ইশারা-ইঙ্গিতে পরিচালিত করার জন্য মারপিট করে থাকেন এবং সব সময় ক্রোধান্বিত হয়ে শাসাতে থাকেন। এমন মাতা-পিতাকে একথা উপলব্ধি করা উচিত যে, বর্তমান যুগে সন্তানরা মারপিট দ্বারা পরিশুদ্ধির পরিবর্তে বিদ্রোহী হয়ে যাচ্ছে বেশী। যদি সকল সময় নরম ব্যবহার করা হয়, তাহলে মাথায় চড়ে বসে। তাই মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করাই বাঞ্ছনীয়। এ ক্ষেত্রে শিশুদের মানসিক হাবভাবের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। সন্তান প্রতিপালনে মাতা-পিতাকে শুরু থেকেই মধ্যপন্থা অবলম্বন করে সন্তান লালন-পালন করা শ্রেয়। এত কঠোরতা করাও উচিত নয় যে, বাচ্চা মার খেয়ে খেয়ে মার খাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। আর এত ছাড় দেওয়াও উচিত নয় যে, বাচ্চা মাথায় চড়ে বসে। সবচে' গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, শিশুদের সাথে অনর্থক, অযথা, অসময়ে পিয়ার-মুহাব্বত না করা। সময়-অসময়ে, খামাখা আদর-সোহাগে, পিয়ার-মুহাব্বতে সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। তাদের চরিত্রে ত্রুটি দেখা দেয়, আর স্বভাব হয়ে যায় লুচ্চাদের মত।

সন্তানকে প্রহার করার প্রাক্কালে ভেবে দেখুন, চিন্তা করুন, আপনি সন্তানকে কেন প্রহার করছেন? যাতে করে সে আপনার কথা মান্য করে, আপনার আদেশ অনুযায়ী চলে। প্রশ্ন এই যে, আপনারই প্রাণপ্রিয় সন্তান আপনার কথা কেন মান্য করছে না? এ জন্য যে, কথা মান্য করার শিক্ষা কেন দেননি? নাফরমানী করার বদঅভ্যাস সন্তান আপনাদের থেকেই শিক্ষা পেয়েছে। যদি তারা বাইরের পরিবেশ থেকে শিক্ষা লাভ করে থাকে, তাহলেও আপনারাই দায়ী। কারণ, খারাপ পরিবেশে এবং অসৎ সংশ্রবে মেলা-মেশা করার সুবর্ণ সুযোগ তাদের আপনারাই তো দিয়েছেন।

লক্ষ্ণীয় বিষয় এই যে, শিশুদের প্রহার করার প্রয়োজন তখন দেখা দেয়, যখন শিশু মাতা-পিতার মুখের আদেশ-নিষেধ অমান্য করে। কিন্তু

প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, কোন কোন শিশু তো মুখের আদেশ-নিষেধকে এমন পাবন্দী করে যে, প্রহার করার সুযোগই আসে না। পক্ষান্তরে অনেক বাচ্চা এমনও রয়েছে, যারা ডান্ডা ব্যতিত ঠান্ডাই হয় না। কোন কোন শিশু এমনও রয়েছে, যাদের অন্তরে হাজারও মার-পিট কোন প্রভাব ফেলে না।

ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, এ সবকিছু মাতা-পিতার লালন-পালন আর শিক্ষা-দীক্ষার ফল। সন্তানের সহজাত স্বভাবের কোন কারিশমা নয়। এই জন্য মাতা-পিতার কর্তব্য এই যে, নিজ সন্তানদের এমন সুন্দর পদ্ধতিতে প্রতিপালন করবেন যে, প্রয়োজনের সময় কেবল ইশারা যথেষ্ট হয়ে যায়, কঠোরতা আর লাঠা-লাঠির প্রয়োজন না পড়ে। সব সময় মার-পিট, ধমক, শাসন আর হাত চালালে শিশু তাতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। পরে কিন্তু কাবুতে রাখা যাবে না।

শিশুদেরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার পদ্ধতি

পূর্বের যামানায় মহিলারা শিশুদেরকে যখন কোন কাজ থেকে বিরত রাখতে ইচ্ছা করতেন, তখন শিশুদের সম্মুখে ঐ কাজের আসল অনিষ্টতা বর্ণনা করতেন না। যেমন পানির পাত্র উন্মুক্ত পড়ে থাকলে বলতেন, "বাচ্চারা! কলস উন্মুক্ত থাকতে দিওনা, শয়তান পানি পান করবে। খালী মাথায় পানাহার করোনা, শয়তান মস্তকে প্রহার করবে। নামায আদায় করে জায়নামায ভাজ করে রাখ, অন্যথায় শয়তান নামায পড়বে।" এ সমস্ত কথায় শিশুদের অন্তরে শয়তানের বিরুদ্ধে প্রচন্ড ক্ষোভ সৃষ্টি হত। কিন্তু ঐ কাজের অনিষ্টতার প্রকৃত হেতু সম্পর্কে অজানা থেকে যেত। এ পদ্ধতি বহুত ছোট এবং অবুঝ শিশুদের বেলায় প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু বুদ্ধিমান শিশুদের উল্লেখযোগ্য কোন ফায়েদা হয় না। তাদেরকে পরিস্কার ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, কলস বা ঘটী-বদনার মুখ উন্মুক্ত রাখলে মশা, মাছি, ধুলা-বালি ইত্যাদি ভিতরে প্রবেশ করবে। অতঃপর এ পানি পান করলে বিভিন্ন রোগ দেখা দিবে। এমনিভাবে খালী মস্তকে পানাহার করা অভদ্রতা এবং খানা খাওয়ার আদবের পরিপন্থী। এমনি ভাবে জায়নামায বিছিয়ে রাখলে ময়লা হয়ে যাবে। শিশুরা সেটার উপর ধুলা-বালি নিয়ে উঠবে। তখন জায়নামায নাপাক হয়ে যাবে।

এভাবে যখন ক্ষতি আর অনিষ্টতার প্রকৃত স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠবে, তখন শিশু প্রতিটি কাজ সতর্কতার সাথে করবে। তাই, মায়েদের কর্তব্য এই যে, তাঁরা প্রতিটি গর্হিত কাজের ক্ষতি ও অনিষ্টতার প্রকৃত স্বরূপ শিশুদের

সম্মুখে তুলে ধরবেন। আর আল্লাহ তা'আলার নিকট হাত তুলে দু'আ করবেন, হে আল্লাহ! আমার সন্তানদের তোমার হুকুম মানার এবং তোমার প্রিয় হাবীবের নূরানী ত্বরীকা অনুযায়ী জীবন যাপন করার তাউফীক দান করুন। ইনশাআল্লাহ এতে অনেক উপকার হবে।

শিশুদের আরবী ভাষার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করুন

প্রতিটি আদর্শ মায়ের একথা অবগত হওয়া উচিত যে, ইসলাম ধর্মে আরবী ভাষার কত গুরুত্ব। প্রিয় নবীজী (সাঃ) ইসলামের দাওয়াত আরবী ভাষায় আরম্ভ করেছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে আজ সমগ্র বিশ্ব জগতের দেশে-দেশে, শহরে-শহরে, গ্রামে-গ্রামে, মহল্লায়-মহল্লায় একাত্ববাদী মুসলমান বিদ্যমান। পবিত্র হাদীস শরীফে আরবী ভাষার মুহাব্বতের তাকীদ এসেছে। সুতরাং, মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেন, "তিন কারণে আরবী ভাষাকে ভালবাস। (১) পবিত্র কুরআনের ভাষা আরবী (২) জান্নাতের ভাষা আরবী (৩) আমার ভাষাও আরবী"।

সুতরাং, দুর্ভাগ্য বশতঃ যদি আপনি আরবী ভাষা না বুঝেন বা পড়তেও না পারেন, তাহলে কমপক্ষে নিজ সন্তানদের আরবী ভাষা শিক্ষা দিন। যাতে করে আপনার সন্তান কুরআন-হাদীসের হুকুম-আহকামকে সঠিক রূপে শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত যত দু'আ রয়েছে, সেগুলো হতে স্বল্প সংখ্যক হলেও যেন তার অর্থ বা ভাবার্থ বুঝতে পারে, হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, আমল করতে পারে। নিঃসন্দেহে বিশ্বের সকল ভাষাই আল্লাহ প্রদত্ত ভাষা। তাই তাঁর কোন ভাষা বুঝতে আমাদের মত অসুবিধা হয় না। তথাপি যে দু'আ আরবী ভাষায় করা হয়, আল্লাহ তা'আলা তাতে খুব খুশী হন।

কত আফসোস ও দুঃখের কথা, যেই মহান স্বত্ত্বা (সাঃ) আমাদের জন্য কত কষ্ট-যন্ত্রনা, নির্যাতন, নিপীড়ন অকাতরে সয়ে গেছেন। ক্রন্দন করে অশ্রুতে নয়নযুগল প্রবাহিত করে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করেছেন, আমাদেরকে জান্নাতে যাওয়ার সহজ ও সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন, আমরা সেই মহান স্বত্ত্বার প্রিয় আরবী ভাষা সম্পর্কে মোটেও অবগত নই। হুজুর আকরাম (সাঃ) স্বীয় পবিত্র হায়াতে যত ইরশাদ ফরমায়েছেন, সবই তো আরবী ভাষার। আমরা তাও অনুধাবন করতে এবং সেগুলোর অর্থ বুঝতে সক্ষম নই।

সুতরাং, সন্তানদেরকে শৈশবকাল হতেই আরবী ভাষা শিক্ষা দিন।

তাদের অন্তরে আরবী ভাষার প্রতি মুহাব্বত, ভক্তি-শ্রদ্ধা সৃষ্টি করুন এবং তাদের হৃদয়ে এ উপলব্ধি জাগ্রত করুন যে, তোমাদেরকে নবীজীর (সাঃ) প্রিয় আরবী ভাষা শিক্ষা করা এবং বুঝা খুবই প্রয়োজন। যাতে করে বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজা ও আবু দাউদ সহ হাদীস গ্রন্থের হাদীস সমূহের অর্থ বুঝার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

শিশুদের ভাল কাজের প্রসংশা করুন

শিশুরা হল তারুণ্যের প্রদীপ্ত ভাস্কর। যদি তাদের ভাল কাজ-কর্মের ভূয়সী প্রসংশা করা হয়, তাহলে তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। অতঃপর এমন প্রসংশনীয় কাজ করার আগ্রহ তাদের অন্তরে জাগ্রত হয়। যদি তাদের ভাল ও প্রসংশনীয় কর্ম-কান্ডের যথার্থ মূল্যায়ন করা না হয়, তাহলে তারা হতোদ্দ্যম ও নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। উদ্যোগ-উদ্দীপনা আর আগ্রহের জোয়ারে ভাটা পড়ে যায়। অসংখ্য লোক মুর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা হেতু শিশুদের ভাল কাজের প্রশংসা তো দূরের কথা, উল্টো ধমক দিয়ে, শাসন করে তাদের আগ্রহ, উৎসাহকে নিঃশেষ করে দেয়। আর মনে মনে ভাবে, এমন আচরণে ওরা আগামীতে আরো ভাল ভাল কর্মকান্ডে উৎসাহী হবে। কিন্তু এমন বুদ্ধিহীন মাতা-পিতার ধারণা নির্ঘাত ভুল। এতে কর্মোদ্দম ধ্বংস হয়ে হৃদয়-ভেঙ্গে যায়। এমনিভাবে শিশু যদি কোন গর্হিত ও আপত্তিকর বা মন্দ কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়, তাহলে সে মন্দ কাজের অনিষ্টতা ও ক্ষতিকর দিকটি শিশুর সম্মুখে তুলে ধরতে হবে। লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, যত্রতত্র, সময়ে-অসময়ে শিশুর প্রশংসা করা উচিত নয়। অন্যথায় কাজ না করেই প্রশংসার অমীয় বাণী শ্রবণ করার অপেক্ষায় থাকবে। বরং ভাল কাজের এমন ভাবে প্রশংসা করতে হবে, যেন সে মহান আল্লাহ তা'আলার শুকরগুজার হয়ে যায়। উপমাস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বৎস! লক্ষ্য কর, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কত বড় নিয়ামত দান করেছেন, মা-শা-আল্লাহ তোমার স্মরণ শক্তি কত ভাল, কত স্বচ্ছ। লক্ষ্য কর, তুমি অমুক প্রশ্নের উত্তর কত সুন্দর ভাবে দিয়েছ। আল্লাহ তা'আলাই তোমার অন্তরে উত্তর জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আদায় কর।

এমনিভাবে মাতা-পিতার কর্তব্য এই যে, শিশুদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার উপর পরিপূর্ণ ভরসা এবং আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার মন-মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে।

ছোট শিশুদের বারবার প্রশ্নের কারণ কি

এটা কুদরতী বিষয় যে, শিশুর মধ্যে যখন উপলব্ধি শক্তির আবির্ভাব ঘটে এবং নিজের চারিধারে, আশেপাশে নতুন নতুন বস্তু, যেমন চন্দ্র, সূর্য, নভোমন্ডল, ভূমন্ডল, নক্ষত্ররাজি অবলোকন করে এবং দিবা, নিশি, সকাল-সাঁঝ, দিন, সপ্তাহ, মাস ও বৎসরের পরিবর্তন, আবর্তন, বিবর্তন, চড়াই-উৎরাই, এমনিভাবে আবহাওয়া ও ঋতুর ওলট-পালট সহ আরো অন্যান্য চমৎকার ও আকর্ষণীয় বস্তু সে প্রত্যক্ষ করে, তখন যাচাই-বাছাই করার আকাঙ্খা এবং ঐ বস্তুর তত্ত্বভেদ ও কারণ উদঘাটন করার জন্য ব্যাকুল হয়ে যায়। আর মা জননীকে সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞানী মনে করে বার বার প্রশ্ন করতে থাকে। সে এক্বীনের সাথে মনে করে যে, তার মায়ের চেয়ে জ্ঞানবতী আর কেউ নেই। এই জন্য সে তার মাকে বার বার প্রশ্ন করে নিজের অজানাকে জানতে চায়। সৌভাগ্য বশতঃ মা যদি ঐ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে অবগত হন এবং ঐ সমস্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেন, তাহলে তো শিশুর কুদরতী স্পৃহা ও চাহিদা অনুযায়ী প্রত্যেক বস্তুর হাক্বীক্বত ও তত্ত্বভেদ স্বীয় বিবেক মাফিক বর্ণনা করতে পারেন। সুযোগ মাফিক কেচ্ছা-কাহিনী, শিক্ষা মূলক, উপদেশ মূলক গল্প শুনিয়ে শিশুদের চিন্তা-চেতনা ও আখলাক-চরিত্রের প্রতিপালন করতে পারেন। বড়দের, বৃদ্ধদের প্রতি আদব শিক্ষা দিতে পারেন। আত্মীয় ও প্রতিবেশীর পার্থক্য বুঝাতে পারেন। তাদের ইজ্জত-সম্মান করা ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি লক্ষ্য রাখার শিক্ষা দিতে পারেন। জ্ঞানবতী মা বুঝতে পারেন, চন্দ্র কি জিনিষ, সূর্য কি জিনিষ, প্রভাত কিভাবে হয়, সন্ধ্যা কিভাবে হয়, রাত্র হওয়ার সাথে সূর্য কোথায় পালিয়ে যায়, অন্ধকার কেন বিশ্ব জগতকে আচ্ছাদিত করে? এমনিভাবে শিক্ষা ও আলোচনা দ্বারা শিশু অকাল্পনিক উন্নতি করতে পারবে এবং মাদ্রাসা বা স্কুলে যাওয়ার পূর্বেই তার নিকট জ্ঞান-বিজ্ঞানের এত বিশাল ভান্ডার একত্রিত হয়ে যাবে যে, অন্য শিশুরা যে কাজ দু'বৎসরে করবে, সে ঐ কাজ ছয় মাসে করতে পারবে। কিন্তু মা যদি শিক্ষাপ্রাপ্তা না হন, সম্ভ্রান্ত পরিবারে লালিত-পালিত না হন, আর অজ্ঞতার কারণে শিশুকে উত্তর দেন যে, চাঁদের ভিতর যে দাগ-ধাব্বা দৃষ্ট হয়, সেখানে একজন বুড়িমা বসে বসে চরখায় সুতা কাটছে। আর ভূমিকম্পের কারণ হল, পৃথিবীটা পাতালে অবস্থিত গাভীর একটি শিঙ্গের উপর (রাখা অবস্থায়) অবস্থান করছে। গাভীটি যখন ক্লান্ত হয়ে যায়, তখন পৃথিবীকে অপর শিঙ্গে নিয়ে যায়। আর তখনই ভূমিকম্প হয়। অথবা বলে যে, শিশুদের তাড়াতাড়ি বড় হওয়ার উপায় হল বেশী বেশী ভাত খাওয়া, ইত্যাদি। এখন আপনিই বলুন, এমন আজগুবী কথায় শিশুর জ্ঞানের ভান্ডারে কতটুকু জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে?

এমনি ভাবে মা যদি বদ মেজাজ, একরোখা হন, আর শিশুর বার বার প্রশ্ন শুনে খেকানী দিয়ে তাড়ি মারেন, তাহলে শিশু পুনর্বার প্রশ্ন করার হিম্মত হারিয়ে ফেলে। এতে শিশুর জ্ঞান-গভীরতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। অধিকন্তু, নিত্য নতুন কথা জানার উৎসাহ নিঃশেষ হয়ে যায়। যার পূর্ণ দায়-দায়িত্ব বুদ্ধীহীন মায়ের উপরই বর্তায়।

জ্ঞানবতী, গুণবতী মায়েদের স্মরণ রাখা উচিত যে, শিশুদের প্রশ্নের উত্তর সর্বদা এমন পদ্ধতিতে দেওয়া চাই, যাতে করে শিশুর মনটা শান্ত হয়। যদি কোন প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানা না থাকে, তাহলে শিশুকে পরিস্কার ভাষায় বলে দেওয়া যে, আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর অমুক সময় বলব। অতঃপর কিতাব, বই-পুস্তক অধ্যায়ন করে অথবা কোন আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করে, উত্তর দিয়ে, শিশুর উৎসাহকে জাগ্রত রাখতে হবে।

আপনার শিশু কি লেখা-পড়ায় অমনোযোগী?

প্রত্যেক মাতা-পিতার আন্তরিক আকাঙ্খা আর হৃদয়ের গভীরে গচ্ছিত একান্ত কামনা এটাই হয় যে, তাদের সন্তান লেখা-পড়া শিক্ষা করে সমাজে বিদ্বানরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু সকল শিশু মাতা-পিতার আকাঙ্খা পূর্ণ করতে পারে না। কিছু কিছু শিশু এমনও রয়েছে, যারা সামান্য গাইডের অভাবে ভাল স্কুল এবং নামী-দামী, প্রসিদ্ধ কোচিং সেন্টারে লেখা পড়া করার পরও আশানুরূপ ভাল নাম্বার অর্জন করতে পারে না। এ সমস্ত শিশুদের প্রতি যদি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়, তাহলে তারাও অন্যান্য মেধাবী শিশুদের মত উত্তম ফলাফল অর্জন করতে পারবে।

আমাদের সমাজে সাধারণতঃ এরূপ আচরণ পরিলক্ষিত হয় যে, অ-মেধাবী শিশুদের প্রতি বিশেষ ভাবে যত্ন নেয়ার পরিবর্তে তাদের মাতা-পিতা, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ বিভিন্ন প্রকার অপশব্দ দ্বারা কু-উপাধিতে ভূষিত করেন। উপমা স্বরূপ, "এই ছেলেটা বড় লাপরওয়াহ," "কি জানি এর ধ্যান-খেয়াল সব সময় কোন দিকে থাকে।" "এমনিতে তো খুব চালক-চতুর, অন্যের দোষ ত্রুটি তালাশে চৌকান্না", "খেলা-ধুলায় নাম্বার ওয়ান" "ঝগড়া-ঝাটি, মারা-মারিতে জুড়ি নেই।" "পড়া লেখায় ঠন-ঠন"

"মাথায় মনে হয় গোবর ছাড়া আর কিছু নেই" "এত বলি, কিন্তু এতটুকুও লজ্জা হয় না", ইত্যাদি। কখনও আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী এবং শিশুর বন্ধু-বান্ধবদের সম্মুখে এ অপমানজনক বাক্যগুলো পুনরাবৃতি করা হয় যে, "এ বাচ্চা তো আমাদের মান-ইজ্জত সব ডুবাল," নাক কাটিয়ে ছাড়ল।" এবার যদি ফেল কর তাহলে মনে রেখ, কোথাও তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাব না। ভাল কাপড় কিনে দিব না। ঘরে তালা মেরে রেখে দিব। লজ্জা কর, শরম কর। তোমার অন্যান্য বন্ধুরা কত ভাল নাম্বার পেয়ে পাস করেছে। তোমার মত অকর্মন্য ছেলে আর কেউ নেই", ইত্যাদি।

এমন কথা যে সমস্ত মাতা-পিতা ও শিক্ষক, শিক্ষিকাগণ বলেন, তাদের ধারণা খুব সম্ভব এই যে, এ পদ্ধতিতে ধমক-শাসন ও গালমন্দ করলে শিশুদের উপর সুপ্রভাব পড়বে এবং তারা পড়ার প্রতি মনোযোগ দিবে। কিন্তু এরূপ ধারণা তাদের খামখেয়ালীপনা আর আকাশ-কুসুম স্বপ্ন ছাড়া কিছুই না। এ ধরনের কথা বা আচরণে শিশুর ব্যক্তিত্বে কুপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তার আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং সে উত্তেজনার শিকার ও দুশ্চিন্তার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। অধিকন্তু, মাতা-পিতার পক্ষ থেকে সান্ত্বনা, সাবাসী ও আশ্রয়ের পরিবর্তে তাদেরই পক্ষ থেকে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে। তার হৃদয় গভীরে গুপ্ত অপরাধপ্রবণতা ও নেতীবাচক যোগ্যতাসমূহ জাগ্রত হতে থাকে। তখন সে একাকিত্বতা পছন্দ করে। বদমেজাজী ও একরোখাপনা তার মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকে। এমন অনেক শিশুকে বার বার একথা বলতে শোনা গেছে যে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিই খারাপ। আল্লাহ্ যেন আমার মরণ দেয়। আমাকে যেন কলেরায় পায়।

যদি আপনার শিশুর মধ্যে উল্লেখিত স্বভাব পাওয়া যায়, তাহলে আপনি শিশুকে অপরাধী ও দোষী সাব্যস্ত করবেন না। ঐ স্বভাবের জন্য তার বিবেক, বুদ্ধি, উপলব্ধিশক্তি ও চৈতন্যবোধের কোন ক্ষমতা নেই। তার অপরাধ শুধু এতটুকু যে, সে নিজের সমস্ত প্রজ্ঞা, প্রতিভা ও আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও ঐ রকম কিছু অগ্রগতি, উন্নতি ও সুফল অর্জন করতে পারছে না, যে রকম তাকে নিয়ে আপনার অন্তরে আকাশ-কুসুম আশা। এমন শিশুর মধ্যে পড়া মুখস্থ করার অযোগ্যতা প্রাকৃতিক ভাবে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ায়। আর যে জিনিস শিশুর মধ্যে প্রাকৃতিক ভাবে সল্প হয়, তার উত্তম-বদলা বিভিন্ন পন্থায় অর্জন করা যেতে পারে।

১৯৬৩ ইংরেজীতে নিউইয়র্কে শিশুদের মাতা-পিতার এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল, "শিশুদের লেখা-পড়ায় অমনোযোগিতার কারণ।" সম্মেলনে ঐ সমস্ত শিশুদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যাদের মধ্যে মেধাগত যোগ্যতা রয়েছে বটে, কিন্তু পড়া মুখস্ত করার পথে সামান্য অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়।

শিশুদের মধ্যে প্রাপ্ত অমনোযাগিতা ও অসুবিধার প্রকারভেদ – (১) মুখস্ত হওয়ার পথে অসুবিধা, (২) পড়া বুঝতে অসুবিধা, (৩) হস্তলিপি সুন্দর করার পথে অসুবিধা, (৪) শিক্ষাজনিত সমস্যা নিজে নিজে সমাধানের পথে অসুবিধা, (৫) বার বার পড়া বা লেখার পরও মনে না থাকা।

উল্লেখিত অসুবিধা ও সমস্যাগুলো যদি বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোন সুস্থ-সবল শিশুর মধ্যে পাওয়া যায়, তাহলে মাতা-পিতার কর্তব্য এই যে, ঐ শিশুর সাথে নিম্নে বর্ণিত আচরণ ও সতর্কতা অলম্বন করা ঃ

(১) এমন শিশুকে কখনও অন্য শিশুর সাথে তুলনা না করা।

(২) এমন শিশুকে যখন-তখন ও সদা-সর্বদা না ধমকানো।

(৩) এমন শিশুর জন্য তিরস্কার বা ভর্ৎসনার পথ অবলম্বন না করা। বিশেষ ভাবে তাকে অপমানচ্ছলে তার ব্যক্তিত্বকে তুচ্ছজ্ঞান না করা।

তাই আদর্শ মাকে বলছি যে, সামান্য সুদৃষ্টি, সামান্য যত্নের ফলশ্রুতিতে আপনার ঐ-ই শিশু, যাকে মেধাহীন, অকেজো জ্ঞান করছেন, সে অন্যান্য মেধাবী শিশুদের মত ভাল ও প্রশংসনীয় যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারে। সুতরাং, আপনার কর্তব্য হল এই যে, কাল বিলম্ব না করে কোন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ বা শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হোন। অধিকন্তু, দ্বীনদার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বুযুর্গ অথবা অভিজ্ঞ আলেমেদ্বীন ও মুফতী সাহেবের সাথে পরামর্শ করুন। যাতে করে সঠিক রোগ নির্ণয়ের পর শিশুর মধ্যে বিদ্যমান লেখা-পড়ায় অমনোযোগীভাব, শিক্ষা-দীক্ষায় অনীহা, পড়া মুখস্ত হওয়ার পথে বাঁধাসমূহকে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি ও পন্থার মাধ্যমে যদিও বা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করা যাবে না ঠিক, কিন্তু কিছু কম তো করা যাবে ইনশাআল্লাহ। স্মরণ রাখুন, এমন শিশু যাদের আলোচনা আমরা পূর্বে করেছি, তারা কিন্তু বিশেষ দৃষ্টি, বিশেষ যত্ন ও বিশেষ খেয়ালের আকাঙ্খী হয়। যদি আপনি সাংসারিক কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকেন, তাহলে সন্তানের ভবিষ্যৎ উন্নতি, অগ্রগতি ও সুন্দর ভবিষ্যতের স্বার্থে ব্যস্ততা পরিহার করুন এবং শিশুর প্রতি যত্নশীল হোন। এটা আপনার ধর্মীয়, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। বহুবার প্রমাণিত হয়েছে যে, শিশু অমনোযোগী ও মেধাহীন

হওয়ার অন্য কোন কারণ নেই, শুধুমাত্র মাতা-পিতা, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনের অযথা অনর্থক পিয়ার মুহাব্বত ছাড়া। অথবা শিশুকাল থেকে সময়ে-অসময়ে কিছু না কিছু খাওয়াতে থাকা। বুযুর্গগণ লিখেছেন, অল্প বয়সের শিশুরা মাত্রাতিরিক্ত পানাহার করলে স্মরণশক্তি, মেধাশক্তি লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। (ফাযায়িলে সাদাকাত)

কুপরিবেশ থেকে সন্তানকে হিফাযত করুন

কোন কোন মাতা-পিতা গৃহাভ্যান্তরে তো শিশুদের প্রতি খুব কড়া দৃষ্টি রাখেন, কিন্তু গৃহের বাইরে তার পরিবেশ ও বন্ধু বান্ধবদের আখলাক-চরিত্র কেমন? তার খোঁজ-খবর রাখেন না। কখনও নিজেদের বিশ্রাম ও আরামের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিশুদেরকে বাইরের পরিবেশের নোংড়া ছেলেদের সাথে খেলা-ধুলা করার জন্য গৃহের বাইরে পাঠিয়ে দেন এবং নিজেরা প্রশান্তি লাভ করেন। স্মরণ রাখাবেন, গৃহের পরিবেশ শিশুর প্রতিপালনের উপর যদি ৭৫% প্রভাব বিস্তার করে তো বাইরের নোংড়া ও অনৈসলামিক পরিবেশ এবং অসৎ বন্ধু-বান্ধবদের সংশ্রব নিঃসন্দেহে ২৫% কুপ্রভাব তাদেরকে আচ্ছাদিত করবে। এ ব্যাপারে নীরব ভূমিকা অথবা বেপরওয়াভাব প্রদর্শন করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। বরং এ কথার প্রতি গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সন্তান কোন ধরণের পরিবেশের সাথে উঠা-বসা, চলা-ফেরা ও মেলা-মেশা করে এবং তার বন্ধু-বান্ধুর কেমন অর্থাৎ আখলাক-চরিত্র, লেন-দেন ও পারিবারিক পরিবেশ কেমন? একথার প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক যে, আপনার সন্তান যেন ঐ সমস্ত ছেলেদের সাথে মেলা-মেশা করে, যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে অভ্যস্ত, নেক কথা, নেক আমল করতে অভ্যস্ত, অশ্লীল কথা-বার্তা, মিথ্যা, পরনিন্দা, হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানী সহ সকল প্রকার শরীয়ত বিরোধী কার্য কলাপ হতে বিরত থাকে। টি, ভি, ডিশ এন্টেনার প্রোগ্রাম এবং ভি,ডি,ও গেমসের দোকানের ধারে-কাছেও যায় না। আর কন্যা সন্তান হলে এমন মেয়েদের সাথে যেন সম্পর্ক রাখে, যারা শিশুকাল থেকে পর্দা বিধানে পাবন্দী করে। তাই যে কোন মূল্যের বিনিময়ে হলেও নিজ সন্তানদের জন্য বুদ্ধিমান, দ্বীনদার জ্ঞানী-গুণী এবং খোদাভীরু সাথী মনোনিত করুন। বুদ্ধিমান এবং খোদাভীরু সাথী-সঙ্গী দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মা নিজ সন্তানের

জন্য এমন সাথী/বান্ধবী মনোনীত করবেন, যে নেক, সৎ, আমানতদার, দিয়ানতদার, ইসলামী জ্ঞান, শিক্ষা-সাংস্কৃতির অলংকারে অলংকৃত এবং অন্যান্য শিশুদের থেকে বিবেক-বুদ্ধি-চেতনায় স্বতন্ত্র।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সন্তান যদি গর্ধভ, বোকা, মুর্খ ও ইসলাম বিদ্বেষী বন্ধুদের সাথে মেলা-মেশা, চলা-ফেরা করে, তাহলে অবশ্যই অবশ্যই সেও বে-ওকুফ, মুর্খ ও ইসলাম বিদ্বেষী হয়ে যাবে। আর যখন সন্তানের চলাফেরা, মেলা-মেশা এমন ছেলেদের সাথে হবে, যারা ইসলামের হাক্বীকত, শরীয়তের বিধি-বিধান, মানবজাতি-মুসলিম বিশ্ব এবং জগতে বসবাসকারী অন্যান্য জাতি সম্পর্কে, ইসলামের রীতি-নীতি সম্পর্কে অবগত হবে, তখন সেও তাদের সুপ্রভাবে জ্ঞানী-গুণী ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবে।

সুতরাং সাথী-সঙ্গী নেক, সৎ, নামাযী হওয়ার সাথে সাথে এটাও আবশ্যক যে, সে সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত, চালাক, চতুর ও মেধাবী। বরং এটাও আবশ্যক যে, দ্বীনদার, খোদাভীরু হওয়ার সাথে সাথে জ্ঞানে পরিপক্কতা, পারিপার্শ্বিক, সামাজিক নিয়ম-নীতির এবং ইসলামী জ্ঞান গভীরতার অধিকারী হতে হবে। যাতে করে সেও যেন সাথীদের সর্ব প্রকার মহৎ গুণে গুণান্বিত হয়ে তাদের সমপর্যায়ে পৌছে মুত্তাকী পরহেযগার হিসেবে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

অতীত যুগের একটি প্রবাদ বাক্য প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, اَلصَّاحِبُ سَاحِبٌ। অর্থাৎ সাথী সাথীকে নিজের দিকেই আকৃষ্ট করে।

জ্ঞানী-গুণী ও ইসলামী বুদ্ধিজীবীগণ বলেন, "আমার নিকট প্রশ্ন করোনা যে, আমি কে? বরং এ কথা জিজ্ঞাসা কর যে, আমার বন্ধু-বান্ধব কারা, কাদের সাথে আমি থাকি? এতেই তুমি চিনতে পারবে, বুঝতে পারবে, আমি কে?"

তালীমুল মুতা'আল্লিম নামক গ্রন্থে এ বিষয় ভিত্তিক একটি কবিতা উল্লেখিত হয়েছে,

عَنِ الْمَرْءِ لا تَسْئَلْ وَ سَلْ عَنْ قَرِيْنِهٖ ※ فَكُلُّ قَرِيْنٍ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِىْ

অর্থ ঃ কোন ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে তার নিকট জিজ্ঞাসা করোনা। বরং তার সাথী-সঙ্গী, বন্ধু-বান্ধব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর যে, তারা কেমন? কারণ, এক বন্ধু অন্য বন্ধুর অনুকরণ, অনুসরণ করে থাকে।

এ বিষয়ে হযরত মহানবী (সাঃ)-এর একটি হাদীস যথার্থ প্রযোজ্য। ইমাম তিরমিযী (রঃ) স্বীয় হাদীসগ্রন্থ তিরমিযী শরীফে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ঃ

اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَّنْ يُّخَالِلُ

অর্থাৎ মানুষ স্বীয় বন্ধুর পথ মতই চলে। তাই তোমাদের প্রত্যেককে লক্ষ্য করতে হবে যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে।

সুতরাং মাকে এ অত্যাবশ্যক কথাটি বিবেক দিয়ে, অন্তর দিয়ে, অনুধাবন করতে হবে যে, যখন সন্তানের মধ্যে অনুভবশক্তি, উপলব্ধি শক্তি ও চৈতন্যবোধ জাগ্রত হবে তখন তার জন্য একজন নেক, সৎ, দ্বীনদার, খোদাভীরু ও বুদ্ধিমান বন্ধু নির্বাচিত করে দিবেন। যে বন্ধু তাকে ইসলামের হাকীকত বুঝাবে এবং ইসলামের আরকান ও মূলভিত্তি কি কি? তা শিক্ষা দিবে। শিশুকে ইসলামের আদি-অন্ত, আদ্য-পান্ত ও মৌলিক বিষয়াদির শিক্ষা দ্বারা আলোকিত করুন এবং দ্বীনের সহীহ ও সঠিক রূপরেখা তার সম্মুখে তুলে ধরুন। মনে রাখবেন, আপনার কন্যা সন্তানের বান্ধবীরা যেমন চরিত্রের, যেমন স্বভাবের হবে অথবা আপনার পুত্র সন্তানদের বন্ধু-বান্ধব যেমন হবে, হুবহু আপনার সন্তানরাও তেমন হবে। সুতরাং নিজ সন্তানদের প্রতি বাইরের পরিবেশ ও বন্ধু-বান্ধবদের স্বভাব-চরিত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে খুব সতর্কদৃষ্টি রাখুন। সন্তানদের শিশুকাল থেকে দ্বীনের মুবাল্লেগরূপে গড়ে তুলুন। সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করায় অভ্যস্ত করুন। যাতে করে শৈশব থেকেই সন্তান অন্যান্য শিশুদের সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধকারী হয়ে যায়। একথা স্পষ্ট যে, যখন সে কোন অসৎ কাজ থেকে অপরকে বাধা দিবে, তখন সে নিজেও সে কাজ থেকে বিরত থাকবে। আর মানুষকে যে কাজের দাওয়াত দিবে, প্রথমে নিজে তার উপর অবশ্যই আমল করবে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, আমাদের সমাজে মাতা-পিতার জন্য একটি বিরাট সমস্যা এই যে, তারা বিষয়টি নিজ সন্তানদেরকে বলতে বা তাদের সম্মুখে আলোচনা করতে খুব লজ্জা অনুভব করেন। আর ঐ লজ্জার কারণে সন্তানদেরকে শরীয়তের মাসআলা-মাসায়িল সম্পর্কেও অনবগত রাখেন। তাঁরা এই ধারণা করে ক্ষান্ত হন যে, যখন বড় হবে, তখন নিজে

নিজেই জেনে নিবে। বলা-কওয়ার প্রয়োজন নেই। এহেন শরম আর লজ্জার ফলাফল এই দাড়ায় যে, শিশুরা যৌবনের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যখন নিজ দেহাবয়বের কিছু পরিবর্তন উপলব্ধি করে, তখন ঐ পরিবর্তনের হেতু জানার পুলকে মনটা আনচান করে। উৎসুক ও কৌতুহল প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠে। কিন্তু মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, উস্তাদ-শিক্ষক, চাচী-মামী, ফুফু-খালা কারো নিকট মনের জ্বালা ব্যক্ত করার হিম্মত হয় না। অগত্যা, ত্যক্ত হয়ে মনের দ্বিধা-দন্দ্ব মাড়িয়ে সংবাদ-পত্র বিক্রয় কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে, বুকের সাহস বাড়িয়ে দু'একটি "যৌবনের ঢেউ", "সকিনার প্রেম", "জীবনের প্রথম প্রেম" মার্কা অশ্লীল ও নোংড়া বই বা পত্রিকা অথবা চরিত্রহীন অল্প বয়স্ক বন্ধু-বান্ধব দ্বারা হেতু এবং তথ্য সংগ্রহ করতে থাকে। এতে হিতে বিপরিত হয়ে সন্তান বদস্বভাবী ও চারিত্রহীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশী।

সুতরাং আমাদের অনুরোধ আদর্শ মাতা-পিতার নিকট এই যে, যখনই আপনারা উপলব্ধি করবেন, আপনার শিশু সাবালক হওয়ার নিকটবর্তী বয়সে পৌঁছে গেছে তখনই তাদের জন্য "বেহেশতী জেওর" সহ মাসআলা-মাসায়িলের বিভিন্ন কিতাবসমূহ অধ্যায়নের জন্য পেশ করুন এতে তাদের বিচলিত মনের খটকা, উৎসুক প্রাণের ঝটকা দূরীভূত হয়ে যাবে। অধিকন্তু, পেরেশানী এবং নোংড়া ও চরিত্রহীন দোস্তদের নিকট জিজ্ঞাসা করার আপদ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। বালেগ হওয়ার পর পাকী-নাপাকীর হুকুম আহকাম সম্পর্কে অবগত হয়ে যাবে। উপরন্তু আখেরাতে আপনার নাজাতের মাধ্যম এবং আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্টকারী হয়ে যাবে।

শিশুদের জন্য ছোট্ট একটি পাঠাগার তৈরী করুন

আদর্শ মাতা-পিতার জন্য কর্তব্য এই যে, যখন শিশু লেখা-পড়ার বয়সে পৌঁছবে, তখন তার জন্য ছোট্ট ছোট্ট এমন কিছু কিতাব বা পুস্তিকা নির্বাচিত করবেন, যা শিশুকে শৈশব থেকে ধার্মিকরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক হয় এবং ঐ কিতাবের বরকতে তার অন্তরে আল্লাহ এবং রাসূলের (সাঃ) মুহাব্বত সৃষ্টি হয়। এছাড়া ভাল-ভাল এবং প্রশংসনীয় গুণের

অধিকারী হতে এবং অপছন্দনীয়, গর্হিত, বিবর্জিত মন্দ গুণসমূহ থেকে বিরত থাকতে পারে।

এমনিভাবে শিশুদের মধ্যে লেখা-লেখি করার যথেষ্ট সখ ও উৎসাহ থাকে। তাই তারা লেখা-লেখি করার কাজগুলো বড় সখের সাথে করে। এ জন্য শিশুদেরকে সাহাবায়ে কিরামের ঈমানদীপ্ত কাহিনী সহজ-সরল-প্রাল ভাষায় লিখে তাদেরকে বলুন, বৎস! তুমি লিখ। এমনিভাবে নূরানী কায়েদা ও আম্মপারাও শিশুর দ্বারা লিখাবেন। মাদ্রাসা বা স্কুলে যে ছবক পড়বে, বাড়ীতে এসে খাতায় তা লিখতে দিবেন। শিশুর সবচে' বড় উপকার এই যে, আরবী ভাষা লিখায় অভ্যস্ত হয়ে যাবে এবং কুরআনের হাফেয হওয়া সহজ হয়ে যাবে। এরপর ভাই-বোনদের মাঝে হস্তাক্ষরের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করুন। যার হস্তলিপি স্বচ্ছ ও সুন্দর তাকে হালকা উপহার দিয়ে পুরস্কৃত করুন। এতে শিশু কাজে ব্যস্ত থাকবে এবং প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করতে থাকবে। অতঃপর কিতাবে যা কিছু পড়েছে, তা তাদের মুখ দ্বারা বলানোর ব্যবস্থা করুন। আল্লাহর নিরানব্বই নাম কে শুনাতে পারে? জিজ্ঞাসা করুন। নিরানব্বই নাম কে লিখতে পারে? কে অর্থ বলতে পারে? কে ভাল ভাল ইসলামী কবিতা মুখস্থ বলতে পারে? আরবী দিনের নাম, মাসের নাম কে লিখতে পারে? কে শুনাতে পারে? আয়াতুল কুরছী, দু'আয়ে কুনুত, আত্তাহিয়্যাতু, সুরা ইয়াসীন, সুরা আর রাহমান মুখস্থ কে শুনাতে পারবে? বলতে পারবে? জিজ্ঞাসা করুন। যে ভালভাবে বলতে পারবে, লিখতে পারবে তাকে উপহার দিয়ে উৎসাহিত করুন। সন্তানকে কাপড়, প্রসাধনী সামগ্রী, খাদ্য দ্রব্য উপহার না দিয়ে বেশী বেশী করে বই উপহার দিবেন। তাই উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত বই-পুস্তক সংগ্রহের জন্য শিশুদের জন্য একটি ছোট্ট পাঠাগার তৈরী করুন। কমপক্ষে ছোট্ট একটি বুক সেল্‌ফ হলেও তৈরী করে দিন। আপনার শিশুদের পাঠাগারের জন্য কিছু কিতাবের লিষ্ট দিচ্ছি। নিজ সামর্থ অনুযায়ী কিতাবগুলো ক্রয় করে সংগ্রহ করুন।

কিতাবের নাম	লেখকের নাম/ প্রকাশক
★ বেহেশতী জেওর	হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ)
★ বেহেশতী গাওহার	
★ মাজালিসে আবরার	শাহ আবরারুল হক (হরদুয়ী হযরত)
★ পেয়ারা নবী নূরানী জীবন	হযরত থানভী (রহঃ)
★ পর্দা কি ও কেন	নোমান প্রকাশনী
★ তোহফায়ে আবরার	হরদূয়ী হযরত
★ মহিলা সাহাবীয়াদের জীবনী	মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব
★ কিতাবুল ঈমান	মুফতী মানসুরুল হক
★ নারী জন্মের আনন্দ	মুফতী রুহুল আমীন যশোরী
★ কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফযীলত	মাওলানা কামরুল ইসলাম
★ নবীজীর দৈনন্দিন জীবন	মাওলানা নোমান আহমদ
★ গুনাহে জারিয়াহ	মুফতী রুহুল আমীন যশোরী
★ সুখী পরিবারের রূপরেখা	মুফতী মিযানুর রহমান কাসেমী
★ বড়দের ছোট বেলা	মাওঃ হাসান সিদ্দীকুর রহমান
★ ইসলামের দৃষ্টিতে মিলাদ	মুফতী রুহুল আমীন যশোরী
★ চমৎকার ঘটনাবলী	মুফতী আবুল হাসান শরীয়তপুরী
★ কুরআনের ইতিহাস	মাওলানা কামরুল ইসলাম
★ ফাযায়িলে দরূদ শরীফ	মুফতী রুহুল আমীন যশোরী
★ ছোটদের প্রিয় নবী	শাব্বির আহমদ শিবলী
★ যাদু ও জ্যোতিষ বিদ্যা	মুফতী রুহুল আমীন যশোরী
★ ছোটদের প্রিয় গল্প	মুফতী আবুল হাসান শরীয়তপুরী
★ আহকামে যিন্দেগী	মাওলানা হেমায়েত সাহেব
★ ছহীহ আক্বীদা বিশ্বাস	মুফতী রুহুল আমীন যশোরী
★ সোনালী যুগের স্বর্ণ মানব	মুহাম্মদ ফায়েকুদ্দীন
★ হক্বের দাওয়াত	মাওলানা মাহমুদুল হাসান
★ কবরের জীবন	মাওলানা মোহাম্মদ ঈসা
★ নব বধুর উপহার	মুফতী রুহুল আমীন যশোরী
★ গল্প পড়ি জীবন গড়ি	মুফতী আবুল হাসান শরীয়ত পুরী
★ মাসায়িল সিজদায়ে সাহো	মুফতী রুহুল আমীন যশোরী
★ তাবলীগে দ্বীন	
★ মুমিন মুনাফিক	ত্বকী উসমানী
★ মৃত্যুর ওপারে	তারীক জামীল
★ তোমার স্মরণে হে রাসুল (সাঃ)	দারুল কাউসার
★ সোনালী সংসার	নযরুল ইসলাম
★ অভিশপ্ত কারা	দারুল কিতাব
★ ইল্‌মের ফাযায়িল	এমদাদিয়া কুতুবখানা
★ সত্যের সন্ধানে	মোহাম্মদ আব্দুল হাই

আদর্শ মায়েদের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত

আদর্শ মায়েদের কর্তব্য এই যে, তারা কন্যা সন্তানদের এমন শিক্ষা-দীক্ষা দিবেন, যেন নেক, সৎ, ফরমাবরদার, বিনয়ীনী, বিনম্র, ভদ্র সম্ভ্রান্ত, আদর্শবতী,সুমিষ্টভাষীণী, বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্নারূপে সমাজে পরিচিতি লাভ করতে পারে। কেউ দেখলে যেন বলে, "মেয়ে হলে যেন এমন হয়।" এ কথা দিবালোকের ন্যায় বাস্তব সত্য যে, মা যদি ভাল হয়, তাহলে তার সন্তানও ভাল হবে। সন্তানের উপর মায়ের স্বভাবের, আচরণের, ব্যবহারের প্রভাব এত বেশী অঙ্কিত হয় যা অন্য কারো হয় না। অনেক মা কন্যা সন্তানদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না বিধায়, তাদের কন্যারা বে-তমীয, বে-আদব, আদর্শহীন, অসভ্য, অভদ্র ও মুর্খই থেকে যায়। ঐ সমস্ত মায়েরা যদিও বা কখনও কখনও উপদেশ প্রদান করেন, তাও নামকা ওয়াস্তে। তাই, উপদেশ নিষ্প্রভ হয়ে ফল দাড়ায় শূন্যের কোঠায়। মায়েদের উচিত, সময় সুযোগ, স্থান-কাল-পাত্র বুঝে স্নেহমাখা, মায়ামাখা ভাষায় এমনভাবে নছীহত করবেন যে, সন্তানের অন্তরে কথাগুলো যেন রেখাপাত করে। কন্যা সন্তানদের শৈশব থেকে এমন হালকা-পাতলা কাজ-কর্মের দায়িত্ব অর্পন করা, যা তারা খুব আগ্রহ ও সখের সাথে করে। সময়ের পাবন্দী করাও যেন শিক্ষা লাভ করতে পারে। শৈশব থেকেই কন্যাদেরকে নামায এবং পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের তাকিদ দিন। যাতে করে তারা যেন একজন দ্বীনদার ধার্মিকা মেয়ে হতে পারে। যে মেয়েরা শৈশব থেকেই নামায পড়তে অভ্যস্ত হয়, তারা সারা জীবন নামাযের পাবন্দী করে। এমনিভাবে গৃহের সকল কাজ কর্ম মেয়েদের দ্বারাই করানো সমীচীন, চাই শাহজাদী আর রাজদুলালী হোক না কেন। যে মেয়েরা লেখা-পড়া, সেলাই করা, মালা গাঁথা, নকশী কাঁথা বুনন, রান্না-বান্না, ঘর গোছানো, ঘর সাজানোর অভিজ্ঞতা রাখে এবং ধৈর্য, সহ্য-নিয়ম-শৃঙ্খলা ও নম্র স্বভাবের অধিকারীণী হয়? তাদের জন্য এই পৃথিবী বেহেশতখানা।

আমাদের সমাজে অনেক মা আদর-সোঁহাগ দিয়ে, আহলাদ-আবদার রক্ষা করে নিজ কন্যাদেরকে অলস, অকেজো, কুড়ে ও নিষ্কর্মা বানিয়ে দেন। দুলালীদের দ্বারা কোন কাজ-কর্ম বা খেদমত করান না। আহলাদী কন্যাদের রান্না-বান্নার ধারে কাছে যেতে দেন না। কিন্তু যখন শ্বশুরালয়ে যেয়ে রান্না বান্নাসহ বিভিন্ন কর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পিত হয়, তখন আদরের কন্যাদের কান্না ছাড়া অন্য কোন পন্থা রয় না। মাছ কোটা, শাক কাটা, ডালে বাগাড় দেওয়া আর ভাতের মাড় ছাড়ানোর মত সামান্য

কাজও তখন উহুদ পাহাড়ের ন্যায় ভারী বোঝা মনে হয়। কোন কোন গৃহে এমনও হয় যে, তিন চার বোনের মধ্যে যে বোনটি রুটি তৈরী করতে, শাক কুটতে, গোশত রান্না করতে ভাল পারদর্শী, তাকেই সব সময় ঐ দায়িত্ব অর্পন করা হয়। আর যারা ঐ কাজে অভিজ্ঞতা রাখে না, তাদের আর কষ্ট দিয়ে বিরক্ত করা হয় না। অতঃপর শ্বশুরালয়ে গমনের পর গৃহকর্ত্রীরূপে সর্ব ক্ষমতা ও সর্ব দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার পর ঐ অযোগ্যতা, ঐ ত্রুটি সমস্ত সুনামকে ক্ষুণ্ন করে দেয়। কন্যাদেরকে বেকার ও অলস বানালে তারা বাচাল ও ঝগড়াটে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এটা খুবই বদঅভ্যাস।

অনেক স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া-বিবাদের কারণ এটাই যে, স্ত্রী ঝগড়াটে, কর্কষভাষীণী, দুর্ব্যবহারের অধিকারীণী। মা যদি বাচাল, কর্কষভাষীণী হয়, তাহলে তার কন্যার ভাষা কেঁইচীর মত কলিজা কেটে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কেন করবে না? মায়ের আচার-আচরণ, স্বভাব চরিত্র যদি খারাপ হয়, তাহলে কন্যাদের স্বভাব খারাপ হবে নিঃসন্দেহে। বিধায়, সমগ্র পরিবার জুড়ে ছেয়ে থাকে দুঃখ, অশান্তি আর দারিদ্রতা। সুতরাং সন্তানদেরকে সদা-সর্বদা পিয়ার-মুহাব্বত, নম্রতা, আদর-সোহাগ দিয়ে লালন-পালন করা উচিত। অতিরিক্ত মারপিট অথবা অযথা ধমকানো শাসানো দ্বারা শিশুরা বিগড়ে যায়। জিদ্দিবাজ ও একরোখা হয়ে যায়। তখন আদর-সোহাগভরা মিষ্টি কথাও অবজ্ঞা করে নিবিধায়। মিথ্যা, গীবত, পরনিন্দা, চোগলখুরী, হিংসা, বিদ্বেষ ও বাচালিপনা মেয়েদের জন্য খুবই খারাপ স্বভাব। বরং মারাত্মক বিপদজনকও বটে। কারণ, সে তো পরের ঘরের অধিবাসী। বাপের বাড়ী তার অল্প দিনের বিশ্রামাগার মাত্র। তাই কন্যা সন্তানদেরকে ঐ সমস্ত বদস্বভাব থেকে বিরত রাখা প্রয়োজন।

কন্যা সন্তানদের খুব প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করায় অভ্যস্ত করা আবশ্যক। কেননা, রাত্রি বেলায় এশার নামায আদায় করে দ্রুত নিদ্রা যাপন করা, প্রভাতে দ্রুত জাগ্রত হওয়া এবং ফজরের নামায সময় মত আদায় করার পর পুনরায় নিদ্রা না যাওয়া সুস্থতার জন্য খুব জরুরী। শিশুদেরকে প্রত্যুষে নিদ্রা থেকে জাগ্রত করা মায়ের কর্তব্য। ছেলে এবং মেয়েকে এক বিছানায় কখনও ঘুমাতে দিবেন না। উলঙ্গ, অর্ধোলঙ্গ ফটো দেখতে দেওয়া, ছেলেদের সাথে খেলা-ধুলা করা, প্রেম-ভালবাসার কেচ্ছা-কাহিনী পড়তে দেওয়া, টিভি এবং সিনেমা দেখতে দেওয়া এ সবকিছুই সন্তানদের চরিত্রের জন্য বিষাক্ত ঘাতক। এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে মায়েদের খুব খেয়াল রাখা উচিত। কারণ, মেয়েদের চাল-চলনে যদি কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে তার দায়-দায়িত্ব আর কারো উপর না হলেও মায়ের উপর বর্তাবেই।

যে মাতা-পিতা নিজ সন্তানদের শরীর-স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য রাখেন, সে সন্তানেরা বড় হয়ে শিক্ষিতরূপে, সমাজ সেবকরূপে জগতবাসীর কিছু খেদমত করার সুযোগ পায়। দ্বীনদার আলেম সন্তান হলে সমগ্র জাতি তার দ্বারা হেদায়াত প্রাপ্ত হয়। সন্তান শিক্ষিত না হলে, মাতা-পিতার জীবন হয়ে উঠে দুর্বিসহ, বিতৃষ্ণাময়। বিভিন্ন প্রকার আপদ-বিপদ, মুছীবতে জর্জরিত হয়ে অবশেষে অপমৃত্যুতে নিপতিত হতে হয়। কিন্তু এ কথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে, নারীদের এবং পুরুষদের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন। নারীর কাজগুলো পুরুষ করবে এবং পুরুষের কাজগুলো নারী করবে এটা অসম্ভব। যদি উপার্জন করে পরিবারের সদস্যদের খেদমত করার দায়িত্ব পুরুষদের উপর না পড়ত, তাহলে জিন্দেগী পেরেশানীতে ভরে থাকত। আর এ জগতধাম জাহান্নামের নমুনা হয়ে যেত। এমনিভাবে যদি নারীর হৃদয় গভীরে প্রেম-ভালবাসা-মায়া-মমতা, সহমর্মীতা আর সেবা-শুশ্রুষার আগ্রহ-স্পৃহা গচ্ছিত না থাকত, তাহলে এ সুন্দর বসুন্ধরায় পারিবারিক ব্যবস্থাপনা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা নারীর অন্তরে সেবা করার মানসিকতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর তাই নারীজাতি বিশ্ব জগতের উষালগ্ন থেকেই সহমর্মীতা ও সেবা-যত্নের দায়িত্বটি গুরুত্বের সঙ্গে পালন করে দাদা-নানা, বাপ, চাচা, মামা, খালু, ভাই, ভগ্নীপতি, ভাগ্নে-ভাতিজার মাঝে মায়ার জাল বিছিয়ে রেখেছেন। পৃথিবীর শেষ লগ্ন পর্যন্ত তারা এ দায়িত্ব পালন করতেই থাকবে। কিন্তু তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, গাইড, প্রতিপালন, প্রশিক্ষণ এমন পদ্ধতিতে হতে হবে যে, তাদের মধ্যে যেন সহানুভূতি, সহমর্মিতার আগ্রহ সুন্দর ভাবে জাগ্রত হয়ে সোনায়-সোহাগায় রূপান্তরিত হয়। কাজকর্ম, সেবা-যত্ন করার ফযীলত, গুরুত্ব ও উপকারিতা কন্যা সন্তানদের মন-মানসিকতায়, রন্ধ্রে-রন্ধ্রে, ধমনীতে, হৃদয় গভীরে জাগ্রত করতে হবে। বৃহৎ বৃক্ষ তাকেই বলা শোভা পায়, যখন সে ঘন পল্লবিত, ছায়াময় ও ফলদার হয়। প্রতিদিন গৃহে তালীমের মাধ্যমে কন্যাদের নছীহত করতে থাকুন। "ফাযায়িলে আমল" "হেকায়েতে সাহাবা" "কিতাবুল ঈমান" "নারী জন্মের আনন্দ" "গুনাহে জারিয়াহ" মূল্যবান গ্রন্থগুলো পড়তে দিন। গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ নিজে পাঠ করুন অন্য মহিলাদেরকেও পড়তে দিন।

কন্যা সন্তানদেরকে ভাল ভাল, সুস্বাদু ও মজাদার খাদ্যদ্রব্য রান্না করা, সেলাই করা, বুনন করা এমনিভাবে কারিগরী বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। ঐ বউ, ঐ মেয়ে, ঐ ভাবী, ঐ স্ত্রী প্রশংসনীয়, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য, যে প্রতিবেশীর রুটি, ভাত, তরকারী এমন

মজাদার ও সুস্বাদুভাবে রান্না করে যে, অন্যদের রান্নার কোন মূল্যই থাকে না। সল্প মূল্যের কাপড় এত সুন্দর ডিজাইনে, নিখুঁতরূপে সেলাই করে যে, মখমল ও রেশমী কাপড়েরও কোন মান থাকে না।

একজন আদর্শ মায়ের চিন্তা করা উচিত যে, তার কোলে দীর্ঘ দিনের লালিত-পালিত আদরের দুলালী বিবাহ-শাদীর পর অন্যের ঘরে চলে যাবে। স্বামীর গৃহের কাজ কর্মের দায়িত্ব গ্রহণ ছাড়াও সন্তান প্রতিপালন ও তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও মানুষ করার দায়িত্ব তার উপরই অর্পিত হবে। সুতরাং কন্যার সুন্দর আগামীকে আরো সুন্দর, ভবিষ্যৎ জীবনকে আরো সাফল্য মন্ডিত করে তুলতে মাকে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত পেশ করতে হবে। কচি মনের একটি ছোট্ট মেয়ে মাকে যা কিছু করতে দেখবে শ্বশুরালয়ে যেয়ে সে তেমনই করতে থাকবে। এই জন্য আদর্শ মায়ের কর্তব্য হল, নিজের আচার-আচরণ ও কাজ কর্ম দ্বারা মেয়েকে আদর্শ ও উন্নত শিক্ষা উপহার দিতে হবে।

যখন কন্যা বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্না হয়ে যাবে এবং তার বিবাহের সময় ঘনিয়ে আসবে, তখন তাকে এ কথা খুব সুন্দর ভাবে, স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিন যে, পিত্রালয়ে নিজ মাতা-পিতার যেরূপ সম্মান প্রদর্শন কর, শ্বশুরালয়ে যেয়ে ঠিক তেমনি শ্বশুর শাশুড়ীর সম্মান করবে। আর তাদের সন্তুষ্টিকে সর্বাবস্থায় প্রাধান্য দিবে। চাই কষ্ট হোক বা প্রশান্তি। তাদের অসন্তুষ্টি হয় এমন কাজ কখনও করবে না। সকল বৈধ আদেশ পালন করার চেষ্টা করবে। মুখ থেকে এমন শব্দ যেন নির্গত না হয়, যদ্দারা তারা মনে ব্যথা পান। তাদের সাথে যখন কথা-বার্তা, আলাপ-আলোচনা করবে তখন এমন ভাষায় বা এমন ঢঙ্গে আলোচনা করবে না, যেমন নিজ সমবয়স্কা বা সহপাঠিনীদের সাথে করা হয়। বরং এমন ভাষায় কথা বলবে, যা বড় ও সম্মানিতদের জন্য প্রযোজ্য। যদি কোন ভুল-ত্রুটির কারণে শাশুড়ী শাসন করে বা সতর্ক করে, তাহলে তাঁর কথাগুলো নিরব, নিশ্চুপ হয়ে হেদায়াতের নিয়্যতে শ্রবণ করবে। কখনও স্বামীর নিকট শাশুড়ীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে না। যদি কখনও অপ্রত্যাশিত ভাবে মনঃক্ষুণ্নকর কিছু তিক্ত কথা বলেই ফেলেন, তাকেও তৃষ্ণা নিবারণকারী সুমিষ্ট শরবতের ন্যায় পান করে যেতে হবে। কখনও কঠোর ভাষায় জবাব দিবে না। শাশুড়ীর সেবা-যত্নকে নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করবে। যদি তিনি অন্য কাউকে কোন কাজের আদেশ দেন, তবুও সে কাজ নিজের, মনে করে শাশুড়ীর মন জয় করবে।

যদি কোন বিবাহিতা মেয়ের উল্লেখিত কথাগুলো হৃদয়ঙ্গম হয়ে থাকে,

তাহলে ইনশাআল্লাহ সে শশুরালয়ে চিরদিন সুখী থাকবে। দ্বন্দ্ব-কলহ আর অশান্তি তার সংসারে কোন দিনও দেখা দিবে না। মেয়ের মাও শান্তিময় জীবন যাপন করতে পারবেন। কারণ, কন্যা সুখে থাকলে মাও সুখে থাকেন। আর যদি কন্যা দুঃখী হয় তাহলে মায়ের মন অশান্তির লেলিহান অগ্নি শিখায় জ্বলতে থাকে। না মরণ আসে, না বেঁচে থাকার জন্য জীবনকে ভাল লাগে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হিফাযত করুন এবং পূর্ণ দ্বীনের উপর চলার তাউফীক দান করুন।

মাওলানা আহমদ সুরাতীর (রাঃ) পক্ষ থেকে কন্যা সন্তানদের জন্য অমূল্য উপদেশ

নিম্নে বর্ণিত পন্থায় কন্যা সন্তানদের বুঝানো আদর্শ মায়েদের কর্তব্য।

আম্মুরা আমার! তোমরা সদা-সর্বদা নেককার ও সৎ হতে চেষ্টা করবে। আর আমি যে উপদেশ শুনাচ্ছি, তা বাস্তব জীবনে প্রতিফলন ঘটাবে।

১। কোন পরপুরুষের সাথে চোখে চোখ রেখে কথা বলবে না। কারো সাথে ঠাট্টা-মশকারী করবে না। কেউ যদি তোমাকে পথে ঘাটে উত্যক্ত করে, তার প্রতিবাদ করো না। প্রত্যেক ব্যাপারে শরম-হায়ার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। বিনা প্রয়োজনে নিজ গৃহে অন্য কাউকে প্রবেশ করতে দিওনা। প্রতিটি কাজ-কর্মে সতর্কতা অবলম্বন করবে। পরিধেয় বস্ত্র স্বস্থানে গুছিয়ে রাখবে। এমন পোষাক পরিধান করবে, যদ্দ্বারা তোমার সম্ভ্রম সংরক্ষিত থাকে। অন্যের কথায় হস্তক্ষেপ করবে না। পান খেয়ে বা লিপিষ্টিক দিয়ে ঠোট রাঙ্গা করবে না। বৈধ প্রয়োজন ছাড়া ম্যাকআপ, স্নো-পাউডার দিয়ে সব সময় সেজে-গুজে চলা-ফেরা করবে না। চলা-ফেরা, উঠা-বসায় লজ্জা-শরম ও শালীনতার প্রতি খুব খেয়াল রাখবে। কুদৃষ্টি থেকে নিজেকে হিফাযত করবে। চোখকে পঞ্চমূখী রেখে চলা-ফেরা করবে না। বে-পর্দা হয় এমন উন্মুক্ত স্থান বা খোলা জায়গায় বসবে না। বেড়ার ফাঁক দিয়ে পরপুরুষদের দেখবে না। দুর্নাম, বদনাম ও অপপ্রচার হতে বেঁচে থাকবে। কেননা, বদনাম, দুর্নাম খুব দ্রুত ছড়ায়। ছেলেদের সংশ্রব ও মেলা-মেশা থেকে দূরে থাকবে। নভেল, নাটক ও অশ্লীল পত্র-পত্রিকা, বই-পুস্তক পাঠ করবে না। এমনিভাবে কৌতুক ও হাসি-ঠাট্টা সম্বলিত পুস্তক-পুস্তিকাও পাঠ করবে না। ঈমান ও চরিত্র বিধ্বংসী কবিতা-ছন্দ বা কেচ্ছা- কাহিনী হাত দিয়ে কখনও স্পর্শ করবে না। ছায়াছবিসহ কোন প্রকার গান-বাজনা করার বা শ্রবন করার অভ্যাস বা সখ করবে না। যদি গান করার সখ হয়, তাহলে

কবিতায় বা ছন্দে লিখিত দু'আসমূহ মুখস্থ করতে পার। অন্য কারো কষ্ট হয় এমন আচরণ করবে না। কারো মনে ব্যথা দিও না। সকলের মন জয় করে জীবন পথে অগ্রসর হও। সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে সময় অতিবাহিত করবে। ভাই, ভাবীদের সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করবে। সকলের সাথে পিয়ার-মুহাব্বত রাখবে। ছোটদের সাথে স্নেহমাখা আচরণ করবে। তাদের পানাহার ও পোষাক-পরিচ্ছদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। তাদের সাথে লড়াই ঝগড়া করবে না। বরং নরম ব্যবহার দ্বারা কার্য সিদ্ধ কর। তাদের লেখা পড়া করতে উৎসাহিত করবে। এমন অমায়িক ব্যবহার করবে, যাতে করে সকলেই তোমাকে ভালবাসে, স্নেহ করে।

বড়দের সাথে আচরণ কেমন হবে?

২। মাতা-পিতাকে কখনও দুঃখ দিবে না। নিজের দোষ ত্রুটি মেনে নিবে। কখনও তাদের সম্মুখে বে-আদবীর সাথে কথা বলবে না। জন্মের পর যে কষ্ট তাঁরা সহ্য করেছে, তাদের সে অনুগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। ঘরের প্রতিটি কাজ নিজ হাতে করার চেষ্টা করবে। অযথা কথায় কথায় ঝগড়া-বিবাদ করবে না। সমবয়স্কাদের সাথে মিলে-মিশে থাকবে। নির্জনতা ও একাকিত্ব জীবনযাপন পছন্দ করো না। এটা বদঅভ্যাস। ভাবীদের সাথে আপন বোনের মত উত্তম আচরণ করবে। ভাবীদের আত্মীয়-স্বজন বেড়াতে এলে, তাদের সাথে খুব অমায়িক ব্যবহার করবে। বড়দের ইজ্জত সম্মানের প্রতি খুব লক্ষ্য রাখবে। তারা জ্ঞানের যে কথা বলে, তা কবুল করে নাও। তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবে। তাদের বসা এবং নিদ্রা যাপনের স্থান পরিচ্ছন্ন রাখবে। কথায় কথায় মেজাজ গরম করবে না। যে কাজই কর আনন্দচিত্তে কর। সকলের সাথে খাওয়া-দাওয়া করবে। কাউকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না। কাউকে কুধারণা করার সুযোগ দিও না। কোন কাজ ভুলে গেলে বা কোন জিনিষ নষ্ট হয়ে গেলে মাতা-পিতার নিকট অভিযোগ করবে না। কারো চোগলখুরী করবে না। সামান্য কথায় নালিশ করার অভ্যাস কর না। অন্যথায় শশুরালয়ে বসবাস করা দুর্বিসহ হয়ে উঠবে।

বড় বোনের সম্মান, শ্রদ্ধা-ভক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখবে। সর্বদা তাঁর সুখ-দুঃখ ও শান্তিতে শরীক থাকবে। তাঁর প্রয়োজন সমুহকে নিজের প্রয়োজনের উপর প্রাধান্য দিবে। তাঁর মনে দুঃখ দিওনা। যে কাজ করার আদেশ দেন, তা তড়িৎ করে দাও। তাঁর কোন কথায় বা কাজে দোষ-ত্রুটি তালাশ করবে না। নিজেকে অন্যের তুলনায় বড় ও উত্তম মনে করবে না। যে কাজটি তিনি করতে পারেন না অথচ তুমি পার, তাহলে সে কাজ তুমি

করে দাও। যদি তিনি গৃহের প্রয়োজনীয় কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকেন, তাহলে তুমি ছোটদের তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত থেকো। তাঁর প্রতিটি কাজে তাকে সহযোগিতা করবে। মা-বোনদের মন্দ কথা বলবে না। তোমাকেও শশুরালয়ে যেতে হবে, সে দিকে লক্ষ্য রাখবে। যেখানে বন্ধুত্বের পরিবেশ বিরাজমান সেখানে শত্রুতা সৃষ্টি করবে না। তাদের তিক্ত কথাগুলো উদারতার সাথে পান করে নাও। তাদের উপর রাগান্বিত হয়ো না। কারণে-অকারণে কথা বলা বন্ধ করো না। তোমাদেরও এ পথ পাড়ি দিতে হবে। তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করা ব্যতীত কোন জিনিষে হাত দিওনা। নিজের জিনিষ তাকে উপহার দিতে দ্বিধা করবে না। অন্যের সম্মুখে তার বিরুদ্ধে কানাকানি করবে না। তার অন্তরে তোমার বিরুদ্ধে কোন প্রকার কুধারণা সৃষ্টি হয়, এমন কাজ করবে না। তার সাথে লেন-দেন পরিস্কার রাখবে। সদা-সর্বদা বিবেক-বুদ্ধি এবং ভেবে-চিন্তে কাজ করবে, যাতে করে পরে লজ্জিত না হতে হয়।

রাত্রি বেলায় তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়বে এবং সকাল বেলা সকলের পূর্বে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে যাবে। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বিছানা-পত্র ঝেড়ে গুছিয়ে নিবে। অতঃপর নিজ প্রয়োজন সমাধা করে উজু করে ফজরের নামায আদায় করবে। অতঃপর পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত করবে। গৃহের আভ্যন্তরীণ কাজ-কর্মে মাকে সহযোগিতা করবে। পিতা জাগ্রত হওয়ার পূর্বে তাঁর উজু ও নামাযের সমস্ত ব্যবস্থা প্রস্তুত করে রাখবে। পিতা জাগ্রত হওয়ার পর তার বিছানাপত্র গুছিয়ে রাখবে। রাত্রে খাবারের পাত্র আধোওয়া পড়ে থাকলে, ধুয়ে মেজে নিজ স্থানে রেখে দাও। ঝাড়ু দিয়ে ঘর পরিস্কার করে নাও। ময়লা আবর্জনা নির্দিষ্ট পাত্রে রেখে দাও। ছোট-ভাই-বোনদের পোষাক পরিচ্ছদ ইতস্তত বিক্ষিপ্তরূপে পড়ে থাকলে ভাজ করে স্বস্থানে রেখে দাও। যে ভাই-বোনেরা মাদ্রাসা বা স্কুলে যায়, তাদের কিতাব, বই-পুস্তক, শ্লেট, পেন্সীল, খাতা, কলম, স্কেল ইত্যাদি পূর্ব থেকে প্রস্তুত করে রাখবে। যাতে করে তারা স্কুলে যাওয়ার পূর্বে হাঙ্গামা করতে সুযোগ না পায়। তাদের হাত মুখ ধৌত করে নাস্তা খেতে দাও। অতঃপর তাদের পোষাক পরিধান করাও। মাথায় কোন ভাল তেল দিয়ে কেশ পরিচর্যা করে মাদ্রাসা বা স্কুলের প্রস্তুতি পরিপূর্ণ করে দাও।

মাদ্রাসা বা স্কুলের প্রস্তুতি

এখন তুমি নিজে মাদ্রাসা বা স্কুলের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ কর। চিড়নী দ্বারা কেশগুচ্ছের পরিচর্যা করে খোপা বা বেনী বানিয়ে নাও। পাদুকা ও পরিধেয়

বস্ত্র পরিবর্তন করে নাও। নাস্তার কাজটি সেরে নাও। হাতে সময় থাকলে সম্মুখের পড়ায় এক নযর দৃষ্টি বুলিয়ে নাও। পিছনের পড়া অবশ্যই কণ্ঠস্থ, ঠোটস্থ ও মুখস্থ করে নাও। মাদ্রাসা বা স্কুলে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে সকলকে সালাম কর। পথ চলার সময় ডান-বাম, অগ্রে-পশ্চাতের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। আনতনয়না বা দৃষ্টি বন্ধ করে পথ চলবে না। গাড়ী, ঘোড়া, সাইকেল, রিক্সার প্রতি খেয়াল রাখবে। পূর্ণ সতর্কতার সাথে রাস্তা পারাপার হবে। রাস্তার ডান পার্শ্ব দিয়ে পথ চলবে। সড়কের মধ্যখান দিয়ে কখনও পথ চলবে না। তাড়াতাড়ি এবং ঠিকমত পথ চলবে। হেলে দুলে বা লম্ফ ঝম্ফ দিয়ে পথ চলবে না। ঠিক সময় মত মাদ্রাসায় পৌঁছে যাও। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্বেই মাদ্রাসায় পৌছবে না। এতে আড্ডা ও অহেতুক গল্প গুজব করার কুপ্রবণতা সৃষ্টি হতে পারে। আবার পৌঁছতে এক মিনিট বিলম্ব না হয়, সে দিকেও লক্ষ্য রাখবে।

কন্যা সন্তানদের পছন্দনীয় বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ

আমাদের এ-ই প্রার্থনা, তোমরা যেন মাদ্রাসা এবং স্কুল থেকে এমন পছন্দনীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে বের হতে পার, যা একজন মুসলিম নারীর জন্য শোভা পায়। আর তোমার ধর্মীয় এবং জাগতিক শিক্ষা যেন তোমাকে রঙ্গীন করে। এমন যোগ্যতা নিয়ে বের হও, যেন ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত হতে পার। মহান আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর প্রিয় রাসূল (সাঃ) কে চিনতে পার। জাতি এবং দেশ ও দশের সেবিকা হতে পার। তোমার দৃষ্টি ভরা যেন থাকে আত্মমর্যাদাবোধে এবং হৃদয় ভরা থাকে ব্যথায়। অন্তরে যেন থাকে হায়া-শরম আর মেজাজে থাকে যেন বিনম্রতা। বড়ত্ব, অহংকার, অহমিকা আর লৌকিকতামুক্ত থাকে যেন স্বভাব। অন্তরে যেন না পড়ে চৌর্যবৃত্তির প্রভাব। ফ্যাশন শোর রঙ্গীন প্রজাপতি হয়ো না। নিজের সৌন্দর্য, রূপ-লাবণ্য অন্যের নিকট প্রকাশ করবে না। বরং লজ্জাশীলার ভূমিকা পালন করবে। মাতা-পিতার মান-সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় অবশ্যই রাখবে। ইসলামী আদর্শ ও হুকুম আহকাম মান্য করার উৎসাহ অন্তরে রাখবে। মাতা-পিতার অন্তরে দুঃখ-কষ্ট দিবে না। উস্তাদের শিক্ষাকে আলোকিত করবে। ভাই-বোনদের স্বার্থে জীবন উৎসর্গ করবে।

বৈবাহিক জীবনের সফর

এক সময় এমন এসেই যায়, যখন কিশোরী ছোট্ট মেয়েটিকে নববধুর সাজে সাজতে হয়। অনেক আদর-সোহাগে লালিত কন্যাকে মাতা পিতা-

অপরিচিত এক যুবকের হাতে অর্পন করেন। আদরের দুলালী স্বীয় মাতা-পিতা, ভাই-বোন হতে পৃথক হয়ে স্বামীর সাথে নতুন জীবন শুরু করে। যেখানকার পরিবেশ পিত্রালয়ের পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী হয়ে থাকে। সেখানে এ নববধুর বিভিন্ন প্রকার লোকদের, বিভিন্ন প্রকার মেজাজের মানুষদের সাথে উঠা-বসা করতে হয়। টক,মিষ্টি, ঝাল, তিক্ত, ফেকাসে, কড়া স্বভাবের আদম সন্তানদের সম্মুখীন হতে হয়। শাশুড়ী ও ননদের মন রক্ষা করা, প্রাণপ্রিয় জীবন সাথীর মান-অভিমান সামাল দেওয়া, সন্তানদের দেখা-শুনা এবং গৃহের দায়িত্বের বিরাট বোঝা চেপে বসে। এ জন্য তাকে একজন আদর্শ মেয়ে, আদর্শ বোন, আদর্শ বধু এবং আদর্শ মা হওয়ার প্রশিক্ষণ নিতে হবে। এটা মায়েরই কর্তব্য। নিজ কন্যার উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে উজ্জ্বলতর করার নিমিত্ত মাকে এই কাজটি করতে হবে।

শ্বশুরালয়ে বসবাস করার নিয়ম পদ্ধতি

আদরের কন্যারা! নারীদের শ্বশুরালয়ে অবস্থান করতেই হয়। এটা নারী জন্মের ভাগ্যের লিখন। তাই খুব সতর্কতার সাথে মেহমান স্বরূপ অবস্থান করতে হবে। লজ্জিত, অপমানিত ও ধিকৃত হতে হয় এমন কাজ কখনও করবে না। শ্বশুরালয়ে যখন যা ভাগ্যে জোটে, তা খেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। ক্রোধের আতিশায্যে কপালে ভাজ পড়তে দিওনা। কোন জিনিষ অপছন্দ হলে অসন্তোস প্রকাশ করো না। শাশুড়ীকে নিজ মা জননীর মত এবং শ্বশুরকে নিজ পিতার মত শ্রদ্ধা করবে। ননদদেরকে আপন ভগ্নীর চেয়েও বেশী আদর করবে। তারাও একদিন তোমার মত পিত্রালয় ছেড়ে পরের ঘরে চলে যাবে। তাই তাদের মনে দুঃখ দিও না। প্রত্যেক ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ কর। এমন কথা বলবে না বা কাজ করবে না, যাতে তাদের অন্তরে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয়। পিত্রালয় থেকে কিছু এলে তা গোপন করে রাখবে না। তবে একান্ত গোপনীয় বিষয় হলে ভিন্ন কথা। তাদের অনুমতি নিয়ে ষ্টীল আলমারী বা কাঠের আলমারী কিংবা ট্রাঙ্কের চাবী নিজের কাছে রাখবে। প্রতিদিন ব্যবহৃত হয় এমন পরিধেয় বস্ত্র আলাদা করে রাখবে। এমনিভাবে বিবাহ-শাদী বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির জন্য তৈরীকৃত বস্ত্র ভিন্ন ভাবে রাখবে। নিজের জিনিষ-পত্রের খোঁজ-খবর নিজে রাখবে। তাদের নিকট কোন কিছুর হিসাব চাইবে না। অবসর সময়ে তাদের সঙ্গেও কিছু সময় অতিবাহিত করবে। তাদের কথাগুলো মন দিয়ে শ্রবণ করবে। ফায়েদার কথা কবুল করে নিবে। নিজের কোন কথা বা কাজে ত্রুটি থাকলে সংশোধন করে নিবে। শাশুড়ী বা ননদদের থেকে গৃহের কাজ-কর্মের দায়িত্ব বুঝে নিবে। কি কি রান্না

করতে হয়? কিভাবে বন্টন করতে হয়? পানাহারের নিয়ম পদ্ধতি কি? মেহমানদের সাথে আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা. এ বাড়ীতে কেমন ধরনের হয়? – এ সব কিছু গুরুত্বের সাথে পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ ও লক্ষ্য করবে। নিজেদের বাড়ীর পদ্ধতি ও ধরন কেমন তা এ বাড়ীতে প্রয়োগ করবে না। তাদের বাড়ীর নিয়ম কানুন মেনে চলবে। শরীয়ত পরিপন্থী কুপ্রথাসমূহে কোন প্রকার সহযোগিতা করবে না। প্রকাশ্যে বিরোধিতাও করবে না। বরং ধীরে ধীরে পিয়ার মুহাব্বত দ্বারা, নম্রতা-ভদ্রতা দ্বারা আলোচনার মাধ্যমে বুঝাতে থাকবে। অবসর সময়ে স্বামীর গৃহের এবং প্রতিবেশী মুসলমান মেয়েদের নিয়ে একত্রিত হয়ে বসে নিজের জানা মাসআলা মাসায়িল ও দ্বীনের আলোচনা করবে। আদব, ইল্‌ম এ প্রজ্ঞাভরা কথায় তোমার মন ভরে যাবে এবং তাদেরও অজানা অনেক কিছু জানা হয়ে যাবে। তোমার ভাই-বোন বেড়াতে এলে আনন্দচিত্তে শুভেচ্ছা স্বাগতম জানাও। তাদের আদর আপ্যায়নে কৃপনতা করবে না। ফিরে যাওয়ার সময় কিছু উপহার সামগ্রী সঙ্গে দিয়ে দিও। পিত্রালয় থেকে আগমনকারী কারো সাথে কানাকানি করবে না। আশে-পাশের থেকে আগত সাক্ষাতকারীদের সঙ্গে সদব্যবহার করবে। ছোট ছোট মেয়েদেরকে জরুরী মাসআলা-মাসায়িল শিক্ষা দিবে। দ্বীনের আলোচনা করবে। "বেহেশতী যেওর", "কিতাবুল ঈমান", "নারী জন্মের আনন্দ", "গুনাহে জারিয়াহ" পড়তে দিবে। বড় হওয়ার পর এরা সকলেই তোমার সম্মান করবে। তোমার ঘরের অনেক কাজ করে দিবে। এছাড়াও তোমার অসংখ্য উপকার সাধিত হবে। শাশুড়ী, জেঠানী এবং ননদদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে আদবের সাথে উত্তর দিবে। সময় পেলে তাদের কাজ করে দিবে। বাড়ীতে কাউকে দাওয়াত করলে কাজ কর্মে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। সকল জিনিষ পূর্বেই প্রস্তুত করে রাখবে। পানাহার সম্পন্ন হয়ে গেলে থালা, বাটি, গ্লাস ইত্যাদি স্বস্থানে সযত্নে রেখে দিবে।

ননদ এবং জেঠানীদের সন্তান-সন্ততিকে আদর-সোহাগ করবে। শিশুদের পারস্পারিক ঝগড়া-বিবাদ হলে কোন পক্ষপাতিত্ব করবে না। এতে এক মা সন্তুষ্ট এবং অন্য মা অসন্তুষ্ট হবে নিঃসন্দেহে। তাদের শিশু-সন্তানদের হাত মুখের পরিচ্ছন্নতার প্রতি যত্ন নিবে। এতে শিশুদের মায়ের মুহাব্বত ও সুনযর প্রাপ্ত হবে এবং তাদের অন্তর জয় করে নিবে। শ্বশুরালয়ের কোন কথা প্রতিবেশী বা পিত্রালয়ের কারো নিকট প্রকাশ করবে না। অন্য কারো থেকেও শ্বশুরালয়ের নিন্দা শ্রবণ করবে না। বরং পরিস্কার ভাষায় বলে দিবে যে, বোন! আজকের পরে আমার সম্মুখে আর কোন দিন

এমন কথা বলবে না। পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক ঝগড়ায় কোন পক্ষপাতিত্ব বা অংশগ্রহণ করবে না। মোটকথা, একজন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের আদর্শ মেয়ে, বধু ও মা রূপে যা কিছু শোভা পায়, সেভাবে জীবন যাপন করবে এবং নিজের চাল-চলন, আচার-আচরণ, ব্যবহার এমন অমায়িক রাখবে যে, পরিবারের সকলের মন জয় করে নিতে পার। সকলেই যেন তোমার দেওয়ানা হয়ে যায়।

পানাহারের আদব সমূহ

(১) দস্তরখান বিছিয়ে খানা খাওয়া।

বিঃ দ্রঃ প্রথমে খানা তথা আল্লাহর নেয়ামতের দিকে মুখাপেক্ষী হয়ে বসা, তারপর দস্তরখান বিছানো। *(যাদুল মা'আদ ৩ : ১৬১)*

বিঃ দ্রঃ দস্তরখান খুব পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। এর উপর ঝুটা (উচ্ছিষ্ট খাবার), হাড্ডি ইত্যাদি না ফেলা বা তাতে পা না রাখা।

(২) উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া। *(কানযুল উম্মাল,২ : ২৪৪)*

(৩) (উঁচু স্বরে) বিস্‌মিল্লাহ পড়া। *(তিরমিজী,২ : ৭)*

(৪) ডান হাত দিয়ে খাওয়া। *(কানযুল উম্মাল,২ : ২৩৭)*

(৫) খানার মজলিসে বয়সের দিক দিয়ে যিনি বড় এবং বুযুর্গ, তার দ্বারা খানা শুরু করানো। *(কানযুল উম্মাল, ২ : ২৪১)*

(৬) খাদ্য এক ধরনের হলে নিজের সম্মুখ হতে খাওয়া। *(কানযুল উম্মাল, ২ : ২৪১)*

(৭) খাদ্যের কোন অংশ পড়ে গেলে উঠিয়ে (প্রয়োজনে পরিস্কার করে) খাওয়া। *(কানযুল উম্মাল, ২ : ২৪০)*

(৮) হেলান দিয়ে বসে না খাওয়া। *(কানযুল উম্মাল, ২ : ২৬১)*

(৯) খাদ্যের ক্রটি বের না করা। *(উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম, ১২৩)*

(১০) জুতা পরিহিত থাকলে জুতা খুলে খানা খাওয়া। *(কানযুল উম্মাল, ২ : ২৩৭)*

(১১) খানার সময় তিন ভাবে বসা যায়।

১. উভয় হাটু উঠিয়ে এবং পদ যুগলে ভর করে।

২. এক হাটু উঠিয়ে এবং অপর হাটু বিছিয়ে।

৩. উভয় হাটু বিছিয়ে অর্থাৎ নামাযে বসার ন্যায় বসে। সামান্য সম্মুখ পানে ঝুঁকে আহার করা। *(উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম, ১২৩)*

(১২) আহার গ্রহণ শেষে খানার পাত্র সমূহ আঙ্গুল দ্বারা ভালভাবে চেটে পরিস্কার করে খাওয়া। এতে খাবারের পাত্রসমূহ আহারকারীর জন্য মাগফিরাত কামনায় আল্লাহর দরবারে দু'আ করে। হাতের আঙ্গুল সমূহ যথাক্রমে মধ্যমা, শাহাদাত, বৃদ্ধা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা চেটে খাওয়া। *(খাছায়িলে নববী, শামায়িলে তিরমিজী, ৪০৪)*

(১৩) খানা শেষে এই দু'আ পড়া :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

(১৪) খানা শেষে আগে দস্তরখান উঠিয়ে তারপর নিজে উঠা। *(ইবনে মাজা, ২৩৭)*

(১৫) দস্তর খান ও অবশিষ্ট খানা উঠানোর সময় এই দু'আ পড়বে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِىٍّ وَّلَامُوَدَّعٍ وَّلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا

(শামায়েলে তিরমিজী, ১২)

(১৬) খানা খেয়ে উভয় হাত ধোয়া। *(তিরমিজী, ২ : ৬)*

(১৭) কুলী করে মুখ পরিস্কার করা। *(মিশকাত, ২ : ৩৬৬)*

(১৮) খানার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়তে ভুলে গেলে স্মরণ হওয়ার পর খানার মাঝে এই দু'আ পড়া : بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَه وَاٰخِرَه *(তিরমিজী, ২ : ৭)*

(১৯) কারো মেহ্‌মান হয়ে খানা খেলে প্রথমে আল্লাহর শুক্র আদায়ে ১৩নং এ বর্ণিত দু'আ পড়ার পর মেযবানের শুক্‌রিয়া আদায়ে এই দু'আ পড়া :

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ

(মিশকাত, ২ : ৩৬৯)

হাদীসে মেযবানকে শুনিয়ে এ দু'আটি পড়তেও উৎসাহিত করা হয়েছে :

اَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَاَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ

আবু দাউদ, ২ : ৫৩৮)

(২০) খানা খাওয়ার সময় একেবারে চুপ থাকা মাকরূহ। এজন্য খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে পরস্পরে ভাল কথা আলোচনা করা। কিন্তু যে ধরনের কথায়

বা সংবাদে দুশ্চিন্তা বা ঘৃণার উদ্রেক হতে পারে, তা খানার সময় বলা অনুচিত। *(যাদুল মা'আদ, ২ ঃ ২৫)*

পান করার সুন্নাত সমূহ

(১) পানির পেয়ালা ডান হাত দিয়ে ধরা। *(আবু দাউদ, ২ ঃ ৫৩০)*

(২) বসে পান করা, বসতে অসুবিধা না হলে দাঁড়িয়ে পান না করা। *(আবু দাউদ, ২ ঃ ৫২৩)*

(৩) বিস্‌মিল্লাহ বলে পান করা এবং পান করে আল্‌হামদুলিল্লাহ্ বলা। (কানযুল উম্মাল, ২ঃ ২৯১)

(৪) কম পক্ষে তিন শ্বাসে পান করা এবং শ্বাস ছাড়ার সময় পানির পাত্র মুখ হতে সরিয়ে নেয়া। *(বুখারী, ২ ঃ ৮৪১)*

(৫) পাত্রের ভাঙ্গা দিক দিয়ে পান না করা। *(মিশকাত, ১ ঃ ৩৭১)*

(৬) পাত্র যদি এমন বড় হয়, যার ভিতর নজরে আসে না, সেটার মুখে মুখ লাগিয়ে পান না করা। কারণ, তাতে কোন বিষাক্ত প্রাণী বা ক্ষতিকর বস্তু থাকতে পারে, যা পানকারীর ক্ষতি সাধন করতে পারে। *(কানযুল উম্মাল, ২ ঃ ৯৩)*

(৭) পানি পান করার পর এই দু'আ পড়াঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ سَقَانَا بِرَحْمَتِهٖ مَاءً عَذْبًا فُرَاتًا وَّلَمْ يَجْعَلْهُ بِذُنُوْبِنَا مِلْحًا اُجَاجًا

(ইহ্ ইয়াউল উলূম, ২ ঃ ৬)

(৮) পানীয় দ্রব্য পান করে কাউকে দিতে হলে, ডান দিকের ব্যক্তিকে আগে দেয়া এবং এই ধারাবাহিকতা অনুযায়ীই শেষ করা। *(তিরমিজী, ২ঃ ১১)*

(৯) দুধ পান করার পূর্বে এই দু'আ পড়া ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

দুধ ব্যতীত অন্য কোন পানীয় দ্রব্য হলে وَزِدْنَا এর পরে خَيْرًا বৃদ্ধি করা। *(আ'মালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলি, ১২৭)*

(১০) যে ব্যক্তি পান করাবে তার সর্বশেষে পান করা। *(তিরমিজী, ২ ঃ ১১)*

(১১) জমজমের পানি কিবলামুখী হয়ে এ দু'আ পড়ে পান করা ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ

(আলমগীরী, ১ ঃ ২২৬)

(১২) উজু করার পর পাত্রের অবশিষ্ট পানি কিবলামুখী হয়ে পান করা। এতে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি হতে আরোগ্য লাভ হয়। *(শামী, ১ ঃ ১২৯)*

(নবীজীর সুন্নত হতে সংকলিত)

সন্তানের মাথার কৃছম খাওয়া কুপ্রথা

কোন কোন গৃহে মায়েরা অজ্ঞতা ও মূর্খতা বশতঃ কথায় কথায় সন্তানের মাথা স্পর্শ করে কৃসম খেয়ে থাকে। এটা মারাত্মক ভুল। কখনও এমন হয় যে, মা নিজ সন্তানের মস্তকে হাত রেখে কোন কথায় দৃঢ়তা ও একীন বুঝানোর জন্য অথবা নিজে সত্যবাদী প্রমাণিত করার জন্য চেষ্টা করেন। এতে উপস্থিত লোকেরা খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, ইসলামী শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। বস্তুতঃ এ জাতীয় কথা বা কাজের কৃসম হয়ই না। বরং মারাত্মক গুনাহ হয়। তাই যে কোন প্রকার কৃসম খেতে সতর্কতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

বুযুর্গদের ঘটনায় এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অতীত যুগে কোন এক ব্যক্তি বিতাড়িত শয়তানকে প্রশ্ন করেছিল যে, আমি তোমার মত শয়তান কি ভাবে হতে পারব? উত্তরে শয়তান বলল, তার পদ্ধতি এই যে, তুমি নামাযে অলসতা করবে এবং কৃসম খেতে বিলকুল পরওয়া করবে না। সত্য-মিথ্যা যখন যা মনে চায় কৃসম খেতে থাকবে। (ফাযায়িলে আমল)

উল্লেখিত ঘটনা দ্বারা আমরা দু'টি বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপের শিক্ষা পাই।

(১) নামাযে কখনও কোন প্রকারের অলসতা না করা। একজন মুসলমান নারীর কর্তব্য এই যে, নামাযের ওয়াক্তের শুরুতেই তা আদায় করে নেওয়া এবং নিজ স্বামী ও বয়স্ক ছেলেদেরকে আযান হওয়ার সাথে সাথে উৎসাহ দিয়ে মসজিদে পাঠিয়ে দেওয়া। এমনিভাবে ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে ঘরে নিজের সাথে নামাযে দাঁড় করিয়ে নামাযের শিক্ষা দেওয়া।

(২) সত্য কৃসম খেতেও খুব বেশী সতর্কতা অবলম্বন করা। মিথ্যা কৃসম খাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। সুতরাং সমস্ত মুসলমান মায়েদের নিকট আমাদের আবেদন এই যে, প্রচন্ড ক্রোধের সময়ও কৃসম খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। নিজ স্বামীকেও বিরত রাখুন। যদি দুর্ভাগ্য বশতঃ আপনি অথবা আপনার স্বামী এ ব্যাপারে এখনও অবহেলা প্রদর্শন করে আসছেন, তাহলে আজই অন্তরের অন্তস্থল থেকে মহা মহিমাময় আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাওবা করুন। আর এ পর্যন্ত যত কৃসম খেয়ে ভাঙ্গা হয়েছে, তার কাফ্‌ফারা কোন ভাল মুফতী সাহেবের নিকট থেকে জেনে নিবেন এবং তা আদায় করবেন। যদি আর্থিক সামর্থ না থাকে, তাহলে

ওসীয়ত করতে ভুল করবেন না। এতে করে আপনার ইনতেকালের পর কাফ্ফারা আদায়ের একটি সুব্যবস্থা হয়ে যাবে।

ক্বসম সম্পর্কিত কিছু মাসআলা-মাসায়িল

(১) আল্লাহ তা'আলা ব্যতিত অন্য কারো নামে ক্বসম খাওয়া মারাত্মক গুনাহ। যেমন "বাপের ক্বসম", "রসুলের (সাঃ) ক্বসম", "ক্বাবা ঘরের ক্বসম" "মসজিদের ক্বসম" "কুরআনের ক্বসম" "হাদীসের ক্বসম" "ভাইয়ের ক্বসম" "স্বামীর ক্বসম" অথবা অন্য কিছুর ক্বসম খেল, তাহলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে ক্বসম বলে গণ্য হবে না। বরং কঠিন গুনাহ হবে। সুতরাং আগামী দিনের জন্য দৃঢ়তার সাথে হিম্মত করুন এবং সিদ্ধান্ত নিন যে, ক্বসমের কোন শব্দই উচ্চারণ করব না। ঐ হিম্মতের বরকতে আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয় আপনার জন্য সহজ করে দিবেন।

(২) নিজ পুত্র-কন্যাদের নামে ক্বসম খেলে ক্বসম গণ্য হবে না। এমন ক্বসম ভেঙ্গে ফেললে কাফ্ফারা দিতে হবে না। অবশ্য কঠিন গুনাহ হবে।

(৩) যদি কখনও নিজ সন্তানকে অথবা স্বামী, ভাই, বোনকে এ কথা বলে যে, "তোমার খোদার ক্বসম লাগে তুমি এ কাজটি কর" তাহলেও ক্বসম গণ্য হবে না। যাকে বলা হল, তাকে ক্বসম পূর্ণ করতে হবে না।

(৪) অনেক মা নিজ সন্তানদের কোন কাজ করার জন্য এমন বলেন যে, "যদি তুমি অমুক কাজ না কর, তাহলে আমি দুধের ঋণ মাফ করব না।" এমন কথাতে ক্বসম হয় না। যদি সন্তান ঐ কাজ না করে, তাহলে তাকে কাফ্ফারও দিতে হবে না। অবশ্য মায়ের কথার নাফরমানী করার গুনাহ হবে। তবে শর্ত হল, মা যদি কোন বৈধ কর্মের আদেশ প্রদান করে থাকেন। অন্যথায় হবে না।

আমরা ক্বসম খাওয়ার বদঅভ্যাস পরিত্যাগ করার নিমিত্ত মুসলমান মায়েদের জন্য কিছু উপকারী অথচ সহজসাধ্য তদবীর ও পন্থা উল্লেখ করছি। আমল করতে পারলে সত্যি উপকার সাধিত হবে।

(১) সর্ব প্রথম মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাওবা করতে হবে।

(২) অন্তরে দৃঢ়তার সাথে অঙ্গীকার করুন যে, আগামী জীবনে কোন পরিস্থিতেই ক্বসম খাব না।

(৩) স্বামী, পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, পুত্র-কন্যা, বান্ধবী, মাসী, বুয়া, ইত্যাদিকে জানিয়ে দিন যে, কখনও যদি আপনার মুখ দ্বারা ক্বসমের কোন শব্দ বের হয়, তাহলে যেন তারা তখনই আপনাকে সতর্ক করে দেয়।

(৪) সর্বদা মহান আল্লাহর শাহী দরবারে অনুনয় করে ফরিয়াদ করুন যে, হে দয়াময় আল্লাহ! আপনি আমাকে ঐ বদঅভ্যাস থেকে বিরত রাখুন। আর যদি আপনার স্বামী অথবা অন্য কেউ ঐ বদঅভ্যাসে লিপ্ত থাকে, তাহলে তার জন্যও দু'আ করুন।

সন্তানের মৃত্যুতে সবর করার ছাওয়াব

মুসলমান যখন ঈমানের সুউচ্চ শিখরে পৌঁছে যায় এবং এক্বীনের চরম চূড়া স্পর্শ করে, তখন সে এ কথার উপর পূর্ণ ধর্ম বিশ্বাস রাখে যে, হায়াত-মউত যা কিছু হয়, তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়। তাই তার দৃষ্টিতে যুগের উত্থান-পতন, চড়াই-উৎরাই, আবর্তন, বিবর্তন আর পরিবর্তনের কোন মূল্য নেই। দুঃখ-কষ্ট, বিপদ- আপদ–মছীবত সহ্য করা তার জন্য সহজতর হয়ে যায়। আর কোন বালা-মছীবত দ্বারা আক্রান্ত হলে মহান আল্লাহর শাহী দরবারেই মস্তক অবনত করে। অন্তরও প্রশান্ত হয়। মনটা বালা-মুছীবতের সময় ধৈর্য ধারণ করতে সক্ষম হয়, সবর করে প্রশান্তি উপলব্ধি করে আর এমন ব্যক্তি আল্লাহর সিদ্ধান্তের সম্মুখে মাথা নত করে দেয় এবং বিশ্ব প্রতিপালকের যে কোন ফয়সালা মাথা পেতে নেয়।

মহানবী (সাঃ) যখন কোন শিশুকে মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় তার প্রাণ পাখিকে উড়ে যেতে দেখতেন, তখন দুঃখ-বেদনা এবং শিশুর প্রতি রহম ও তার মায়ায় প্রিয় নবীজীর (সাঃ) নয়নযুগলে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে যেত। যাতে করে উম্মতে মুহাম্মদীগণ রহম-করম এবং মায়া-মমতার মর্যাদা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত উছামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মহানবী (সাঃ)-এর জনৈকা কন্যা একবার তাঁকে সংবাদ দিলেন যে, আমার পুত্র মৃত্যু পথযাত্রী। আপনি একবার আসুন। মহা নবী (সাঃ) তাকে সালাম সহ এ কথা বলে পয়গাম প্রেরণ করলেন যে,

إنّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَ لَهُ مَا اَعْطٰى وَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِاَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَ لْتَحْتَسِبْ

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা যা ছিনিয়ে নেন তাও তাঁরই। আর যা দান করেন তাও তাঁরই। তাঁর নিকট প্রতিটি জিনিষের একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। এ জন্য ধৈর্য ধারণ কর এবং প্রতিদানের আকাঙ্খা রাখ।

তিনি পুনরায় জোরালো ভাবে প্রস্তাব পাঠালেন যে, আপনি (সাঃ) অবশ্যই তাশরীফ আনুন। তখন দয়ার নবী (সাঃ) গমনের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে সাআদ ইবনে উবাদা, মু'আয ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'আব, যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) প্রমুখ সাহাবাগণ উপস্থিত ছিলেন। শিশুকে নবীজী (সাঃ)-এর হাতে দেওয়া হল। তখন তিনি তাকে কোলে তুলে নিলেন। তার (শিশুর) মৃত্যু কষ্ট হচ্ছিল বিধায়, শ্বাস সজোরে ওঠা-নামা করছিল। তা দেখে নবীজীর (সাঃ) নয়নযুগল দ্বারা অঝোরে অশ্রু

প্রবাহিত হতে লাগল। তখন হযরত সাআদ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ কি? তিনি (সাঃ) জবাব দিলেন ঃ

هذه رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ تَعَا لى فِىْ قُلُوْبِ عِبَادِهِ الخ

অর্থ ঃ এটা হচ্ছে রহমত, (মায়া) যা আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। অবশ্য আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্য থেকে যারা রহম করে, তাদের উপর তিনি রহম করেন। অন্য এক হাদীসে হযরত আনাস (রাঃ) হতে এরূপ বর্ণিত আছে যে, নবীজী (সাঃ) তাঁর পুত্র ইবরাহীম (রাঃ)-এর নিকট গেলেন। তিনি তখন মৃত্যু কোলে ঢলে পড়েছিলেন। এ দৃশ্য দেখে নবীজীর (সাঃ) দু'চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ তাঁকে বললেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও (কাঁদছেন)? জবাব দিলেন ঃ يَـا ابْـنَ عَـوْفٍ اِنَّـهَا رَحْمَةٌ

"হে আউফের পুত্র, এটা হচ্ছে রহমত (সন্তান বাৎসল্য)" এরপর তার চোখ থেকে আবার অশ্রু প্রবাহিত হয়ে কপোল বেয়ে ঝরতে লাগল। তারপর তিনি বললেন, "চোখ অশ্রু ঝরায়, হৃদয় শোকার্ত হয়, তবে আমরা আমাদের মুখ থেকে এমন কথাই বলব, যাতে আমাদের রব সন্তুষ্ট হন। আর হে ইবরাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা শোকাহত।" (বুখারী শরীফ)

তিরমিযী শরীফে হযরত আবু মুছা আশআরী (রাঃ) হতে সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণকারী মাতা-পিতার ফযীলত সম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেন, যার সন্তান মৃত্যু বরণ করে, আর সে ধৈর্য ধারণ করে এবং اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পাঠ করে, তাহলে মহা মহিমাময় আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে "বাইতুল হামদ" নামক একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন।

ধৈর্য ধারণের উপকারিতা ও ফায়েদার মধ্য হতে একটি ফায়েদা এই যে, তা জান্নাত পর্যন্ত পৌছানোর এবং দোযখ মুক্তির উসীলা হয়ে যাবে। এ বিষয় ভিত্তিক একটি হাদীস থেকে মুসনাদে আহমাদ শরীফে হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُتَوَفَّى لَهُمَا ثَلَاثَةُ اَوْلَادٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ اِلاَّ اَدْخَلَ اللّٰهُ وَالِدَيْهِمُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ اَيَّاهُمْ قَا لُوْا اَوِ اثْنَيْنِ قَالَ اَوِا ثْنَيْنِ قَالُوْا اَوْ وَاحِداً قَالَ اَوْ

وَا حِداً وَا لَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اَنَّ السَّقْطَ لَيَجُرُّ اُمَّهُ اِلَى الْجَنَّةِ بِسَرَرِهِ اِذَا احْتَسَبَتْ-

رواه أحمد في مسنده- ٥ : ٢٤١

অর্থ ঃ প্রিয় নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "যে মুসলমান পিতা-মাতার তিন জন নাবালেগ সন্তান মৃত্যু বরণ করে, (আর তারা ছাওয়াব মনে করে ছবর করে), আল্লাহ তা'আলা ঐ পিতা-মাতাকে ঐ সন্তানদের উসীলায় জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন– যদি দু'জন মৃত্যুবরণ করে? ইরশাদ হল, দু'জন বাচ্চা ইন্তেকাল করলেও অনুরূপ ফযীলত পাবে। সাহাবাগণ আরয করলেন, যদি একজন সন্তান মৃত্যুবরণ করে? ইরশাদ করলেন, একজন মৃত্যু বরণ করলেও তাই হবে। এরপর ইরশাদ করলেন, শপথ ঐ সত্ত্বার– যার আয়ত্বে আমার প্রাণ, (সময়ের পূর্বে) যে গর্ভপাত ঘটে, সে অসম্পূর্ণ বাচ্চাও তার মা জননীকে নাভী দ্বারা টেনে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে- যদি সে সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণ করে এবং ছাওয়াবের নিয়্যত রাখে। (আহমাদ, ৫ ঃ ২৪১)

সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণকারী মাতা-পিতার ফযীলতের একটি হাদীস ইবনু মাজা শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : اِنَّ السَّقْطَ لَيُرَاغِمُ رَبَّهُ اِذَا دَخَلَ اَبَوَاهُ النَّارَ فَيُقَالُ اَيُّهَا السَّقْطُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ اَدْخِلْ اَبَوَيْكَ الْجَنَّةَ فَيَجُرُّهُمَا بِسَرَرِهِ حَتّٰى يُدْ خِلَهُمَا الْجَنَّةَ - رواه ابن ماجة كما في كنزالعمال ٣ : ٢٨٥

অর্থ ঃ হযরত আলী (রাঃ) হুজুরে আকরাম (সাঃ)-এর হাদীস বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয় (সময়ের পূর্বে) গর্ভ থেকে পতিত অসম্পূর্ণ বাচ্চা (ক্বিয়ামতের দিন) স্বীয় রবের সাথে অভিমানী হয়ে ঝগড়া করবে–যখন তার পিতা-মাতা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে আদেশ দেওয়া হবে যে, হে আল্লাহর প্রতি অভিমানী শিশু সন্তান! তুমি তোমার পিতা-মাতাকে জান্নাতে নিয়ে যাও। তখন সে তার মাতা-পিতাকে নাভী দ্বারা টেনে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে।"

(ইবনু মাজাহ/ কানযুল উম্মাল, ৩ ঃ ২৮৫)

উল্লেখিত হাদীস সমূহের দৃষ্টিতে প্রতিটি আদর্শ মায়ের জন্য আবশ্যক এই যে, স্বীয় ঈমানকে দৃঢ়, মজবুত, দীপ্তিময় ও শক্তিশালী করতে হবে। যদি কোন বালা-মুসীবত আক্রান্ত করে, তাহলে তখন ঈমান ও একীনের

ক্ষুরধার হাতিয়ার ব্যবহার করুন। যদি কোন শিশু সন্তানের ইনতেকাল হয়ে যায়, তাহলে ভারাক্রান্ত, ব্যথিত না হওয়া চাই। বরং এটা বলুন যে, নিশ্চয় আমরা সকলেই আল্লাহ তা'আলার আমানত এবং আমাদের সকলকেই তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। যা আল্লাহ তা'আলা ফেরৎ নিয়েছেন, তা তাঁরই প্রদত্ত। আর যা তিনি আমাদের দিয়েছেন, তাও তাঁরই। আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রতিটি বস্তুর একটি সময় নির্ধারিত রয়েছে। এ জন্য এ দিকে লক্ষ্য রেখে ধৈর্য ধারণ করা এবং প্রতিদানের আকাঙ্খা রাখা উচিত। যাতে করে যে মহান সত্ত্বা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সকল বস্তুর মালিক, মহা রাজাধিরাজ, তাঁর নিকট হতে ছাওয়াব ও প্রতিদান অর্জিত হয়।

ওছীয়ত নামা লিখিত রাখা আবশ্যক

প্রতিটি আদর্শ মায়ের কর্তব্য এই যে, নিজ জীবদ্দশায় ওছীয়ত নামা লিপিবদ্ধ করে রাখা। কেননা, আপনি তো এখন আর একা নন। একজন পুরুষের স্ত্রী হওয়ার সাথে সাথে সন্তানের জননীও হয়ে গেছেন। সুতরাং, আবশ্যক এটা যে, যে সমস্ত আসবাব পত্র আপনার মালিকানাধীন রয়েছে (যেমন সুই, সুতা হতে শুরু করে বাড়ী, গাড়ী, নগদ পয়সা কড়ি, অলংকারাদি ইত্যাদি।) সে সমস্ত বস্তুর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখুন। যাতে করে আপনার মৃত্যুর পর আপনার মালিকানাধীন সামগ্রীর বন্টন শরীয়ত অনুযায়ী হয়। এ নূরানী পদ্ধতিতে ওছীয়ত করার সবচে' বড় ফায়েদা ও উপকারিতা এই যে, আপনায় মালিকানাধীন সম্পত্তি সম্পর্কে আপনার উত্তরাধিকারীরা অবগত হয়ে যাবে। অন্যথার অসংখ্য পরিবারে এমনও দৃষ্ট হয় যে, এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোন দলীল প্রমাণ বা বিস্তারিত আলোচনা কিংবা কোন সর্বসম্মত ঃ সিদ্ধান্ত থাকে না যে, বিবাহের সময় নববধুকে যে অলংকারাদি ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে, তা কি শুধুমাত্র ক্ষণিকের জন্য, না-কি তাকে মালিকানা সত্বে প্রদান করা হয়েছে? এমনিভাবে পিত্রালয় থেকে কন্যাকে যা কিছু প্রদান করা হচ্ছে বা উপহার উপঢৌকন স্বরূপ যা কিছু নববধু প্রাপ্ত হচ্ছে, তার প্রকৃত মালিক কে? এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা বা আলোচনা না হওয়ার কারণে বড় ধরনের তিনটি ক্ষতি সাধিত হয়।

(১) ঐ গহনা সমূহের যাকাত কার উপর ফরজ হবে? নববধুর উপর ---- না-কি স্বামীর উপর ---------- কিংবা স্বামীর পিতার উপর ? --- নির্দিষ্ট করে কিছুই বলা যায় না।

(২) অনাকাঙ্খিতভাবে আল্লাহ না করুক, যদি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদের (তালাকের) পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তখন ঐ আসবাবপত্র বিরাট ঝগড়া এমনকি হানাহানীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রত্যেকেই ঐ সম্পত্তিতে নিজ অধিকার ও হক প্রতিষ্ঠা করতে হিংস্র হয়ে উঠে। ক'দিন পূর্বেও যে তারা একান্ত আপনজন, মনের মানুষ, ঘনিষ্ট আত্মীয় ছিল, তা বে-মালুম ভুলেই যায়।

(৩) স্বামী অথবা স্ত্রীর মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সম্পত্তি স্বরূপ ভাগ বন্টনের প্রাক্কালে লড়াই-ঝগড়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। এ সব কিছুর মূল হেতু হল, সম্পত্তির প্রকৃত মালিক অজানা, অনির্ধারিত থাকা। সুতরাং নিজ কন্যার মালিকানাধীন সম্পত্তি মনে করে বউ এর মাতা-পিতা তা নিজ বাড়ীতে নিয়ে যেতে চায়। আর বরপক্ষ থেকে জোর দাবী করা হয় যে, এ সম্পত্তি আমাদের ছেলে ও নাতী-পুতীদের। তাই এটা আমাদের হক। সুতরাং আমাদের স্বনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে,

প্রথমতঃ নিজ মালিকানাধীন সম্পত্তির বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করুন। কারণ, যদি আপনি শরীয়তের দৃষ্টিতে নেছাবের (যতটুকু সম্পত্তি থাকলে যাকাত দিতে হয়) মালিক হন, তাহলে সর্ব প্রথম যাকাত আদায়ের চিন্তা ভাবনা করুন। যাকাত প্রদানে যে অবহেলা আজ পর্যন্ত হয়েছে, তার জন্য ছাচ্চা দিলে তাওবা করুন। আগামী দিনে নিয়মিত যাকাত প্রদানের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করুন। যেদিন থেকে আপনি নেছাবের মালিক হয়েছেন, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত যত যাকাত প্রদান করা আপনার উপর ফরয হয়েছে, তা আদায় করার শরীয়তের নিয়ম-কানুন, মাসআলা-মাসায়িল বিজ্ঞ মুফতী সাহেবদের নিকট জিজ্ঞাসা করে আদায় করার সুব্যবস্থা করুন।

দ্বিতীয়তঃ যদি আপনি হজ করার আর্থিক সামর্থ রাখেন এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা না থাকে এবং কোন প্রকার অসুস্থতা না থাকে, তাহলে বিলকুল অবহেলা করবেন না। এতে কোন প্রকার শয়তানী কুপ্রবঞ্চনাকে অন্তরে স্থান দিবেন না।

তৃতীয়তঃ নেছাবের মালিক হওয়ার পর যদি ঈদুল আজহার প্রাক্কালে কুরবানী না করে থাকেন। তাহলে এখন থেকে প্রতি বৎসর কুরবানী দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। আর অতীতে রয়ে যাওয়া কুরবানী সম্পর্কে মাসআলা-মাসায়িল মুফতীদের থেকে জেনে নিন।

এখন নিম্নে কিছু দিক নির্দেশনা উল্লেখ করছি। এ কথাগুলোর প্রতি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য রেখে ওছীয়ত নামা অবশ্যই লিখুন। শরীয়তের দৃষ্টিতে আপনি আপনার সর্বমোট সম্পত্তির মাত্র এক তৃতীয়াংশ ওছীয়ত

(শরয়ী ওরাছাগণ ব্যতিত) অন্যদের জন্য করতে পারবেন।

সন্মানিতা মায়েরা! শরীয়তের দৃষ্টিতে ওছীয়তের বড় গুরুত্ব এসেছে। এমনকি গর্ভে যে সন্তান (ছেলে বা মেয়ে) রয়েছে তার অংশও সম্পত্তির মধ্যে শামিল রয়েছে। যতক্ষণ সে জন্মগ্রহণ না করবে, সম্পত্তি বন্টন সমীচীন নয়। অনেক লোক মনে আনন্দ অনুভব করে যে, মায়ের সম্পত্তিতে মেয়েদের কোন অংশ নেই। যেমনিভাবে পিতার সম্পত্তিতে মেয়েদের অংশ রয়েছে তেমনিভাবে মায়ের সম্পত্তিতেও মেয়েদের অংশ রয়েছে। এতে কোন প্রকার অবজ্ঞা ও অবহেলা করা বাঞ্ছনীয় নয়। এ সম্পর্কিত মাসআলা-মাসায়িল আপন স্বামীকে, ভাইকে, আত্মীয়-স্বজনকে এবং বান্ধবীদেরকে জানিয়ে দিন। এখন আমরা আপনাদের জন্য সহজতর করার নিমিত্ত ওছীয়তনামা লেখার সংক্ষিপ্ত নিয়ম উপস্থাপন করছি। আপনার ওছীয়তনামায় নিম্নের কথাগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকা আবশ্যক।

(১) আমার মালিকানাধীন যা কিছু (হেয়ারপিন থেকে নিয়ে হীরা-মোতী অলংকার, পালংক, ফ্রীজ এবং সংসারের সমস্ত সামগ্রী) আছে তার বন্টন পরিপূর্ণ শরীয়ত অনুযায়ী হতে হবে।

(২) আমার মৃত্যুর পর সমস্ত প্রকার অবৈধ ও সুন্নত পরিপন্থী কার্যকলাপ হতে বিরত থাকার ব্যবস্থা যেন অবশ্যই করা হয়। যেমন ঃ মৃতের মুখাবয়ব দর্শনের কুপ্রথার মধ্যে কয়েকটি মন্দ ও অশুভ দিক রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হল, মাহরাম বাপ, স্বামী, ভাই, মামা, চাচা, ভাগ্নে, ভাতিজা ইত্যাদি। পুরুষদের সাথে লা-মাহরাম পুরুষরাও চেহারা দেখা। এমনিভাবে মৃতের ফটো, ভিডিও ইত্যাদি তৈরী করা ও কবরের মধ্যে লাশের সাথে আহাদনাম তাবীজ, মাজারের চাদর ইত্যাদি রাখা। আপনি উত্তমরূপে অবগত আছেন যে, আপনার বংশে বা পরিবারে অথবা শ্বশুরালয়ে উল্টা-পাল্টা কি কি কুপ্রথার প্রচলন রয়েছে। এ সকল কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকার ওছীয়ত অবশ্যই করুন।

(৩) আমার সন্তানদের হাফেয, ক্বারী, আলেম, মুফতী, মুহাদ্দিস, মুফাস্সিরে কুরআন , মুজাহিদে ইসলাম, মুবাল্লিগে দ্বীন, সমাজ সেবকরূপে গড়ে তোলার সুব্যবস্থা যেন অবশ্যই করা হয়।

(৪) আপনার ওছীয়ত নামায় স্বামীকে উৎসাহ প্রদান করুন যে, তিনি যেন আপনার ইনতেকালের পর দ্বিতীয় বিবাহ করতে বিলম্ব না করেন। যাতে করে তার নফসের হিফাযত সহজতর হয়ে যায়। অর্থাৎ যৌনতার প্রবল চাপে বাধ্য হয়ে অন্য বেগানা নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে না তোলে। তবে স্বামী লক্ষ্য রাখবেন যে, দ্বিতীয় স্ত্রী যেন আপনার

সন্তানদের প্রতি অবিচার করার সুযোগ না পায়।

(৫) আমার পুত্রদের বিবাহ শাদীর পর পুত্রবধুসহ ভিন্ন বাড়ীতে বসবাস করার ব্যবস্থা যেন করা হয়। কেননা, ইসলাম এটাই পছন্দ করে যে, সংসারে শাশুড়ী-বৌ, ননদ-ভাবী, দেবরপত্নী,জেঠনীর সাথে যেন ঝগড়া বিবাদ না হয়। এ কথার প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়ে পুত্র বধুকে পৃথক ঘর বা বাড়ীতে রাখার ব্যবস্থা করুন। কারণ, বর্তমান যুগে যেখানে আপন শাশুড়ীর সাথে কালাতিপাত করা দুর্বিসহ হয়ে পড়েছে, সেখানে সৎ শাশুড়ীর সাথে দিনাতিপাত করা এতই কি সহজ? না দিনে শান্তি থাকবে, না রাত্রিতে আরাম। সে জাতাকল মেশিনে পিষিত হবে অবশেষে আমারই কলিজার টুকরা।

সুতরাং, বিবাহ শাদীতে কৃপণতার পথ অবলম্বন করে সাদা মাটা ও অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান করে অপচয় রোধ করুন এবং বেঁচে যাওয়া টাকা দ্বারা পুত্র-বধুর জন্য পৃথক বাসগৃহের সুব্যবস্থা করুন। এর সুফল ক'দিন পর স্বচক্ষেই অবলোকন করতে পারবেন।

(৬) সন্তান যখন বিবাহের বয়সে পৌঁছে যাবে, তখন বংশের বড়দের পরামর্শ নিয়ে সন্তানের সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইস্তেখারা করে স্বল্প ব্যয়ে বিবাহের ব্যবস্থা করে দেওয়া। তবে কন্যা সন্তানদের ব্যাপারে বংশীয় মান-মর্যাদার প্রতি বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

স্মরণ রাখবেন, আমাদের কন্যার জমাতাও কিন্তু দ্বীনদার হতে হবে। কারণ, যার সম্পর্ক আল্লাহর সাথে সাচ্চা হবে, তার দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগত নূরান্বিত হয়ে যাবে। তাই দ্বীনদার জামাতা তালাশ করতে ভুলবেন না।

সালামান্তে
আপনার জীবন সাথী

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

২৫ জ্বিলকদ ২০ হিঃ
১৯শে ফালগুন ১৪০৬ বঙ্গাব্দ
২রা মার্চ ২০০০ ঈসায়ী
বৃহঃবার রাত ৯.৩০ মিঃ